গাভ্রিইল ত্রোয়েপোলস্কি

ধলা কুকুর শামলা কান

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

গাব্রিইল ত্রোয়েপোল্‌স্কি

ধলা কুকুর শামলা কান

গাব্রিইল ত্রোয়েপোল্‌স্কির (১৯০৫) বয়স যখন ৬৭ বছর সেই সময় 'নাশ সভ্রেমেন্নিক' (আমাদের সমকালীন) সাময়িক পত্রে তাঁর 'ধলা কুকুর শামলা কান' উপাখ্যানটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রচনাটি লেখককে খ্যাতি এনে দিল।

এই বইয়ে তিনি কি কোন কুকুরের গল্প বলেছেন? না, তা নয়। আসলে তিনি ভালো ও মন্দের, শুভ ও অশুভের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

সুস্থ বিচারবুদ্ধির সৌন্দর্য, উদারতা ও মহত্ত্বের আকর্ষণশক্তি যে কতটা হতে পারে তা তুলে ধরতে পারা একটি মহৎ কর্ম। লোকের যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় এমন একটা আদর্শজগৎ গড়ে তুলতে গেলে হৃদয়ের যাবতীয় সম্পদ, নিজের সমস্ত বিশ্বাস ও বেদনাবোধ, সৃজনের সমগ্র বহ্নিশিখার পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটাতে হয়। 'ধলা কুকুর শামলা কান' উপাখ্যানে ত্রোয়েপোল্‌স্কি এটা সম্ভব করে তুলেছেন।

ISBN 5-05-001232-5

তুর্গেনেভের ‘মুমু’, চেখভের ‘কাশ্‌তান্‌কা’ ও তল্‌স্তোয়ের ‘পক্ষিরাজ’ (একটি ঘোড়ার গল্প)-এর মতো ত্রোয়েপোল্‌স্কির ‘বিম্‌’ও আমাদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। লেখক আমাদের শুনিয়েছেন কল্যাণের সহজ সরল বাণী।

গাভ্রিইল ত্রোয়েপোল্‌স্কি

ধলা কুকুর শামলা কান

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
অঙ্গসজ্জা: ই. পিরজ্‌কোভ

Гавриил Троепольский
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО
На языке бенгали

Gavriil Troyepolsky
WHITE BIM WITH A BLACK EAR
In Bengali

© বাংলা অনুবাদ · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৮৭
সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001232-5

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ। দুজনায় এক ঘরে ৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বসন্তের বনভূমি ২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। বিমের প্রথম শত্রু ৩২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। হলুদ বন ৪৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। নেকড়ের ডেরায় হানা ৫৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। বন্ধু-বিদায় ৬৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ। আবার সন্ধান ৮৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ। রেলওয়ে ক্রসিং-এর ঘটনা ৯৯

নবম পরিচ্ছেদ। খুদে বন্ধু, মিথ্যা রটনা, বিমের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ এবং লেখকের প্রসঙ্গচ্যুতি ১১৪

দশম পরিচ্ছেদ। টাকার বিনিময়ে ১২৯

একাদশ পরিচ্ছেদ। গ্রামের জীবন ১৪২

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। মুক্ত প্রান্তরে। এক অসাধারণ শিকারপর্ব। পলায়ন ১৫৯

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। বনের হাসপাতাল। মা আর বাবা। বনে বজ্রবিদ্যুৎ ১৮৮

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। বাড়ির পথে। তিনটি চালাকি ২১৪

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। শেষ দুয়ারের প্রান্তে। লোহার গাড়ির রহস্য ২২৪

ষোড়শ পরিচ্ছেদ। তল্লাশের সময় দেখাসাক্ষাৎ। পৃথিবীর বুকে বিমের চিহ্ন। চারবার গুলি ২৩৫

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। অরণ্যের প্রাণোচ্ছ্বাসে (উপসংহার) ২৫৫

আলেক্সান্দর ত্ভার্দোভ্স্কিকে
উৎসর্গীকৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুজনায় এক ঘরে

আনাড়ির মতো এদিক-ওদিক গড়াতে গড়াতে অনেকটা যেন হতাশ হয়ে গিয়েই হঠাৎ সে করুণস্বরে আর্তনাদ করতে থাকে — মাকে খুঁজে বেড়ায়। তখন প্রভু তাকে নিজের কোলে বসিয়ে তার মুখে দুধের বোতলের চুষি গুঁজে দেয়।

এক মাসের এই কুকুরছানাটার আর কীই বা করার থাকতে পারে? — জীবনের কোন অর্থই সে এখন পর্যন্ত বোঝে না, অথচ তার এত করুণ আর্তনাদ সত্ত্বেও মা'র কোন পাত্তাই নেই। তাই সে প্রথম দুদিন থেকে থেকে বিষণ্ণ সুর তোলার চেষ্টা করে। অবশ্য সময় সময় আবার দুধের বোতল জড়িয়ে ধরে প্রভুর কোলে ঘুমিয়েও পড়ে।

কিন্তু চার দিনের দিন বাচ্চাটা মানুষের কোলের উষ্ণতায় অভ্যস্ত হতে লাগল। কুকুরছানারা খুবই তাড়াতাড়ি স্নেহের বশ হয়ে পড়ে।

নিজের নাম সে তখনও জানত না, কিন্তু এক সপ্তাহ বাদে সে ঠিক বুঝতে পারল যে তার নাম বিম্।

দুমাস বয়সে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল নানা রকমের জিনিসপত্র — লেখার টেবিল, যেটা তার মতো কুকুরছানার পক্ষে বেশ উঁচু; আর দেয়ালে — বন্দুক, শিকারির থলে, লম্বা চুলের একটি মানুষের মুখ। এ সবেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল চটপট। দেয়ালের ঐ মানুষটি যে নড়েচড়ে না এতেও এখন অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই — নড়াচড়া যখন করে না তখন তাতে কোন মজা নেই। অবশ্য পরে, কিছুকাল বাদে কখন-সখন দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছে মুখটা যে একটা জানলার মতো ফ্রেমের ভেতর থেকে উঁকি মারছে এর অর্থ কী হতে পারে?

দ্বিতীয় দেয়ালটা ছিল আরও আকর্ষণীয়। গোটা দেয়ালটা নানা ধরনের

ছোট ছোট চৌকো টুকরোর তৈরি। ঘরের মালিক ইচ্ছেমতো সেগুলোকে বার করে ফের জায়গামতো বসাতে পারত। চারমাস বয়সে, বিম্ যখন পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখল তখন একবার সে নিজে ওরকম একটা চৌকো দেয়াল থেকে বার করে সেটা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু টুকরোটা কেন যেন খসখস আওয়াজ করে উঠল, একটা পাতা খসে পড়ে বিমের দাঁতের ভেতরে থেকে গেল। পাতাটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে দারুণ মজা লাগছিল।

প্রভু দেখতে পেয়ে ধমকে বলল, 'এ আবার কী ব্যাপার? অমন করে না! অমন করতে নেই, বিম্, অমন করতে নেই!' এই বলে সে বিমের নাকে বই দিয়ে গুঁতো মারল।

এরকম ভাবে বুঝিয়ে দেবার পর মানুষ ত মানুষ, সেও আর পড়তে রাজি হবে না, কিন্তু বিমের তাতে কিছুই হল না — সে অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বই দেখল, মাথাটা একবার এপাশে আরেক বার ওপাশে বাঁকাল। শেষ পর্যন্ত মনে হয় সে যেন ঠিক করল এটা যখন উচিত নয়, তখন অন্যটা নিয়েই পড়া যাক। সে নিঃশব্দে বইয়ের মলাটটা আঁকড়ে ধরে সেটা সোফার নীচে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে বসে বসে প্রথমে মলাটের একটা কোণ চিবুল, তারপর আরও একটা কোণ। খেলতে খেলতে সে এমনই মেতে উঠল যে এক সময় হতভাগ্য বইটাকে টানতে টানতে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এসে খেলাচ্ছলে থাবা দিয়ে তার দফারফা করতে লাগল, শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে খানিকটা লাফালাফিও করল।

এই সময়ই সে প্রথম জানতে পারল কাকে বলে 'ব্যথা', কাকে বলে 'বারণ'। প্রভু টেবিলের ধার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় ধমকে বলল:

'বললাম যে অমন করে না!' বলেই সে আচ্ছা করে ওর কান মলে দিল। 'মাথায় যে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কিসুই নেই। 'আস্তিক ও নাস্তিকদের জন্য বাইবেল' বইটা যে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেললি!' ফের সে বলল, 'বললাম যে অমন করে না! ধরে না — বই ধরে না!' বলে আরও একবার সে ওর কান মলে দিল।

বিম্ তার চার পা শূন্যে তুলে কিঁউ কিঁউ কান্না জুড়ে দিল। এই ভাবে চিত হয়ে শুয়ে থেকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তার প্রভুকে। সে বুঝতে পারছিল না কী এমন ঘটনা ঘটল।

'না, না! অমন করে না!' প্রভু ইচ্ছে করেই আরও বেশ কয়েকবার

আওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বইটা দিয়ে বার বার নাকে গংতো মারতে লাগল, কিন্তু এখন আর কোন শাস্তি দিল না। তারপর কুকুরছানাটাকে কোলে তুলে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে চলল সেই একই কথা: 'অমন করে না বেটা, ওরে বোকা অমন করে না! বললাম যে।' এবারে সে বসে পড়ল, কুকুরছানাকে রাখল তার দুই হাঁটুর ওপরে।

এই ভাবে অতি অল্প বয়সেই বিম্‌ 'আস্তিক ও নাস্তিকদের জন্য বাইবেল'-এর মারফত তার প্রভুর কাছ থেকে নীতিশিক্ষা পেয়ে গেল। বিম্‌ তার প্রভুর হাত চাটল, মন দিয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

বিমের প্রভু যখন তার সঙ্গে কথা বলে তখন বিমের ভালো লাগে, কিন্তু আপাতত সে বোঝে মাত্র দুটি কথা: 'বিম্‌' আর 'অমন করে না'। তাহলেও সবচেয়ে বেশি আগ্রহ হয় প্রভুকে লক্ষ করতে, যখন তার কপালের ওপর ঝুলে পড়ে সাদা চুলের গোছা, নড়তে থাকে তার প্রসন্ন ঠোঁটজোড়া, যখন সে তার দরদভরা উষ্ণ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে বিমের গায়ের লোম ছোঁয়। তবে বিম্‌ এত দিনে বেশ ভালো মতো ধরতে পারে প্রভু এখন প্রফুল্ল না বিষণ্ণ, তাকে গালাগাল করছে না প্রশংসা করছে, কাছে ডাকছে না দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রভুকে কিন্তু কখনো কখনো বিষণ্ণও দেখা যেত। তখন সে আপন মনেই কথা বলত, আর বিম্‌কে উদ্দেশ্য করে বলত:

'এই ত, এই ভাবেই আমাদের জীবনটা কাটছে রে বোকারাম। ওর দিকে অমন করে তাকাচ্ছিস কেন রে?' দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলে, 'ও মারা গেছে ভাই। নেই... নেই ও...' বিমের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বলে, 'ওঃ আমার বোকারাম, বিম্‌ রে! তুই কিছুই বুঝিস নে, কিছুই বুঝিস নে তুই।'

কিন্তু প্রভুর এই বিশ্বাস আংশিক সত্যমাত্র, কেননা বিম্‌ অন্তত এটা বুঝতে পারত যে এই সময় তার সঙ্গে খেলা চলবে না, আর 'বোকারাম', 'বেটা' এসব শব্দ যে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলা এটাও সে বুঝত। তাই ওর বয়স্ক বন্ধুটি যখন ওকে 'বোকারাম' বা 'বেটা' বলে ডাকত তখন বিম্‌ তৎক্ষণাৎ চলে আসত — যেমন হয় কাউকে নাম ধরে ডাকলে। আর যেহেতু সে এই বয়সেই কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি ধরে ফেলতে শিখেছে সেই হেতু অবশ্যই অতি বুদ্ধিমান কুকুর হওয়ার সম্ভাবনাও তার ছিল।

কিন্তু কেবল বুদ্ধি দিয়েই কি কোন কুকুর তার জাতভাইদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়? দুর্ভাগ্যবশত তা হয় না। বুদ্ধির ঐ ঠাটটা ছাড়া বিমের আর সবই ছিল গোলমেলে।

এটা ঠিক যে ভালো জাতের মা-বাপের সন্তান সে — 'সেটার' কুকুরের জাত, বংশবৃত্তান্তও তার নেহাৎ ছোট নয়। তার পূর্বপুরুষদের ছিল আলাদা আলাদা নিজস্ব ঠিকুজী-কুলজী। ঐ সব কাগজপত্রের ভিত্তিতে বিমের প্রভু ইচ্ছে করলে কেবল তার প্রপিতামহের প্রপিতামহ নয় প্রমাতামহীর প্রমাতামহীকেও জানতে পারত। এসবই ভালো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এই যে এত সব সদ্‌গুণ সত্ত্বেও বিমের একটা বড় খুঁত ছিল, যা পরে তার ভাগ্যের ওপর বড় বেশি প্রভাব ফেলে — স্কটল্যান্ডের 'সেটার' (গর্ডন-সেটার) জাতের কুকুর হলে কী হবে, তার গায়ের রঙ ছিল একেবারে অন্যরকম — এখানেই হল মজা। সঠিক মানের বিচারে শিকারী কুকুর গর্ডন-সেটারের গায়ের রঙ হওয়া উচিত 'দাঁড়কাকের ডানার রঙের চকচকে নীলচে আভা মেশানো কালো আর তার লোমের ওপর অবশ্যই থাকবে নিখুঁত কাটা কাটা উজ্জ্বল লাল-পাটকিলে রঙের ছোপ'। এমন কি মানের বিচারে যেখানে সাদা রঙ থাকা উচিত নয় সেখানে যদি তা দেখা যায়, তাহলে সেটাও গর্ডন কুকুরের একটা বড় খুঁত বলে ধরা হয়। কিন্তু বিম্‌ একটা কুলাঙ্গারবিশেষ — তার ধড়টা ছিল সাদা, তবে পাটকিলে রঙের ছোপওয়ালা, এমন কি একটু ভালো করে লক্ষ করলে সাদার ওপর কটারঙের ছিটও চোখে পড়ে; কেবল তার একটা কান আর একটা পা কালো — বাস্তবিকই দাঁড়কাকের ডানার মতো রঙ, দ্বিতীয় কানটা হালকা হলদে-পাটকিলে মেশানো। এ ধরনের ঘটনা আশ্চর্য হওয়ার মতোই বটে — সমস্ত রকম লক্ষণ আনুযায়ী গর্ডন-সেটার, অথচ রঙে কোন মিলই নেই। অনেক অনেক দূরের কোন এক পূর্বপুরুষ হয়ত এই রঙ পেয়েছিল, আর তারই প্রকাশ হঠাৎ ঘটল বিমের মধ্যে। বাপ-মা — গর্ডন বংশের, আর তাদের সন্তান বিম্‌ হল ধবল রোগগ্রস্ত, প্রকৃতির এক কিম্ভূতসৃষ্টি।

অবশ্য মোটের ওপর কানের এই রঙের বাহার আর বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় কালো-খয়েরী চোখের সঙ্গে বিমের মুখটা কিন্তু বেশ সুশ্রী আর নজরে পড়ার মতোই লাগে, এমন কি হয়ত বা একটু বেশি বুদ্ধিদীপ্তই লাগে, বলা যেতে পারে সাধারণ কুকুরের তুলনায় দার্শনিক-দার্শনিক, ভাবুক-ভাবুক বলেই যেন মনে হয়। আর সত্যিই এই মুখকে কোন জন্তুর মুখ না বলে

স্রেফ মুখ বলাই ভালো। তবে সারমেয়বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী, কোন কোন ক্ষেত্রে, সাদা রঙ হল বিকৃতির লক্ষণ। সমস্ত ব্যাপারেই সুন্দর, কিন্তু লোমের চাদরের মানবিচারে — রীতিমতো সন্দেহজনক, এমন কি দোষেরই বলতে হয়। এটাই ছিল বিমের দুর্ভাগ্য।

বিম্ অবশ্য তার জন্মের এই দোষ বুঝতে পারত না, যেহেতু পৃথিবীতে আবির্ভাবের আগে মা-বাপকে বেছে নেবার অধিকার প্রকৃতি কুকুরছানাদেরও দেয় নি। বিমের ক্ষেত্রে স্রেফ ব্যাপারটা এই যে তা নিয়ে ভাববার ক্ষমতাও প্রকৃতি তাকে দেয় নি। সে আপন মনে আছে, আপাতত ফুর্তিতেই আছে।

কিন্তু প্রভুর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বিম্ বংশবৃত্তান্তের প্রমাণপত্র পেলে শিকারী কুকুরদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই প্রমাণপত্র বিম্ আদৌ পাবে কিনা, নাকি সে চিরজীবনের মতো শিকারী কুকুর-সমাজে পতিত হয়ে থাকবে — এই নিয়ে প্রভুর দুশ্চিন্তা। কেবল ছয় মাস বয়সে, যখন কুকুরছানার বিশেষত্ব নিরূপণ করা হবে এবং যাকে বলা হয় জাত কুকুর তারই কাছাকাছি কিছু হিসেবে তার নাম নথিভুক্ত হবে — একমাত্র তখনই এটা পরিষ্কার হবে।

বিমের মা'র যে মালিক সেই লোকটা কিন্তু মোটের ওপর প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিল যে ধলাটাকে সদ্যোজাত ছানাদের দল থেকে বরবাদ করে দেবে, অর্থাৎ তাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে। কিন্তু এমন সময় এলো এক অদ্ভুত লোক — এমন সুন্দর কুকুরটার জন্য তার মায়া হল। এই অদ্ভুত লোকটাই বিমের বর্তমান প্রভু। বিমের চোখজোড়া তার ভালো লেগেছিল — বুদ্ধির দীপ্তি খেলছে। বোঝ কান্ড! আর এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে বংশগৌরবের প্রমাণপত্র পাবে, কি পাবে না?

ইতিমধ্যে বিমের এই ব্যতিক্রম কেন, কোথা থেকে, তার প্রভু সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। যাতে সত্যের অন্তত খানিকটা কাছাকাছি আসা যায় এবং সময়ে দেখানো যেতে পারে যে এ ব্যাপারে বিমের কোন দোষ নেই, এই উদ্দেশ্যে শিকার আর কুকুরপালন সম্পর্কে যাবতীয় বইপুথি সে উলটেপালটে দেখেছে। বিম্‌কে সত্যিকারের 'সেটার' জাতের কুকুরদেরই একজন বলে প্রতিপন্ন করার পক্ষে যত রকমের তথ্যপ্রমাণ থাকতে পারে সেগুলো তাই নানা বইপুথি থেকে একটা মোটা খাতায় টুকে রাখতে শুরু করেছে। বিম্ এখন তার বন্ধু, আর বন্ধুদের সাহায্য করা সব সময়ই দরকার। তা যদি না করা যায়, তাহলে একজিবিশনে বিম্‌কে

বিজয়ী হতে হবে না, তার বুকের ওপর সোনার মেডেলও ঝুম্‌ঝুম্‌ করবে না — শিকারের বেলায় সে যতই সোনার টুকরো কুকুর হোক না কেন, কুলগৌরব সে হারাবে।

যাই বল না কেন, এ কী অন্যায়-অবিচার এই পৃথিবীতে!

প্রভুর রোজনামচা থেকে

গত কয়েক মাস হল বিম্‌ অলক্ষ্যে আমার জীবনে জায়গা করে নিয়েছে, বলা যায় দস্তুরমতো জাঁকিয়ে বসেছে। কিসে সে এটা করতে পারল? এর কারণ উদারতা, অগাধ আস্থা আর স্নেহ-ভালোবাসা। এই অনুভূতিগুলো কোন সময়ই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে তোষামোদ, তাহলে পরে উদারতা, আস্থা, স্নেহ-ভালোবাসা — সব কিছু ধীরে ধীরে মিথ্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বড় ভয়ানক জিনিস এই তোষামোদ। ভগবান না করুন! তবে বিম্‌ এখনও ছোট, বড় মিষ্টি কুকুরছানাটি। এখন সবই তার নির্ভর করছে আমার ওপর, তার প্রভুর ওপর।

অদ্ভুত, আমিও এখন মাঝে মাঝে নিজের ব্যাপারে এমন অনেক জিনিস লক্ষ করে থাকি যা আগে আমার কখনও ছিল না। এই যেমন, কোথাও কোন ছবিতে যদি কুকুর দেখতে পাই, তাহলে প্রথমেই মন দিয়ে লক্ষ করি তার কী রঙ, কী জাত। প্রমাণপত্র পাওয়া যাবে কি যাবে না -- এই উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া আর কি!

কয়েকদিন আগে মিউজিয়মে একটা ছবির এক্‌জিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আকর্ষণ করল জ্যাকোব বাস্‌সানোর (১৬ শতাব্দী) একটা ছবি — 'শৈলগাত্র কেটে মোজেসের জলনিঃসারণ'। ছবিটায় সামনের দিকে আঁকা ছিল একটা কুকুর — নিঃসন্দেহে 'সেটার' জাতের কুকুরের প্রতিরূপ, কিন্তু রঙের মিশ্রণটা অদ্ভুত — ধড়টা সাদা, মুখটা কালো, কপাল থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত চিরে চলে গেছে সাদা ডোরা, কানদুটোও কালো, কিন্তু নাক সাদা, বাঁ কাঁধে কালো ছোপ, পেছনের পাও কালো। শ্রান্তক্লান্ত, জীর্ণশীর্ণ কুকুরটি বহুপ্রতীক্ষার পর জল পেয়ে পরম আগ্রহে মানুষের খাবারের বাটিতে জল পান করছে।

দ্বিতীয় কুকুরটির গায়ে লম্বা লম্বা লোম, তারও কানদুটো কালো।

তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে সে তার প্রভুর হাঁটুর ওপর মাথা রেখে নম্রভাবে জলের প্রতীক্ষায় আছে।

পাশে-খরগোস, মোরগ, বাঁয়ে — দুটি মেষশাবক।

লোকজনের মাঝখানে, সামনের সারিতে কুকুরকে স্থান দিয়ে শিল্পী কী বলতে চেয়েছেন? মনে হয় তিনি বলতে চান যে মানুষ সেই সুদূর অতীতেও কুকুর ভালোবাসত, কখনও তাকে পরিত্যাগ করে নি — চরম দুর্ভাগ্যের সময়ও নয়, এমন কি জাতি যখন ধ্বংসের মুখোমুখি, তখনও নয়। কুকুর ছিল একনিষ্ঠ, প্রভুভক্ত অনুচর, মানুষের সঙ্গে মরতেও সে পিছপা নয়।

এই ঘটনার এক মুহূর্ত আগেও সমস্ত লোকজন হতাশায় ভেঙে পড়েছিল, এক ফোঁটাও আশা তাদের ছিল না। তাই তাদের যিনি দাসত্বের কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন সেই মোজেসেরই মুখের ওপর তারা বলে বসেছিল:

'ওঃ প্রভুদের হাতে মিশরভূমিতে আমাদের মরাই ত ভালো ছিল দেখছি! তখন আমরা মাংসের কড়ার সামনে বসে থাকতাম, পেট পুরে খেতে পেতাম! আর তুমি কিনা আমাদের সকলকে এনে জড়ো করলে এই মরুভূমিতে, না খাইয়ে মেরে ফেলার জন্য?'

দাসমনোভাব মানুষের কতখানি গভীরে বাসা বেঁধেছে এই ভেবে মোজেস নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করলেন -- পর্যাপ্ত পরিমাণ রুটি আর মাংসের কড়া কিনা মুক্তির চেয়ে বেশি মূল্যবান হল তাদের কাছে! সঙ্গে সঙ্গে তিনি শৈলগাত্র বিদারণ করে জল বার করলেন। যারা তাঁকে অনুসরণ করছিল তাদের কল্যাণ সাধিত হল এতে — ঠিক এটাই উপলব্ধি করা যায় বাস্‌সানোর এই ছবিতে।

আবার এমনও ত হতে পারে যে বিপদের সময় কাপুরুষতার জন্য মানুষকে তিরস্কার ক'রে বিশ্বস্ততা, আশা ও নিষ্ঠার প্রতীক হিশেবেই কুকুরকে শিল্পী তাঁর ছবিতে প্রধান স্থান দিয়েছেন? কে বলতে পারে? সেই কবেকার কথা!

বাস্‌সানোর ছবির বয়স তিনশ বছরেরও বেশি। তাহলে কি বিমের সাদা-কালো চলে আসছে সেই আমল থেকে? এটা হতেই পারে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রকৃতি প্রকৃতিই।

তবে এতে বিমের শরীরে ও কানে রঙের মিশালে যে ব্যতিক্রম আছে

সে দোষ ক্ষালন হয় না। তার কারণ এই যে দৃষ্টান্ত যত প্রাচীন হবে, ততই বেশি করে পূর্বপুরুষের খুঁতের প্রকাশ এবং বিমের অপকৃষ্টতাই প্রমাণিত হবে।

না, এতে চলবে না, অন্য কোন পথে সন্ধান চালাতে হবে। সারমেয়বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ যদি বাস্‌সানোর ছবির কথা মনে করিয়েও দেন, তাহলে অন্ততপক্ষে এই বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে -- বাস্‌সানোর ছবির কালো কানের প্রসঙ্গ আবার এখানে কেন?

বিমের কাছাকাছি সময়ের তথ্যাদি সন্ধান করেই দেখা যাক না।

* * *

আদর্শ শিকারী কুকুর সংক্রান্ত লেখা থেকে: 'গর্ডন শ্রেণীর 'সেটার' কুকুর স্কটল্যান্ডের জাত। ...এই জাতের উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে। ...বর্তমানকালের স্কটল্যান্ডীয় 'সেটাররা' তাদের দেহকাঠামোর বিপুল শক্তি ও বিশালত্ব বজায় রেখে আরও দ্রুত ছোটার ক্ষমতাও অর্জন করেছে। শান্ত ও মৃদুস্বভাবের, বাধ্য ও ঠাণ্ডা মেজাজের এই কুকুরগুলিকে অনেক কম বয়স থেকে, অতি সহজে কাজে লাগানো যায়, জলা জায়গায় ও বনে-জঙ্গলে বেশ কাজে আসে এরা।... সুস্পষ্ট, ধীরস্থির চরিত্রের, খাড়া উঁচু শরীর, কাঁধের দুই ফলকের মাঝখানের স্তর থেকে মাথা কখনও নীচে থাকে না।'

* * *

'শিকারীর ক্যালেন্ডার' ও 'রাশিয়ার মৎস্যকুল' নামে অপূর্ব গ্রন্থের রচয়িতা ল. প. সাবানেয়েভের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'কুকুর' বই থেকে:

''সেটারের' মূলে আছে প্রাচীনতম শ্রেণীর শিকারী কুকুর, যারা বহু শত বছরের চর্চার ফলে, যাকে আমরা বলি গৃহশিক্ষা, তাই পেয়েছে — এই তথ্যটি মনে রাখলে, 'সেটাররা' যে বলতে গেলে সবচেয়ে সংস্কৃতিবান ও বুদ্ধিমান জাতের কুকুর হবে এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ থাকে না।'

আচ্ছা! তাহলে দাঁড়াচ্ছে, বিম্‌ বুদ্ধিমান জাতের কুকুর। এই তথ্যটা কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

* * *

ল. প. সাবানেয়েভের ঐ একই বই থেকে:

'১৮৪৭ সালে ইংলন্ড থেকে গ্র্যান্ড ডিউক মিখাইল পাভ্‌লভিচের কাছে উপহার হিসাবে আসে সুদুর্লভ জাতের দুটি অপূর্ব 'সেটার' কুকুর। ...কুকুরগুলি বিক্রি করার নিষেধ ছিল, ২০০০ রুবল মূল্যের ঘোড়া দিয়ে তাদের বিনিময় করা হয়।'

বোঝ কান্ড! আনা হল উপহার হিশেবে, এদিকে কিনা কুড়িটা ভূমিদাসের সমান দাম নিয়ে বসল! কিন্তু দোষটা কি কুকুরের? বিমেরই বা এখানে কোন্ ভূমিকা আছে? না, এটা কাজে দেবে না।

* * *

ল. প. সাবানেয়েভ্‌কে লেখা সেকালের খ্যাতনামা প্রকৃতিপ্রেমী, শিকারী ও কুকুরপালক স. ভ. পেন্‌স্কির চিঠি থেকে:

'ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় আমি 'ক্রেচিন্‌স্কির বিয়ে'র লেখক সুখোভো-কোবিলিনের কাছে খুব সুন্দর একটা লাল রঙের 'সেটার' দেখেছিলাম, আর রিয়াজানে শিল্পী পিওত্‌র সকলোভের কাছে দেখেছিলাম হলদে চকরাবকরা 'সেটার'।'

আচ্ছা, এটা খানিকটা কাজে লাগার মতো। কৌতূহলের ব্যাপার এই যে এক রঙ্গব্যঙ্গকারেরও একটা 'সেটার' কুকুর ছিল! আর শিল্পীর ছিল কিনা হলদে চকরাবকরা কুকুর! ওদেরই রক্ত তোমার মধ্যে নেই ত বিম্? তাহলে ত কথাই নেই! কিন্তু না, তাহলে... কান কেন কালো হতে যাবে? বোঝা যাচ্ছে না।

* * *

ঐ একই চিঠি থেকে:

'মস্কোর রাজবৈদ্য ডাক্তার বার্স'ও এক জাতের লাল রঙের 'সেটার' রাখতেন। পরলোকগত সম্রাট আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচের কালো 'সেটার'-এর সঙ্গে তিনি তার লাল মাদী কুকুরগুলির একটির সংযোগ ঘটান।

কুকুরছানাগুলি দেখতে কেমন হয় এবং তাদের গতিই বা কী হয় — আমার জানা নেই; কেবল জানি এই যে সেগুলির একটিকে কাউণ্ট লেভ্ নিকোলায়েভিচ্ তলস্তয় তার পল্লীতে রেখে লালনপালন করেন।'

ব্যস্, ব্যস্ হয়েছে! এখানেই কি সন্ধান মিলছে না? তোর পা আর কান যদি লেভ্ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়ের কুকুরের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কালো হয়ে থাকে, তাহলে বিম্, বলতে হবে তুই দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান কুকুর, এমন কি বংশগৌরবের কোন প্রমাণপত্র যদি তোর নাও থাকে। মহৎ লেখক কুকুর ভালোবাসতেন।

* * *

ঐ চিঠিরই আরও অংশ:

'ইলিন্স্কয়েতে সম্রাট বাহাদুর মস্কোর শিকারসমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানান — ঐ সময়, ভোজের পর সম্রাটের কালো মর্দা কুকুর আমি দেখেছিলাম। কুকুরটা ছিল অতি বৃহৎ, খুবই সুন্দর এক ল্যাপ ডগ। মাথাটা চমৎকার, ভালো বেশভূষা তার অঙ্গে, তবে 'সেটার' জাতের লক্ষণ তার মধ্যে অতি অল্প; পরন্তু পাগুলো বড় বেশি লম্বা, একটা পা আবার পুরোপুরি সাদা। শোনা যায় এই 'সেটারটা' নাকি কোন্ এক অভিজাত পোল্ পরলোকগত সম্রাটকে উপহার দিয়েছিলেন, জনশ্রুতি এই যে মর্দা কুকুরটার আদৌ কোন বংশগৌরব নেই।'

দেখা যাচ্ছে অভিজাত পোলটি তাহলে সম্রাট বাহাদুরকে ডাহা ঠকান ঠকিয়েছে? খুবই সম্ভব। সারমেয়বিজ্ঞানেও এটা সম্ভব। ওঃ, এই কিনা সম্রাটের কালো মর্দা কুকুর! কিন্তু সে যাই হোক না কেন, পাশাপাশি যে আছে বার্স-এর লাল মাদী কুকুরের রক্ত! 'প্রখর ঘ্রাণশক্তি আর দারুণ চটপটে বুদ্ধি' ছিল সেই কুকুরটার। তার মানে, বিম্, তোর পা যদি তুই সম্রাটের কালো মর্দা কুকুরের কাছ থেকে পেয়েও থাকিস, পুরোপুরি ভাবে মহত্তম লেখকের কুকুরের দূর বংশধর তুই খুবই হতে পারিস। কিন্তু না বিম্, সে গুড়ে বালি। সম্রাটের কুকুর সম্পর্কে একটি কথাও নয়। তার অস্তিত্বই বাদ দিতে হয়। তাতে আরেক উট্কো ঝামেলা।

* * *

আচ্ছা, নেহাৎই যদি তর্ক উপস্থিত হয়, তাহলে বিম্‌কে রক্ষা করার উপায় কী?

মোজেস সঙ্গত কারণেই খারিজ হয়ে যায়। সময় এবং গায়ের রঙ যে কোন দিক দিয়েই ধরি না কেন সুখোভো-কোবিলিন্‌কেও খারিজ করতে হয়। এক থাকছেন লেভ্‌ নিকোলায়েভিচ্‌ তল্‌স্তয়: ক) সময়ের হিসাবে সকলের চেয়ে কাছের; খ) তাঁর কুকুরের বাপ ছিল কালো, আর মা — লাল। সবই খাপ খাচ্ছে। কিন্তু বাপ কালো হলে কী হবে সে যে সম্রাটের সেই কালো কুকুরটি। এখানেই ত আটকাচ্ছে।

যে দিকেই যাও না কেন, বিমের দূর রক্তসম্পর্ক নিয়ে খোঁজখবরের বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো। সুতরাং সারমেয়বিদরা বংশমর্যাদা নির্ধারণ করবেন একমাত্র বিমের মা-বাপের কুলজী দিয়ে। কুলজীতে সাদা নেই — ব্যস্‌, চুকে গেল। তল্‌স্তয়ে তাঁদের কিছু আসে যায় না। তাঁরা ঠিকই করেন। সত্যিই ত, এভাবে যে কেউ তার কুকুরের জন্মসূত্র লেখক তল্‌স্তয়ের কুকুর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে, আর নিজেও লেভ্‌ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়ের কাছাকাছি বলে দাবি করতে পারে। বস্তুত, তল্‌স্তয় পদবীধারী লোক আমাদের দেশে কতই না আছে! বড় বেশি সংখ্যায় ওদের উদয় হয়েছে। সাঙ্ঘাতিক বলতে হয়!

যত দুঃখজনকই হোক না কেন, কুকুরদের সমাজে বিম্‌ যে একঘরে, বুদ্ধিবিবেচনার দ্বারা এ সত্য মেনে নেওয়া ছাড়া এখন আমার আর কোন উপায় নেই। ব্যাপারটা খারাপই বটে। থাকার মধ্যে থাকছে কেবল একটি — বিম্‌ বুদ্ধিমান জাতের কুকুর। কিন্তু বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ নয়। নির্দিষ্ট কোন ছকে সে পড়ছে না।

* * *

'সুবিধের নয় বিম্‌, সুবিধের নয়,' এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রভু কলমটা সরিয়ে রাখল, এক্সারসাইজ বুক রেখে দিল টেবিলের টানার ভেতরে।

বিম্‌ নিজের নাম শুনতে পেয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে বসে কালো কানের দিকে মাথাটা কাত করল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেবল হলদে-কটা রঙের

কান দিয়েই শ্ুনছে। দেখতে বড় ভালো লাগছিল। ও যেন হাবভাবে এটাই বলতে চাইছে: 'তুমি আমার ভালো, দরদী বন্ধু। আমি তোমার কথা শ্ুনছি। কী বলতে চাও শ্ুনি?'

বিমের এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভু উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে বলল:

'সাবাস বলতে হয় তোকে বিম! আমরা দ্ুজনে একসঙ্গে থাকব, এটাই বড় কথা, নাই বা থাকল তোর বংশমর্যাদা। তুই ভালো কুকুর। ভালো কুকুরদের সবাই ভালোবাসে।'

এর পর বিমকে হাঁটুর ওপর তুলে নিয়ে তার গায়ের লোমে হাত ব্ুলোতে ব্ুলোতে বলতে লাগল:

'ভালো। যাই বলিস না কেন বেটা, ভালো।'

বিমের বেশ আরাম আর উষ্ণতার আমেজ লাগছিল। সে তক্ষ্ুনি সারা জীবনের মতন ব্ুঝে নিল: 'ভালো' — মানে স্নেহ, কৃতজ্ঞতা ও বন্ধ্ুত্ব।

বিম্ ঘ্ুমিয়ে পড়ল। তার প্রভুর পরিচয় কী, সে কে — এই নিয়ে মাথা ঘামাতে ওর বয়েই গেছে! সবচেয়ে বড় কথা হল লোকটা ভালো, ওর কাছের মান্ুষ।

'ইস, দ্যাখ দেখি, শামলা কান আর রাজকীয় চরণ,' ম্ৃদ্ুস্বরে এই কথা বলে বিম্‌কে পাঁজাকোলা করে এনে সে শ্ুইয়ে দিল চৌকির ওপরে।

জানলার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একদ্ৃষ্টে তাকিয়ে রইল রাতের গাঢ় বেগনী রঙের অন্ধকারের দিকে। তারপর ঘরের ভেতরে সেই মহিলার পোর্ট্রেটটার দিকে তাকিয়ে বলল:

'দেখছ ত, আমি এখন খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছি। এখন আমি আর একা নই।'

তার খেয়াল নেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় থেকে থেকে কী ভাবে সেই ছবির সঙ্গে, এমন কি নিজের সঙ্গেও এবং এখন বিমের সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলা তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

'দেখছ, আমি আর একা নই,' ফের সে বলল পোর্ট্রেটকে।

বিম তখন ঘ্ুমোচ্ছে।

* * *

এই ভাবে তারা দ্ুজনায় এক ঘরে জীবন কাটাতে লাগল। বিম্ শক্তসমর্থ হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। কিছ্ু কালের মধ্যেই সে জানতে পারল

তার প্রভুর নাম ইভান ইভানভিচ্। বুদ্ধিমান কুকুরছানা, উপস্থিত বুদ্ধি রাখে। অল্প অল্প করে সে বুঝতে শিখল কোন জিনিস ছুঁতে নেই, জিনিসপত্র আর লোকজনকে কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। মোটের ওপর প্রভুর অনুমতি বা হুকুম না হলে কিছুই করতে নেই। এই ভাবে 'করতে নেই' কথাটা বিমের জীবনের প্রধান বিধি হয়ে দাঁড়াল। আর ইভান ইভানভিচের চোখজোড়া, তার উচ্চারণভঙ্গি, আকার-ইঙ্গিত-ইশারা, সুস্পষ্ট কথায় হুকুম দেওয়া, তার দরদভরা কথাগুলো ওর সারমেয় জীবনের পথ-নির্দেশক হয়ে দেখা দিল। শুধু তা-ই নয়, ও এটাও বুঝতে পারল যে কোন কাজের ব্যাপারে ওর নিজস্ব, স্বতন্ত্র সমাধানও কোনমতেই প্রভুর ইচ্ছার বিরোধী হলে চলবে না। তবে ধীরে ধীরে তার বন্ধুর কিছু কিছু মনোগত অভিপ্রায়ও আন্দাজ করার ক্ষমতা বিমের হল। এই যেমন, বন্ধু জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরের পানে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে ত ভাবছেই। তাই দেখে বিম্‌ও তার পাশে এসে বসে, সেও ঐ দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। মানুষটি জানে না কুকুর কী নিয়ে ভাবছে, কিন্তু কুকুরের সমস্ত বাহ্য চেহারায় এই কথাই প্রকাশ পাচ্ছে: 'এখন আমার ভালোমানুষ বন্ধুটি টেবিলের পাশে এসে বসবে, নির্ঘাত বসবে। খানিকটা এ মুড়ো ও মুড়ো পায়চারী করবে, তারপর এসে বসে ঐ সাদা পাতাটার ওপর কাঠি দিয়ে খসখস করে আঁচড় কাটবে। অনেকক্ষণ ধরে চলবে এ ব্যাপারটা, অতএব ওর পাশে বসাই যাক।' তারপর বিম্‌ তার উষ্ণ থাবার মধ্যে নাক গুঁজবে। প্রভু তখন বলবে:

'কি রে বিম্, কাজ শুরু করা যাক তাহলে।' এই বলে সত্যি সত্যিই সে বসে পড়ে টেবিলটার ধারে।

এদিকে বিম্‌ গুটিসুটি মেরে পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে যদি বলা হয় 'জায়গায় চলে যা', তাহলে সে কোনায় নিজের চৌকিটাতে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। অপেক্ষা করতে থাকবে কখন চাউনিতে, কথায় বা ইশারায় প্রভু কী বলে। তবে হ্যাঁ, কিছুক্ষণ বাদে জায়গা থেকে নেমে যাওয়া যেতে পারে, নেমে গিয়ে গোলাকার হাড়টা নিয়ে মেতে থাকা যেতে পারে। হাড়টা অবশ্য কামড়ে বাগে আনা অসম্ভব, তবে দাঁত যদি ধারাল করতে চাও ত করতে পার, কেবল প্রভুর কাজের ব্যাঘাত না ঘটালেই হল।

কিন্তু ইভান ইভানভিচ্ যখন টেবিলে কনুইদুটি ঠেকিয়ে করতলে মুখ ঢাকে তখন বিম্‌ তার কাছে এগিয়ে এসে দুরঙা দুই কানসমেত

মুখটা প্রভুর দুই হাঁটুর ওপর রাখে। রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। জানে প্রভু ওর গায়ে হাত বুলোবে। জানে বন্ধুর কী যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। ইভান ইভানভিচ্‌ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে:

'ওরে আমার বিম্‌, তোকে ধন্যবাদ দিতে হয়, ধন্যবাদ দিতে হয় তোকে।' পরক্ষণেই সে আবার কাগজের ওপর খস্‌খস্‌ করে কাঠি চালাতে থাকে।

এই রকম ঘটত বাড়িতে।

কিন্তু মাঠে ঘটত অন্যরকম। মাঠে গিয়ে তারা দুজনেই সব ভুলে যেত। সেখানে ছুটোছুটি করা যায়, খেলাধুলো করা যায়, প্রজাপতির পেছন পেছন ধাওয়া করা যায়, ঘাসের ভেতরে হুটোপাটি খাওয়া যায় — কোনটাতেই আপত্তি নেই। কিন্তু এই মাঠেও বিমের জীবনের আট মাস কেটে যাবার পর সব কিছু চলতে শুরু করল প্রভুর হুকুম মাফিক: 'যা-যা!' — তার মানে, খেলতে পারিস, 'ফিরে আয়!' — বেশ বোঝা যায়, 'শুয়ে পড়্‌!' সম্পূর্ণ পরিষ্কার, 'হুপ!' — লাফিয়ে পার হ, 'খোঁজ!' — পনিরের টুকরো খুঁজে বার কর্‌, 'পাশে!' — পাশে পাশে চল্‌, অর্থাৎ শুধু বাঁ পাশে, 'এদিকে!' — সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কাছে — চিনির ডেলা মিলবে। এ-ছাড়াও আরও অনেক কথা বিম্‌ জানতে পারল এক বছর বয়স হতে না হতে। দুই বন্ধু ক্রমেই আরও বেশি করে বুঝতে লাগল একে অন্যকে, মানুষ আর কুকুরের মধ্যে গড়ে উঠল প্রীতির সম্পর্ক, তারা একসঙ্গে বাস করতে লাগল সমান অধিকার নিয়ে।

কিন্তু একদিন এমন ঘটনা ঘটল যার ফলে বিমের জীবনের ধারা পাল্‌টে গেল, কয়েক দিনের মধ্যে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। বিম্‌ হঠাৎ তার প্রভুর একটা আশ্চর্য, বড় রকমের ত্রুটি আবিষ্কার করে ফেলতেই এই ব্যাপারটা ঘটল।

ঘটনাটা এই রকম: ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে বিম্‌ সযত্নে, বেশ কষ্ট করে এঁকেবেঁকে চলছিল এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিটানো পনিরের সন্ধানে। এমন সময় ঘাস ফুল মাটি আর নদীর নানারকম গন্ধের মধ্যে থেকে হঠাৎ ভেসে এলো একটা দমকা বাতাসের অনভ্যস্ত স্রোত তাতে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল: কেমন একটা অচেনা পাখির গন্ধ। নানা ধরনের চড়াই, আমুদে স্বভাবের নীলকণ্ঠ-দোয়েল-খঞ্জনা, ছোট ছোট যত পাখি, যাদের গন্ধের সঙ্গে বিম্‌ পরিচিত এই গন্ধটা আদৌ সেরকম নয়। ঐ সব পাখির

নাগাল ধরার চেষ্টা ও করে দেখেছে, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। গন্ধটা ছিল কেমন যেন অপরিচিত, তার রক্তে উত্তেজনা খেলে গেল। বিম্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ইভান ইভানভিচের দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু ইভান ইভানভিচ অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে, কিছুই তার নজরে পড়ে নি। বিম্ আশ্চর্য হয়ে গেলে — বন্ধু গন্ধটা টের পাচ্ছে না। আরে হ্যাঁ, এদিক থেকে লোকটাকে ও অকর্মণ্যই বলতে হয়! এই ভেবে বিম্ নিজেই সিদ্ধান্ত নিল — এখন আর ইভান ইভানভিচের দিকে না তাকিয়ে সে নিঃশব্দে গুটি গুটি পা ফেলে অদৃশ্য জিনিসটার দিকে এগোতে লাগল। মাঠের জড়ানো ঘাসে-লতায় যাতে পা জড়িয়ে না যায়, সরসর আওয়াজ না হয় সেই জন্য ও প্রত্যেকবার পা ফেলার আগে জায়গাটা ভালো করে দেখে নিচ্ছিল, ওর পায়ের গতিও তাই আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। অবশেষে গন্ধটা এত তীব্র হয়ে নাকে এসে লাগল যে আর এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে হল। বিম্ তাই ওর বাঁ পায়ের ওঠানো থাবাটা মাটিতে না ফেলে যেখানে ছিল সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরের মূর্তির মতো। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন এক দক্ষ ভাস্করের গড়া কুকুর-মূর্তি। এই হল ওর প্রথম শিকার-সন্ধান! এই প্রথম ওর মধ্যে জেগে উঠল সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে শিকার সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

না, এই ত দেখা যাচ্ছে প্রভুও নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে। বিম্ শিহরিত হয়ে উঠছে, তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে। প্রভু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'ভালো, ভালো রে বেটা, ভালো।' ওর গলার কলার চেপে ধরে বলল, 'এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্।'

বিম্ আর পারে না, ওর শক্তিতে কুলোয় না।

'এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্।' ইভান ইভানভিচ ওকে টানতে থাকে।

বিম্ চলতে থাকে। নিঃশব্দে নিঃসাড়ে। আর অতি সামান্যই বাকি — মনে হচ্ছে অদৃশ্য বস্তুটি যেন কাছাকাছিই কোথাও আছে। এমন সময় প্রভু আচমকা কর্কশ স্বরে হুকুম দিল:

'আগে বাড়্!'

বিম্ ঝাঁপিয়ে পড়ল। সশব্দে ডানা ঝাপটা দিয়ে উঠল বটের পাখি। বিম্ ছুটে গেল তার দিকে, উৎসাহভরে, সর্বশক্তিতে তাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে চলল পাখিটাকে।

'ফিরে আয়!' প্রভু চে'চিয়ে ডাকল।

কিন্তু বিম্ শ্নল না, মনে হল ওর যেন কান নেই।

'ফিরে আয়!' এই বলে শিস। 'ফিরে আয়!' আবার শিস।

বিম্ ছ্টছে ত ছ্টছেই, যতক্ষণ না বটের পাখিটা চোখের আড়াল হয়ে গেল ততক্ষণ ছ্টতেই থাকল। তারপর খ্শিতে, আনন্দে ভরপ্র মনে ফিরে এলো। কিন্তু এটা কী রকম হল? প্রভু ম্খ গোমড়া করে আছে, কটমট করে তাকাচ্ছে, আদর করছে না। সবই পরিষ্কার — ওর বন্ধ্টি কিছ্ই টের পায় না! বেচারি! বিম্ তার সবচেয়ে কাছের এই প্রাণীটির বংশগত ত্রটির স্কপষ্ট লক্ষণ দেখতে পেয়ে তার প্রতি কর্ণাপরবশ হয়ে বেশ খানিকটা সন্তর্পণে আবেগে তার হাত চাটল।

'না, যেমনটা দরকার তুই মোটেই তেমন করছিস না রে বোকাটা,' এই বলে প্রভু ম্খে অনেকটা খ্শির ভাব ফুটিয়ে তুলল। 'আচ্ছা, আয় দেখি, সত্যিকারের শ্র্ করা যাক এবারে।' ওর গলার কলার খ্লে অন্য একটা কলার পরাল (যেটি অস্বিধাজনক), নতুন কলারের সঙ্গে একটা লম্বা বেল্ট এ'টে দিয়ে প্রভু বলল, 'এবারে খোঁজ!'

এবারে বিম্ খ্জতে লাগল বটের পাখির ঘ্রাণ — শ্ধ্ই বটের পাখির ঘ্রাণ। আর ইভান ইভানভিচ তাকে নিয়ে চলল পাখিটা জায়গা বদল করে যেখানে গিয়ে বসেছিল, সেই জায়গায়। বিম্ বোকার মতো তাড়া দেওয়ার পর বটের পাখিটা মোটাম্টি ভাবে কোথায় গিয়ে বসেছিল বন্ধ্ যে তা দেখতে পারে (ঘ্রাণ অবশ্যই সে পাচ্ছিল না, কিন্তু দেখতে ঠিকই পাচ্ছিল) একথা বিম্ আদো ভাবতে পারে নি।

এই ত আবার সেই গন্ধ! বিম্ বেল্টের বাঁধন গ্রাহ্য না করে সমানে টান মারতে লাগল, মাথা উ'চু করে বেল্টে টান দিতে দিতে চলতে লাগল ওপরের দিকে। তারপর আবার সেই টান টান ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া! স্যাস্তের পটভূমিকায় আশ্চর্য দেখাচ্ছে ওর সেই অসাধারণ সৌন্দর্য, যা হৃদয়ঙ্গম করা খ্ব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। ইভান ইভানভিচ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বেল্টের প্রান্তটা ধরে শক্ত করে হাতে জড়িয়ে নিল, ম্দ্স্বরে বলল:

'আগে বাড়্! আগে বাড়্!'

বিম্ নির্দেশমতো চলতে লাগল। চলতে চলতে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আগে বাড়্!'

বিম্ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই প্রথম বারের মতো। বটের পাখিটা পাখায় একটা প্রচণ্ড ঝটপট আওয়াজ তুলে জায়গা ছেড়ে উড়ে গেল। বিম্ এবারেও কোন রকম ভাবনা চিন্তা না করে ওটার পেছনে ধাওয়া করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু ওদিক থেকে বেল্‌টে হেঁচকা টান পড়ায় সে লাফিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হল।

'ফিরে আয়! অমন করে না!' প্রভু চেঁচিয়ে বলল।

বিম্ উলটে পড়ে গেল। সে বুঝতে পারল না প্রভু কেন এমন করছে। বিম্ আবার বটের পাখির দিকে ধাওয়া করার জন্য বেল্‌টে টান মারল।

'শুয়ে পড়্!'

প্রভুর আদেশে বিম্ শুয়ে পড়ল।

এর পর আরও একবার মহড়া চলল বটের-শিকারের, তবে এবারে অন্য একটা বটের। কিন্তু এবারে আগে থাকতেই সে উপলব্ধি করতে পারল বেল্‌টের হেঁচকা টান, তাছাড়া প্রভুর আদেশে সে শুয়েও পড়ল, শুয়ে পড়ে প্রবল উত্তেজনায় ও আবেগে এবং সেই সঙ্গে হতাশায় ও দুঃখে কাঁপতে লাগল: তার নাক থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে কাঁপুনি দেখা দিল। কী ব্যথাই না লাগছিল! ব্যথা কেবল নির্মম, অপ্রীতিকর বেল্‌টটার জন্যই নয়, গলার কলারের কুটকুটে ভেতরের অংশটার জন্যও বটে।

ইভান ইভানভিচ আদর করে বিমের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল:

'এই রকমই ব্যাপার রে বিম্। এছাড়া আর কোন উপায় নেই — এটাই দরকার।'

ঐ দিন থেকে আসল শিকারী কুকুরের জন্ম হল। ঐ দিন থেকেই বিম্ বুঝতে পারল কেবল ও, একমাত্র ও-ই জানতে পারে পাখি কোথায় আছে, প্রভু এক্ষেত্রে অসহায়, তার নাকটা নামমাত্র, কেবল দেখানোর জন্যই তৈরি হয়েছে। শুরু হল তার আসল চাকরী, যার মূলমন্ত্র তিনটি কথা: অমন করে না, ফিরে আয়, বেশ।

আর তারপর — উঃ! — তারপর বন্দুক! বন্দুকের গুলি। বটের পাখি ধপ করে পড়ে গেল — যেন ফুটন্ত জলের ভাপে সেদ্ধ।

এখন দেখা যাচ্ছে বটের পাখির পিছু ধাওয়া করার আদৌ কোন দরকার নেই, কেবল খুঁজে বার করে তাকে তাড়া দিয়ে পাখনা মেলে উঠতে দাও, নিজে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাক — বাদবাকি যা করার করবে বন্দুক।

খেলায় দ্বজনেরই সমান অংশ — প্রভুর ঘ্রাণশক্তি নেই, কুকুরের নেই বন্দ্বক।

এই ভাবে আন্তরিক সৌহার্দ ও অন্বরাগ স্বখের ব্যাপার হয়ে দেখা দিতে লাগল, যেহেতু ওদের একে অন্যকে ব্বঝতে পারত এবং ওদের কেউই যার যতটা দেবার সামর্থ্য অন্যের কাছে তার অতিরিক্ত কিছ্ব দাবি করত না। এটাই হল বন্ধ্বত্বের ভিত্তি, বন্ধ্বত্বের সার কথা।

* * *

বিমের যখন দ্ব' বছর বয়স তখন সে হয়ে উঠল চমৎকার এক বিশ্বাস-ভাজন ও সৎ শিকারী কুকুর। ততদিনে সে শিকার ও দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত শতখানেক শব্দ জেনে ফেলেছে। ইভান ইভানভিচ বললেই হল 'দে দেখি' — সঙ্গে সঙ্গে হ্বকুম তামিল, যদি বলে 'চটিজোড়া দে' — সঙ্গে সঙ্গে দেবে, 'বাটি নিয়ে আয়' — নিয়ে আসবে, 'চেয়ারে যা' — চেয়ারে গিয়ে বসবে। এ ত সামান্য! চোখ দেখেই ব্বঝতে পারত প্রভু কাকে কী চোখে দেখছে, প্রভু কাউকে ভালো চোখে দেখলে বিমের কাছেও তৎক্ষণাৎ সেই লোকটা পরিচিত হয়ে যেত; প্রভু কাউকে অপ্রসন্ন দ্বষ্টিতে দেখলে বিম্ কোন কোন সময় গর্‌গর্‌ পর্যন্ত করে, এমন কি ঐ রকম বাইরের লোকের কণ্ঠস্বরে চাটুবাক্যও (সোহাগভরা চাটুবাক্যও) সে ধরে ফেলত। কিন্তু বিম্ কখনও কাউকে কামড়ায় না — তার লেজে মাড়া দিলেও না। রাতের বেলায় ধ্বনির কাছে অচেনা অজানা কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক ছেড়ে অবশ্যই সতর্ক করে দেবে। কিন্তু তাই বলে কামড়ানো! — কক্ষণও না। এমনই ব্বদ্ধিমান জাতের কুকুর সে।

বিমের ব্বদ্ধিমত্তা এমনই যে সে নিজে, নিজস্ব ব্বদ্ধিবলে দরজা খোলার জন্য মিনতি জানাতেও শিখেছিল — এজন্য সে দরজার গায়ে আঁচড় কাটত। হয়ত ইভান ইভানভিচের অস্বখ করেছে, বিমের সঙ্গে সে আর সেদিন বেড়াতে যাচ্ছে না, ওকে একাই ছেড়ে দিল। বিম্ একটু আধটু ঘোরাঘ্বরি করে যেমন যেমন দরকার কাজকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বাড়ির দরজার সামনে এসে পেছনের দ্ব' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দরজা আঁচড়াতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিঁউ কিঁউ আওয়াজও করে — যেন অন্বনয় করছে। প্রভু কষ্ট করে পা টেনে টেনে সামনের ঘরে এসে দরজা খ্বলে দেয়, বিম্‌কে ভেতরে নিয়ে আসে, ওকে আদর করেই ফের বিছানায়

শুয়ে পড়ে। এই প্রৌঢ় লোকটি অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেই এটা ঘটত (অবশ্য এছাড়া ব্যথা-যন্ত্রণায় সে কষ্ট পেত খুবই ঘনঘন — বিমের তা চোখে না পড়ে পারত না)। বিম্ বেশ স্পষ্ট বুঝে গেল — দরজায় আঁচড় কাটলে দরজা নির্ঘাত খুলে দেবে — যে কেউ যাতে ঘরে প্রবেশ করতে পারে তার জন্যই না দরজা! — অনুনয় করলেই তোমাকে ঘরে আসতে দেবে। সারমেয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল এক দৃঢ়বিশ্বাস।

কিন্তু বিম্ জানত না, তার জানার ক্ষমতাও ছিল না এই সরল, অকপট বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে কী মোহভঙ্গ ও দুর্দশাই না পরে ঘটতে পারে। বিম্ জানত না, তার জানার ক্ষমতাও ছিল না যে এমন দোর আছে যার গায়ে যত আঁচড়ই কাট না কেন, খোলে না।

পরে কী হবে এখনও কারও জানা নেই, তবে আপাতত একটি কথাই বলতে হয়: বিম্ অসাধারণ সহজজ্ঞানের অধিকারী এক কুকুর, কিন্তু তাহলেও সে সন্দেহজনকই রয়ে গেল — বংশমর্যাদার প্রমাণপত্র তাকে দেওয়া হয় নি। ইভান ইভানভিচ তাকে দু' দুবার প্রদর্শনীতে নিয়ে গিয়েছিল — কোন রকম যাচাই না করেই তাকে রিং থেকে বার করে দেওয়া হয়। এর মানে — বিম্ একটা কুলাঙ্গার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিম্ বংশগতভাবে নির্বোধ ত নয়ই, বরঞ্চ চমৎকার কুকুর, কুকুরের মতো কুকুর। আট মাস বয়স থেকে ও পাখি নিয়ে কাজ শুরু করে। শুধু কি শুরুই করে? কী ভাবে করে সেটাও ত দেখতে হবে! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় ওর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বসন্তের বনভূমি

পরের মরশুমে, অর্থাৎ বিমের জন্মের তৃতীয় বছরে ইভান ইভানভিচ ওকে বনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কুকুর এবং প্রভু দুজনের পক্ষেই ব্যাপারটা ছিল বড় আকর্ষণীয়।

চারণভূমিতে আর মাঠে সবই স্পষ্ট, পরিষ্কার — বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঘাস, শস্যখেত, প্রভু — এদের সব সময় চোখে পড়ে। তন্ন তন্ন করে খোঁজার

জন্য এঁকেবেঁকে পা টিপে টিপে চল, শিকারের খোঁজ কর, সন্ধান পাবার সঙ্গে সঙ্গে থমকে গিয়ে শরীর টানটান করে দাঁড়িয়ে পড়, অপেক্ষা করতে থাক প্রভুর হুকুমের। চমৎকার! কিন্তু এখানে, বনের ভেতরে মোটেই সে রকম নয়, একেবারে অন্য ব্যাপার। বসন্তের গোড়ার দিক।

প্রথম যখন ওরা দুজনে বনে এলো তখন গোধূলির রঙ সবে ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু গাছপালার মাঝখানে আবছা অন্ধকার, যদিও গাছে পাতা ধরার সময় হয় নি। নীচের সমস্ত কিছুতে — গাছের কাণ্ডে, গত বছরের গাঢ় খয়েরি রঙের ঝরাপাতায়, ধূসর খয়েরি রঙের শুকনো ঘাসের ডাঁটায় — অন্ধকার কালো আভা। এমন কি সুইটব্রায়ার গাছের যে খুদে খুদে ফলগুলোতে শরৎকালে ঘন লাল চুনির রঙ ধরে, সেগুলোও শীত সহ্য ক'রে টিকে থাকার পর এখন দেখাচ্ছে কফিবীজের মতো।

গাছের নিষ্পত্র, নগ্ন শাখাগুলো মৃদু বাতাসে সামান্য সরসর আওয়াজ তুলছে। তারা যেন কখনও ডালের প্রান্ত দিয়ে সামান্য ছুঁয়ে, কখনও বা ডালের মাঝখানের মৃদু স্পর্শ দিয়ে একে অন্যকে হাতড়ে দেখছে বেঁচে আছে কিনা। গাছের কাণ্ডের শীর্ষদেশ অল্প হেলছে দুলছে — নিষ্পত্র হলেও গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত। গাছপালা, পায়ের নীচের পাতা, বসন্তের গন্ধমাখা বনের নরম মাটি, ইভান ইভানভিচের নিঃশব্দে, সন্তর্পণে পা ফেলা — সর্বত্র, সবের মধ্যেই রহস্যময় মর্মরধ্বনি, ঘন সুবাস। ইভান ইভানভিচের জুতো থেকেও খস্‌খস আওয়াজ উঠছে, আর যেখানে যেখানে তার পায়ের চিহ্ন পড়ছে সেখান থেকে ভেসে আসছে তীব্র গন্ধ — মাঠে পায়ের চিহ্ন পড়লে যেমন পাওয়া যায় তার চাইতেও তীব্র। প্রতিটি গাছের আড়ালে কী যেন এক অজানা, গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। ঠিক এই কারণেই বিম্ ইভান ইভানভিচের কাছ থেকে বিশ পায়ের বেশি দূরে যায় না — সামনে ছোটে — ডাইনে, বাঁয়ে, পরক্ষণেই পিছু হটে, প্রভুর মুখের দিকে তাকায়, যেন জিজ্ঞেস করে: 'এখানে আমরা এলাম কী করতে?'

ইভান ইভানভিচ ওর প্রশ্নটা আঁচ করতে পেরে বলল:

'বুঝতে পারছিস না ত কেন, কী জন্যে? বুঝতে পারবি রে বিম্, বুঝতে পারবি। একটু সবুর কর্।'

এই ভাবে ওরা চলতে লাগল, একজন আরেকজনের ওপর নজর রাখতে রাখতে।

দেখতে দেখতে তারা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বনের ভেতরে বেশ চওড়া একটা

ফাঁকা জায়গায়। দুটো বনপথের চৌমাথায় এ জায়গাটা — চারদিকে চারটে রাস্তা। ইভান ইভানভিচ গোধূলির রাঙা আলোর দিকে মুখ করে বাদাম ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়াল, ওপরের দিকে তাকাল। বিম্‌ও সে দিকে নজর করল, সর্বশক্তিতে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল ওখানে অত নিরীক্ষণ করে দেখার কী আছে।

ওপরের দিকে আলো আছে, কিন্তু এখানে, নীচের দিকটায় আঁধার ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে। বনে কে যেন খসখস করে উঠল, তারপর চুপচাপ। আরও একবার খসখস, আবার চুপচাপ। বিম্‌ ইভান ইভানভিচের পা ঘেঁষে দাঁড়াল — এই ভাবে সে জিজ্ঞেস করতে চায় তার প্রভুকে: 'ওখানে কী? কে ওখানে? গিয়ে দেখব নাকি?'

প্রভু অস্ফুটস্বরে বলল, 'খরগোস। সব ঠিক আছে, বিম্‌। ঠিক আছে। খরগোস। ঘুরে বেড়াক গে নিজের মনে।'

যাক, প্রভু যখন বলছে 'ঠিক আছে', তখন কোথাও কোন গলদ নেই। 'খরগোস' — তাও বোঝা গেল। এর আগেও বিম্‌ যতবার আচমকা এই খুদে জন্তুটির পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, প্রত্যেকবারই প্রভু ওকে এই শব্দটি বলেছে। একদিন কিন্তু ও খোদ খরগোসকেও নিজের চোখে দেখতে পায়, দেখতে পেয়ে তাড়াও করে; ফলে জোর ধমক খেতে হয়, প্রভু ওকে শাস্তি দেয়। ওটি চলবে না!

এখনও বোঝা যাচ্ছে সামান্য দূরে খরগোস খসখস আওয়াজ করছে। কিন্তু অতঃপর কী?

এমন সময় অদৃশ্য, অচেনা কে যেন তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল: 'খর্‌-র্‌ খর্‌-র্‌ খর্‌-র্‌! বিমই প্রথম শুনতে পেল ডাকটা শুনে ও চমকে উঠল। প্রভুও। দুজনেই তাকাল ওপরের দিকে, আর কোথাও নয় — ওখান থেকেই আওয়াজটা আসছে। হঠাৎই গোধূলির নীলাভ-বেগনী আভার পটভূমিকায় দেখা দিল একটা পাখি — পাখিটা বনপথের মাথা বরাবর উড়ছে। উড়তে উড়তে সোজা নেমে আসছে তাদেরই দিকে, থেকে থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে — দেখে মনে হয় পাখি ত নয়, যেন ছোটখাটো একটা জন্তুবিশেষ — উড়ছে আর খর্‌ খর্‌ আওয়াজ তুলছে। কিন্তু আসলে ওটা পাখিই। আকারে বিরাট, ডানা ঝাপ্‌টানোর এতটুকু আওয়াজ নেই (এ তোমার বটের, তিতির বা হাঁস নয়)। এক কথায়, ওপরে যেটা উড়ছিল সেটা চেনা কোন পাখি নয়।

ইভান ইভানভিচ ঝট করে বন্দুক তুলে ধরল। বিম্ শুয়ে পড়ল — যেন নির্দেশ পেয়েছে। পাখিটার ওপরে সে তীক্ষ্ম নজর রাখতে লাগল। বনের ভেতরে গুলির আওয়াজ এমন কর্কশ ও প্রচণ্ড শোনাল যে অমন বিম্ আগে কখনও শোনে নি। প্রতিধ্বনি বনের ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দূরে, অনেক দূরে কোথাও গিয়ে মিলিয়ে গেল।

পাখিটা ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়ল, কিন্তু দুই বন্ধুতে মিলে চটপট ওটাকে খুঁজে বার করে ফেলল। ইভান ইভানভিচ বিমের সামনে পাখিটাকে রেখে বলল:

'চিনে রাখ্ রে, বনমোরগ।' তারপর আরও একবার আওড়াল: 'বনমোরগ।'

বিম্ বেশ করে গন্ধ শুঁকল, পায়ের থাবা দিয়ে ওটার লম্বা ঠোঁট ছুঁয়ে দেখল, তারপর বসে পড়ল। ও আশ্চর্য হয়ে গেল, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, সামনের দুই থাবা নিয়ে খেলা করতে লাগল। বলাই বাহুল্য, এরকম ভাবভঙ্গি ক'রে ও মনে মনে বলল, 'এমন নাক ত বাপু জন্মেও দেখি নি। হ্যাঁ, নাক বটে একটা!'

এদিকে বনে মৃদু সরসর আওয়াজ হচ্ছে, আওয়াজ ক্রমেই মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আসছে। শেষে হঠাৎই নিঝুম হয়ে পড়ল বনটা — মনে হল অদৃশ্য কে যেন গাছপালার মাথার ওপর বিশাল ডানাজোড়া আলতো করে ঝাপ্টাল — যথেষ্ট হয়েছে, আর খস্‌খস করা নয়! ডালপালায় কোন স্পন্দন নেই, গাছপালাগুলো দেখে মনে হয় বুঝি ঘুমে ঢলে পড়ছে — কেবল ক্বচিৎ কখন আধো-অন্ধকারের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আরও তিনটে ঐ রকম বনমোরগ উড়ে গেল, কিন্তু ইভান ইভানভিচ গুলি. করল না। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে আসায় শেষটাকে অবশ্য ওরা আর চোখে দেখতে পায় নি, কেবল ওটার ডাক শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু যেগুলোকে দিব্যি চোখে দেখা যাচ্ছিল সেগুলোকে পর্যন্ত বন্ধু কেন গুলি করল না এই ভেবে বিম্ অবাক হয়ে গেল। বিম্ এতে উত্তেজনা বোধ করল। এদিকে ইভান ইভানভিচ তখন হয় স্রেফ ওপরের দিকে তাকাচ্ছিল, নয়ত চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নির্জনতার মধ্যে কী যেন শোনার চেষ্টা করছিল। দুজনেই চুপ।

এ হল এমন একটা সময় যখন কোন কথা চলে না — মানুষের চলে না, কুকুরের ত নয়ই!

কেবল শেষকালে, জায়গা ছেড়ে চলে যাবার আগে আগে ইভান ইভানভিচ বলল:

'ঠিক আছে বিম্ ! জীবন ফের শুরু হতে চলেছে। বসন্ত।'

কথা বলার ধরন থেকে বিম্ বুঝতে পারল বন্ধুর এখন ভালো লাগছে। ও তাই বন্ধুর হাঁটুতে নাক ঠেকাল, লেজ নাড়তে লাগল: ভাবটা এই যে ভালো, এই না হলে কথা!

দ্বিতীয়বার ওরা এখানে আসে, সকালের শেষ দিকে, তবে বন্দুক ছাড়াই।

বার্চ গাছের মুকুলগুলো টসটসে হয়ে ফুলে উঠে সুবাস ছড়াচ্ছে, নানা রকমের গাছের শেকড় বাকড় থেকে ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র গন্ধ, যে-সমস্ত ঘাস-লতা মাটি ফুঁড়ে উঠেছে তাদের মৃদু গন্ধের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে—এসবই আশ্চর্যরকমের নতুন আর অপরূপ।

দেবদারু গাছের জঙ্গল ছাড়া বনের আর সমস্ত অংশ এফোঁড় ওফোঁড় করে সূর্যের আলো ভেতরে এসে পড়ছিল, এমন কি কোথাও কোথাও নিবিড় দেবদারু গাছগুলোও সোনালি কিরণে ফালাফালা। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। সবচেয়ে বড় কথা — কোন সাড়াশব্দ নেই। কী ভালোই না বসন্তের সকালে বনের ভেতরকার এই নীরবতা!

এবারে বিমের সাহস আগের চেয়ে বেড়ে গেল। সব কিছু বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছে (সেই বারের মতন নয় — তখন ছিল আধা-অন্ধকার)। বিম্ এবারে বনের ভেতরে প্রাণ ভরে ছোটাছুটি করতে লাগল, তবে প্রভুকে কখনই চোখের আড়াল করল না। অপূর্ব দৃশ্য!

অবশেষে বিম্ হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল বনমোরগের ঘ্রাণের সূত্র। সঙ্গে সঙ্গে সে নাক টেনে ঘ্রাণ নিল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল সেই চিরাচরিত স্থির ভঙ্গিতে। ইভান ইভানভিচ ওকে 'সামনে' পাঠাল, কিন্তু কী দিয়েই বা সে গুলি ছুঁড়বে? শুধু তা-ই নয়, প্রভু ওকে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকারও হুকুম দিল, কিন্তু এ হুকুম ত দেওয়া উচিত পাখি যখন উড়াল দেয়, তখন! প্রভু দেখতে পাচ্ছে, নাকি পাচ্ছে না? — মাথামুন্ডু কিছুই বোঝার উপায় নেই। বিম্ আড়চোখে তার দিকে তাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওর স্থির বিশ্বাস হল যে প্রভু দেখতে পাচ্ছে।

দ্বিতীয় বনমোরগটার ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। মনে খানিকটা দুঃখ হয় বৈকি! এবারে কিন্তু বিম্ তার মনোভাব প্রকাশ না করে পারল না — সতর্ক চাউনি, ধার ঘেঁষে ছোটা, এমন কি আজ্ঞা লঙ্ঘনের

চেষ্টা — এক কথায়, অসন্তোষের মাত্রা পূর্ণ হয়ে প্রকাশের পথ খুঁজতে লাগল। ঠিক এই কারণেই তৃতীয়বার ও যখন বনমোরগের গন্ধ পেল তখন বনমোরগটা ডানা ঝাপটে উড়াল দিতে একটা সাধারণ খেঁকি কুকুরের মতো আচরণ করে বসল — উড়ন্ত পাখির পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু বনমোরগের পেছন পেছন আর কত দূর ধাওয়া করা সম্ভব? — ডালপালার আড়ালে এক ঝলক দেখা দিয়েই উধাও। বিম্ বিরক্ত হয়ে ফিরে এলো। এর ওপর ওকে আবার শাস্তিও পেতে হল। কী আর করা? ও একপাশে শুয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল (এ কাজটা কুকুররা দারুণ করতে পারে)।

এসবই সহ্য করা যেত, যদি না এর ওপর এসে জুটত ক্ষোভের আরও একটা কারণ। এবারে বিম্ আবিষ্কার করল প্রভুর আরেকটি ত্রুটি — এটা ওর কাছে নতুন — বিকৃত ঘ্রাণশক্তি। শুধুই কি ঘ্রাণশক্তির অভাব? তার ওপরে আবার কিনা...

ঘটনাটা ছিল এই রকম:

ইভান ইভানভিচ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল। তারপর একটা গাছের দিকে এগিয়ে গেল, আলগোছে বসে পড়ে আলতো করে এক আঙ্গুল দিয়ে একটা ফুলের গায়ে হাত বুলাল — ফুলটা এই এতটুকুন (ইভান ইভানভিচের কাছে ফুলটার প্রায় কোন গন্ধই নেই, কিন্তু বিমের কাছে অসহ্য উগ্র গন্ধ ওটার)। আশ্চর্য! ঐ ফুলটার মধ্যে সে কী পেল? কিন্তু প্রভু তখন মাটিতে বসে আছে, মৃদু মৃদু হাসছে। বিম্ অবশ্য এমন ভাব দেখাল যে তারও যেন ভালোই লাগছে, কিন্তু এটা সে করল নেহাৎই প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হয় বলে। আসলে কিন্তু প্রভুর কান্ডকারখানা দেখে সে কম অবাক হয়ে যায় নি।

'দ্যাখ্, দ্যাখ রে বিম্!' উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠে ইভান ইভানভিচ কুকুরের নাকটা হেলিয়ে ধরে ফুলের গায়ে ঠেকিয়ে দিল।

এবারে বিম্ আর সহ্য করতে পারল না — সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে সরে গিয়ে বনের মধ্যকার একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, ভাবভঙ্গিতে যতদূর পারা যায় একটা কথাই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল: 'যাও শোঁকো গিয়ে তোমার ফুল!' এহেন মতভেদের ফলে কোথায় সম্পর্কের একটা এসপার ওসপার করার তাগিদ দেখা দেবে তা নয়, প্রভু বিমের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল —

খুশিতে উপচে পড়ছে সে। বিম্ এতে বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, 'হুঁঃ আবার হাসা হচ্ছে!'

প্রভু ফের ফুলের দিকে মন দিল, বলল:

'এই যে, প্রথম-দেখা-ফুল!'

বিম্ ঠিকই বুঝতে পারল 'এই যে' সম্বোধনটা তার উদ্দেশে নয়।

যা ঘটল তা এই রকম: কুকুরের মন বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে বলতে হয় বিমের সেই মনের মধ্যে ঈর্ষা এসে বাসা বাঁধল। বাড়িতে যদিও মনে হল সম্পর্কটা বুঝি জোড়া লেগে গেছে, কিন্তু দিনটা বিমের কাছে ব্যর্থ মনে হতে লাগল: শিকার করার মতো পাখি ছিল — অথচ গুলি করা হল না, ও নিজে পাখির পেছনে ধাওয়া করতে গেল, সেজন্য শাস্তি পেল, তার ওপরে আবার সেই ফুল। নাঃ যাই বল না কেন, কুকুরের কাছেও তার কুকুরজন্ম অসহ্য ঠেকে, কেননা তাকে চলতে হয় 'অমন করে না', 'পেছনে', 'ঠিক আছে' — এই তিনটি মূলমন্ত্র অনুসরণ করে।

তবে একটা কথা এই যে বিম্ বা ইভান ইভানভিচ — দুজনের কেউই কি ভাবতে পেরেছিল এই দিনটির কথা স্মরণ করলে কোন এক সময় তা ওদের কাছে পরম সুখের মনে হতে পারে?

প্রভুর রোজনামচা থেকে

বন তখনও শীতের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তার ক্লান্তি তখনও ভাঙে নি, গাছে গাছে মুকুলের ঘুম ভাঙলেও তারা তখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে নি, শীতকালে গাছের গুঁড়ির কাছ থেকে করাত দিয়ে কেটে ফেলার পর সই ছোট কাটা টুকরোটার গায়ে তখনও অঙ্কুর ফোটে নি, কিন্তু ফোটার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে, ধূসর-বাদামী রঙের ঝরা পাতার স্তর জমেছে গাছের তলায়, উলঙ্গ ডালপালার তখনও মর্মরধ্বনি তোলার ক্ষমতা হয় নি, তারা কেবল একে অন্যকে আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে — এই যখন বনের অবস্থা, এমন সময় ভেসে এলো স্নোড্রপ ফুলের ঘ্রাণ। গন্ধ প্রায় টেরই পাওয়া যায় না, কিন্তু এ হল জাগ্রত জীবনের ঘ্রাণ, তাই প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও এতে পাওয়া যায় আনন্দের শিহরণ। চারপাশে দৃষ্টিপাত করি — দেখা গেল পাশেই আছে ওটা। মাটি ফুঁড়ে উঠেছে ফুলটা — এই এতটুকুন এক বিন্দু নীলাকাশ — সুখে যার অধিকার আছে, সুখ যার শোভা পায়, তার কাছে বড়ই সরল, বড় অকপট আনন্দ ও

সৌভাগ্যের এই প্রথম বার্তাবহটি। কিন্তু কী ভাগ্যবান, কী হতভাগ্য — যে-কোন মানুষের কাছে সে এখন জীবনের ভূষণস্বরূপ।

আমাদের, মানুষের মধ্যেও ঠিক এই রকম — আছে অকলঙ্ক হৃদয়ের অনাড়ম্বর মানুষ, যারা থেকে যায় 'অলক্ষ্যে', যারা 'ছোট' কিন্তু যাদের মন বড়। তারাই জীবনের ভূষণ, মানুষের যা কিছু শ্রেয় — ঔদার্য, সরলতা, বিশ্বস্ততা — এসবেরই সমন্বয় ঘটে তাদের মধ্যে। তেমনি এই স্নোড্রপ ফুলও — দেখে মনে হয় যেন ধরণীর বুকে এক বিন্দু আকাশ।

এর কয়েকদিন বাদে (গতকাল) আমি আর বিম্ ঐ একই জায়গায় গিয়েছিলাম। আকাশ ইতিমধ্যে হাজার হাজার নীল বিন্দুতে বন ছেয়ে ফেলেছে। খুঁজি, খুঁজে বার করার চেষ্টা করি কোথায় আমার প্রথম দেখা সেই দুঃসাহসী ফুলটি? মনে হয় যেন এই এটাই। এটাই সেই ফুলটা, নাকি নয়? জানি না। ফুল এখন এত ফুটে আছে যে তার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়, তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব — ওর পরে যারা এসেছে তাদের মাঝখানে ও হারিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে মিলেমিশে গেছে। অথচ ও ছিল এই এতটুকু কিন্তু তেজস্বী, বড় শান্ত কিন্তু এমনই একরোখা যে মনে হয় শীতশেষের হিম যেন তারই ভয়ে আত্মসমর্পন করেছে, অতি ভোরে সূর্যোদয় দেখে শেষ তুষারকণার শ্বেতপতাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বনপ্রান্তে। জীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

কিন্তু বিমের এসব বোঝার কোন সাধ্য নেই। এমন কি প্রথমবার ত ও রেগেই গিয়েছিল, মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। এবারে ফুল অনেক ফুটলে কী হবে ফুলের দিকে কোন আমল আর ও দিল না। তালিমের সময়ও আহামরি ভালো আচরণের পরিচয় দিল না — বন্দুক না থাকায় ওর মেজাজ খারাপ ছিল। মানসিক বিকাশের দিক থেকে আমরা দুজনে দুই ভিন্ন স্তরের হলে কী হবে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতির একটি স্থায়ী নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুযায়ীই চলে তার সৃজনকর্ম। নিয়মটি হল একের কাছে অপরের প্রয়োজনীয়তা। অতি সাধারণ, নগণ্য জীবন থেকে শুরু করে অতি উন্নত জীবন পর্যন্ত সর্বত্রই এই নিয়ম। বিম্ যদি না থাকে তাহলে আমার পক্ষেই কি সম্ভব হত এমন ভয়ানক নিঃসঙ্গতা সহ্য করা?

...মনে পড়ে যায় তার কথা। তাকে কী প্রয়োজনই না ছিল আমার! সেও ভালোবাসত স্নোড্রপ ফুল। অতীত যেন স্বপ্নের মতো।

আর বর্তমান? বর্তমান কি স্বপ্ন নয়? এই যে এটা — গতকালের বসন্তের বন, ধরণীর বুকে নীলিমার সমারোহ — এ কি স্বপ্ন নয়? হ্যাঁ, স্বপ্ন বৈ কি — নীলিম স্বপ্ন, দিব্য সঞ্জীবনী, হোক না তা ক্ষণিকের। অবশ্যই ক্ষণিকের; কেননা কবি-সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত যদি নিত্যকার ধূসর বর্ণের জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়ে কেবল নীল স্বপ্নেরই জয়গান করতেন, তাহলে মানবজাতি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে বর্তমানকেই ভবিষ্যতের পক্ষেও চিরন্তন বলে গ্রহণ করত। বর্তমান কেবল অতীতে পর্যবসিত হবে — এটাই হল সময়ের নিয়তি। মানুষের ক্ষমতা নেই যে হুকুম জারি করে বলে: 'সূর্য, থেমে যাক!' সময়কে থামিয়ে রাখা যায় না, ধরে রাখা যায় না, সময় অকরুণ। সবেরই অবস্থান সময়ে, গতিতে। আর যে-মানুষ কেবল স্থায়ী শান্তির নীলিমা খুঁজে বেড়ায়, সে আগাগোড়া অতীতেই ডুবে থাকে — তা সে নিজের সম্পর্কে যত্নবান তরুণই হোক কিংবা কোন বয়োবৃদ্ধই হোক — এক্ষেত্রে বয়সের কোন তাৎপর্য নেই। নীলিমার নিজস্ব ধ্বনি আছে, তার ধ্বনি শান্তির, বিস্মৃতির, কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের, নেহাৎই বিশ্রামের জন্য; এই মুহূর্তগুলো কখনো ছাড়া উচিত নয়।

আমি যদি লেখক হতাম তাহলে মানুষের উদ্দেশে আমি অবশ্যই বলতাম:

'হে অস্থিরচিত্ত মানুষ! তুমি চিন্তা কর, ভবিষ্যতের জন্য কষ্ট সহ্য কর তুমি — তোমার গৌরব অক্ষয় হোক! তুমি যদি মনেপ্রাণে বিশ্রাম পেতে চাও, তাহলে বসন্তের শুরুতে চলে যাও বনে, স্নোড্রপ ফুলের কাছে, তুমি দেখতে পাবে বাস্তবের অপূর্ব স্বপ্ন। যাও কালবিলম্ব না করে। কয়েক দিন পরে স্নোড্রপ ফুল আর নাও থাকতে পারে, প্রকৃতির দান এই মোহিনী দৃশ্য তোমার স্মৃতিভাণ্ডারে ধরে রাখার সুযোগ তখন তুমি হারাতে পার। যাও, বিশ্রাম কর। স্নোড্রপ ফুল সৌভাগ্যের প্রতীক — এটাই লোকশ্রুতি।'

...এদিকে বিম্ ঝিমোয়। ও স্বপ্ন দেখছে — ওর পাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে — স্বপ্নে ও দৌড়াচ্ছে। স্নোড্রপ ফুলে ওর থোড়াই আসে যায় — নীলকে সে কেবল ধূসর দেখে (কুকুরের দৃষ্টিশক্তিই এই রকম)। বাস্তবতার মূর্তিমান মসিলেপনকারী রূপেই যেন প্রকৃতি ওকে সৃষ্টি করেছে। যাও ওকে, প্রাণের বন্ধুকে গিয়ে বুঝাও ও যেন মানুষের চোখ দিয়ে দেখে। না, তা হবার নয়, মাথা কেটে ফেললেও ও ওর নিজের মতো করেই দেখবে। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী কুকুর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিমের প্রথম শত্রু

গ্রীষ্মকাল পার হয়ে গেল। সময়টা ছিল বিমের কাছে আনন্দের, আমোদফূর্তির সময়। ইভান ইভানভিচের সঙ্গে ওর তখন পুরোমাত্রায় বন্ধুত্ব চলছিল। ঘাস জমিতে ও জলামাঠে অভিযান (বন্দুক ছাড়া), রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, স্নান, নদীতীরের নিস্তব্ধ সন্ধ্যা — কোন কুকুরের পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কী চাই? নিঃসন্দেহে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই তার কাম্য হতে পারে না।

তালিম আর শিকারের মহড়ার সময় শিকারীদের সঙ্গেও তাদের দেখা হত। এদের সঙ্গে চেনাপরিচিতি হতে দেরি হত না, যেহেতু এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকত কুকুর। প্রভুদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশার আগেই তাদের কুকুরেরা একে অন্যের কাছে ছুটে আসত, নিজেদের সারমেয়সুলভ আকার ইঙ্গিত ও দৃষ্টির ভাষায় আলাপ শুরু করে দিত।

'তুই কে? মদ্দা না মাদী?' যেখানে যেখানে শুঁকে দেখা উচিত সেই জায়গাগুলি ভালো করে শুঁকতে শুঁকতে (অবশ্য নিছক লৌকিকতার খাতিরে) বিম্ জিজ্ঞেস করে।

'নিজেই ত দেখতে পাচ্ছিস, আবার জিজ্ঞেস করা কেন?' মাদী কুকুরটি জবাব দেয়।

'কেমন হালচাল?' উৎফুল্ল হয়ে জানতে চায় বিম্।

'এই ত, কাজ করছি!' কিঁউ কিঁউ করে জবাব দিয়ে মাদী কুকুরটি ছলাকলাভরে চার পায়ে সামান্য লাফিয়ে ওঠে।

এর পর ওরা ছোটে ওদের প্রভুদের কাছে, কখনও একে কখনও বা ওকে জানায় পরিচয়ের কথা। দুই শিকারীই যখন কথাবার্তা বলার জন্য কোন গাছ বা ঝোপের ছায়ায় গিয়ে বসে তখন দুই কুকুরে খেলাধুলায় এমনই মেতে ওঠে যে শেষকালে ওদের মুখের ভেতর থেকে জিভ বেরিয়ে পড়ে। তখন ওরা প্রভুদের পাশে শুয়ে পড়ে তাদের মৃদুকণ্ঠের অন্তরঙ্গ আলাপ শুনতে থাকে।

শিকারী ছাড়া অন্য লোকজনে বিমের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না — তারা লোক, এই যা। তারা ভালো। কিন্তু যাই হোক না কেন, শিকারী নয় যে!

আর শিকারীদের এই কুকুরগুলো — কত রকমেরই না হয়ে থাকে!

একবার ঘাস জমিতে ওর সঙ্গে দেখা হল আলুথালু লোমে ভর্তি একটা ছোট্ট কুকুরের। কুকুরটা কালো, আকারে ওর অর্ধেক। ওরা এ ওকে সম্ভাষণ জানাল, বেশ সংযত ভাবেই, ছলাকলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওদের মধ্যে। তাছাড়া ওসব করার কোন উপায়ও রাখল না নবপরিচিতটি। এরকম ক্ষেত্রে সচরাচর এক রাশ প্রশ্ন বর্ষিত হওয়ার পর অন্যেরা যেমন আচরণ করে থাকে এ তার ধারেকাছে না গিয়ে আলস্যভরে লেজ নাচাতে নাচাতে বলল:

'আমার খিদে পেয়েছে।'

ওর মুখ থেকে ইঁদুরের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বিম্ ওর ঠোঁট শুঁকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তুই ইঁদুর খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ, ইঁদুর খেয়েছি। আমার খিদে পেয়েছে।' এই বলে ও নলখাগড়ার সাদা রঙের গিঁটপাকানো শেকড় চিবোতে শুরু করল।

বিমের ইচ্ছে হল নলখাগড়ার শেকড় একটু পরখ করে দেখে, কিন্তু নবাগতা প্রতিবাদ জানাল, ওর মুখে সেই এক কথা:

'আমার খিদে পেয়েছে।'

যতক্ষণ ওর গোটা শেকড়টা চিবুনো শেষ না হল ততক্ষণ বিম্ বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল, তারপর ওকে সঙ্গে আসার আমন্ত্রণ জানাল। ও বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরেসুস্থে বিমের পিছন পিছন চলল। ওর গায়ের লোম আলুথালু হলে কী হবে, পরিচ্ছন্ন (দেখে মনে হয় বেশির ভাগ কুকুরের মতোই স্নান করতে ভালোবাসে — গ্রীষ্মকালে তাই ওরা নোংরা হয় না, এমন কি রাস্তার কুকুর হলেও)। বিম্ ওকে প্রভুর কাছে নিয়ে এলো। প্রভু দূর থেকে তার বন্ধুর আলাপ-পরিচয়ের দৃশ্যটার ওপর নজর রাখছিল। কিন্তু আলুথালু কুকুরটা চট করে অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করতে পারছিল না, তাই সে খানিকটা তফাতে বসল, যদিও বিম্ প্রভুর কাছ থেকে তার কাছে এবং তার কাছ থেকে ফের প্রভুর কাছে ছুটে ছুটে তাকে ডাকতে লাগল, তার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করল। ইভান ইভানভিচ রুকস্যাক নামিয়ে সেখান থেকে সসেজ বার করল, ছোট একটা টুকরো কেটে নিয়ে আলুথালুর দিকে ছুঁড়ে দিল।

'এদিকে আয়, এদিকে আয় আলুথালু। আমার কাছে আয়,' প্রভু বলল।

টুকরোটা যেখানে গিয়ে পড়ল আলুথালু ছিল তার মিটার তিনেক

দূরে। সে সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে শরীরটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে টুকরোটা ধরে খেয়ে ফেলল, তারপর ওখানেই বসে পড়ল। পরে আরও একটা টুকরো দেওয়ায় আরও এগিয়ে এলো। শেষকালে মানুষটার পায়ের কাছে বসেই খেতে লাগল, এমন কি মানুষটা যখন ওর গায়ে হাত বুলালে তাতেও ও আপত্তি করল না। অবশ্য একটু ভয় ভয় লাগছিল তার। বিম্ আর ইভান ইভানভিচ ওকে পুরো সসেজ দিয়ে দিল — প্রভু টুকরোগুলো ছুঁড়ে দেয়, বিম্ও আলুথালুর খাওয়ার সময় কোন ব্যাঘাত করে না। সাধারণত যেমন যেমন ঘটা উচিত তা-ই ঘটতে থাকল: একটা টুকরো ছোঁড়ে — একটু কাছে চলে আসবে, আরও একটা — আরও কাছে, এর পর আরও, আরও — শেষ পর্যন্ত চলে আসবে পায়ের কাছে; নিষ্ঠার সঙ্গে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করবে বলেই মনে হয়। ইভান ইভানভিচ মনে মনে তাই ভাবল। আলুথালুর গায়ে সে হাত দিয়ে দেখল, ওর দুই কাঁধের ফলার উঁচু হাড় নেড়ে ঝাঁকানি দিল, বলল:

'নাক ঠান্ডা — তার মানে সুস্থ। তা ভালোই বলতে হবে।' এই বলে সে ওদের দুজনের উদ্দেশেই হুকুম দিল: 'চলে আয়, চলে আয়!'

এসব কথা বোঝার ক্ষমতা আলুথালুর ছিল না, কিন্তু ও যখন দেখতে পেল বিম্ ঘাসের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে তখন বুঝতে পারল দৌড়ানো উচিত। আর বলাই বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের স্বভাব অনুযায়ী ওরা উত্তেজিত হয়ে এমন খেলাধুলায় মেতে উঠল যে বিম্ ভুলেই গেল কেন সে এখানে এসেছে। ইভান ইভানভিচও আপত্তি করল না, মৃদু শিস দিতে দিতে আপন মনে চলতে লাগল।

শহরে ঢোকার আগে পর্যন্ত আলুথালু কোন ওজর আপত্তি না তুলে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল, কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে এসেই হঠাৎ সে পথের একপাশে বসে পড়ল — তারপর আর নড়নচড়নের কোন নাম নেই। ইভান ইভানভিচ ওকে ডাকল, আমন্ত্রণ জানাল — কিন্তু ও এগোল না। এক ঠায় বসে থেকে, দৃষ্টি দিয়ে ওদের অনুসরণ করল। ইভান ইভানভিচেরই ভুল — টোপ দেখিয়ে যে-কোন কুকুরকে বশে আনা যায় না।

বিম্ জানত না, তার জানার কোন উপায়ও ছিল না যে আলুথালুরও একজন প্রভু ছিল, প্রভুর পরিবারও ছিল; তার প্রভুর পরিবারের সকলে তাদের নিজেদের ছোটখাটো একটা বাড়িতে বাস করত, কিন্তু যে-রাস্তার ওপর তাদের বাড়ি ছিল সেটা পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হলে আলুথালুর

প্রভু-পরিবারকে অন্য একটা বাড়ির পাঁচ তলায় সব রকম সুযোগসুবিধাযুক্ত একটা ফ্ল্যাট দেওয়া হয়।

এক কথায়, আলুথালুকে ওরা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাহলেও ও প্রভুর সেই নতুন বাড়ি আর বাড়ির দরজা ঠিক খুঁজে বার করে, কিন্তু ওরা ওকে মেরে খেদিয়ে দেয়। এখন তাই ও একা। শহরে ঘুরে বেড়ায় কেবল রাতের বেলা — অধিকাংশ রাস্তার কুকুর যা করে। ইভান ইভানভিচ পুরো ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল, কিন্তু বিম্‌কে ত আর বলা সম্ভব নয়। বিম্‌ ওকে মোটে ছাড়তে চাইছিল না — পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল, থেকে থেকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল আর ইভান ইভানভিচের দিকে দৃষ্টিপাত করছিল। কিন্তু ইভান ইভানভিচ আপন মনে চলতে লাগল।

ইভান ইভানভিচ যদি জানতে পারত নিষ্ঠুর অদৃষ্টের পরিহাসে কোন এক সময় বিম্‌ ও আলুথালুর মিলন ঘটবে, যদি জানতে পারত কবে এবং কোথায় ওদের দুজনের সাক্ষাৎকার ঘটবে, তাহলে হয়ত এখন সে এমন নিশ্চিন্তে পথ চলতে পারত না। কিন্তু ভবিষ্যৎ মানুষের কাছেও অজ্ঞাত।

* * *

তিন-তিনটে গ্রীষ্ম কেটে গেল। গ্রীষ্মকাল বিমের ভালো লাগে, ইভান ইভানভিচেরও মন্দ লাগে না। এক দিন রাতে প্রভু জানলা বন্ধ করে দিয়ে বলল:

'হিম পড়ছে রে বিম্‌, এ বছরের প্রথম হিম।'

বিম্‌ বুঝতে পারল না। ও উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে ইভান ইভানভিচের হাঁটুতে নাক গুঁজল, এই ভাবে যেন বলতে চাইল: 'বুঝতে পারছি না।'

ইভান ইভানভিচ কুকুরের ভাষা ভালোই বুঝতে পারত — সে ভাষা হল চোখের আর অঙ্গভঙ্গির ভাষা। সে আলো জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'বুঝতে পারলি নে বুঝি বোকা?' তারপর স্পষ্ট করে বলল, 'বনমোরগ শিকারে যাব কাল। বনমোরগ শিকারে!'

ও তাই বল! এই শব্দটা বিমের জানা! ও লাফিয়ে উঠে আহ্লাদে শেষ পর্যন্ত বন্ধুর থুতনি চেটে দিল।

'কাল শিকারে যাব, শিকারে যাব রে বিম!'

বিম্‌কে আর পায় কে! ও পাক খেতে লাগল, লাট্টুর মতন বনবন করে পাক খেয়ে নিজের লেজ ধরার চেষ্টা করতে লাগল, কিঁউ কিঁউ আওয়াজ করল, তারপর বসে পড়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইভান ইভানভিচের মুখের দিকে, উত্তেজনায় ওর সামনের দুই পায়ের লোমশ থাবাদুটি মৃদু কাঁপতে লাগল। 'শিকার' — এই কথাটি বিমের পরিচিত, ওর ওপর মন্ত্রের মতো কাজ করে, এ যেন ওর কাছে সুখের সঙ্কেত।

কিন্তু প্রভু আদেশ দিল:

'আপাতত ঘুমানো দরকার।' এই বলে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

বাকি রাতটা বিম্‌ শুয়ে রইল বন্ধুর খাটের পাশে। ঘুম কি আর আসে! ইভান ইভানভিচ নিজেও কখনও ঝিমোয়, কখনও বা জেগে ওঠে ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষায়।

সকালে ওরা একসঙ্গে রুকস্যাক গোছগাছ করে নিল, বন্দুকের তেল-জবজবে নল মুছল, হালকা জলখাবার খেয়ে নিল (শিকারে যেতে হবে — গণ্ডেপিণ্ডে খাওয়া চলবে না), বন্দুকের গুলি রাখার বেল্‌ট পরীক্ষা করে দেখল, খোপে খোপে কার্তুজ সাজিয়ে রাখল। গোছগাছ করে নিতে হল অল্প সময়ের মধ্যে, এইটুকু সময়ের মধ্যে কাজ করতে হল অনেক: প্রভু রান্নাঘরে — বিম্‌ও রান্নাঘরে, প্রভু ভাঁড়ার ঘরে যায় ত বিম্‌ও সেখানে, প্রভু রুকস্যাক থেকে টিনজাত খাবারের কৌটো টেনে বার করে (ভালোমতো রাখা হয় নি) — ত বিম্‌ সেটাকে তুলে নিয়ে ফের গুঁজে দেয়, প্রভু টোটা-গুলো ঠিক আছে কিনা দেখে — বিম্‌ সে দিকে নজর রাখে (প্রভু আবার ভুল না করে বসে); আর বন্দুকের খাপটাও কয়েকবার নাক ঠেকিয়ে দেখে নিতে হয় (বন্দুকটা ওখানেই আছে ত?); তার ওপর আবার এমন ব্যস্ততার মুহূর্তে কিনা উদ্বেগে-উত্তেজনায় কানের পেছন দিক চুলকোতে থাকে — ফলে থেকে থেকেই থাবা উঠিয়ে চুলকোতে হয়। ওঃ মরণ আর কী! অমনিতেই ঝঞ্ঝাটের চূড়ান্ত!

যা হোক, গোছগাছ হয়ে গেল। বিমের আনন্দ আর ধরে না। তা আর হবে না! প্রভু ততক্ষণে শিকারীর কোর্তা গায়ে এঁটেছে, শিকারীর থলি পিঠে তুলে নিয়েছে, বন্দুক নিয়েছে।

'শিকারে চল্‌ রে বিম! শিকারে চল্‌!' প্রভু আওড়াল।

'শিকারে, শিকারে!' বিম্‌ও উল্লসিত হয়ে চোখের ভাষায় বলল। এই

দুনিয়ায় তার একমাত্র বন্ধু এই লোকটার প্রতি ভালোবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠতে সে মৃদু কি'উ কি'উ আওয়াজ পর্যন্ত ছাড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন লোক এসে ঢুকল। লোকটাকে বিম্ চেনে — বাড়ির উঠোনে দেখেছে — কিন্তু বিমের কাছে তেমন একটা আকর্ষণীয় মনে হয় নি, ওর নিজের দিক থেকে লোকটার প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ দেবার তাগিদ ও বোধ করে নি। বেঁটে, মোটা, মুখটা চওড়া। সামান্য ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় লোকটা বলল:

'এই যে নমস্কার!' তারপর একটা টুলের ওপর বসে পড়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'আ-চ্-ছা... শিকারে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?'

'শিকারে, বনমোরগ শিকারে,' অসন্তুষ্ট স্বরে গাঁক গাঁক করে বলল ইভান ইভানভিচ।

'আ-চ্-ছা... শিকারে। একটু সময় দিতে হচ্ছে যে।'

বিম্ আশ্চর্য হয়ে গেল, প্রভুর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সমনো-যোগে আগন্তুকের দিকে তাকাল। ইভান ইভানভিচ প্রায় রেগে গিয়ে বলল:

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। স্পষ্ট করে বলুন।'

এই সময় বিম্, আমাদের মধুর স্বভাবের বিম্ প্রথমে মৃদু গরগর আওয়াজ করতে করতে হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বাড়িতে কোন কেউ এলে তাকে লক্ষ্য ক'রে? কস্মিনকালে এমন ঘটে নি! আগন্তুক তাতে ঘাবড়াল না, দেখে মনে হল এ ব্যাপারে সে নির্বিকার।

'জায়গায় যা!' ইভান ইভানভিচও রাগত স্বরে আদেশ দিল।

বিম্ আজ্ঞা পালন করল — সে তার চৌকিটার ওপর গিয়ে দুই থাবার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে তাকাতে লাগল অপরিচিত লোকটার দিকে।

'ইস্, দেখ কাণ্ড! কথা শোনে দেখছি। আ-চ্-ছা... তার মানে, খেঁকশিয়াল-টেকশিয়াল দেখলে যেমন করে, সদর দরজার সামনে বাড়ির বাসিন্দাদের দেখলে তাদের ওপরও তেমনি ঘেউ ঘেউ করে।'

একথায় ইভান ইভানভিচ উদ্বেগ বোধ করল, তার রাগও হল। সে বলল:

'কখ্খনো নয়, কখ্খনো কারও ওপরে ও ঘেউ ঘেউ করে না। এই প্রথম করল। হলফ করে বলছি। আর হ্যাঁ, খেঁকশিয়াল-টেকশিয়ালদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ওর নেই।'

'আ-চ্-ছা,' ফের টেনে টেনে বলল আগন্তুক। 'এবারে তাহলে কাজের কথায় আসা যাক।'

ইভান ইভানভিচ পিঠ থেকে থলি নামিয়ে রাখল, গায়ের কোর্তাটাও খুলল।

'বলুন, কী বলতে চান।'

আগন্তুক শুরু করল:

'আপনার হল গিয়ে কুকুর, আর আমি নিয়ে এসেছি এই যে এটা...' পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বিমের প্রভুর হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার কুকুরের নামে লিখিত অভিযোগ।'

কাগজটা পড়তে পড়তে ইভান ইভানভিচ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। বিম্ সেটা লক্ষ ক'রে যেন বন্ধুকে অদৃশ্য আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই স্বেচ্ছায় নিজের জায়গা থেকে নেমে এসে তার পায়ের কাছে গিয়ে বসল, কিন্তু এখন আর আগন্তুকের দিকে তাকাল না, যদিও হুঁশিয়ার থাকল।

ইভান ইভানভিচ এবারে অনেকটা শান্ত কণ্ঠে বলল:

'এখানে গুচ্ছের বাজে কথা লেখা। স্রেফ বাজে। বিম্ মিষ্টি স্বভাবের কুকুর, ও কাউকে কামড়ায় নি, কামড়াবেও না, কারও কোন যন্ত্রণার বা দুঃখের কারণ ও হতে পারে না। বুদ্ধিমান কুকুর।'

'হে-হে-হে!' ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ বেমক্কা হেঁচে ফেলল আগন্তুক। 'আহা, নিরীহ বেচারি!' অমায়িক ভাব দেখিয়ে বিমের উদ্দেশে সে বলল।

বিম্ আরও বেশি করে একপাশে মুখ ঘুরিয়ে নিল, তবে ওর বুঝতে বাকি রইল না যে ওকে নিয়েই কথা হচ্ছে। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ইভান ইভানভিচ এবারে সম্পূর্ণ শান্ত কণ্ঠে, মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল:

'কোন অভিযোগের বিচার করতে হলে আপনি এই ভাবে করেন নাকি? যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ লেখা হয়েছে তাকেই কিনা পড়তে দিচ্ছেন! আমাকে মুখে বললেই ত হত, আমি আপনাকে অমনিতেই বিশ্বাস করতাম।'

বিম্ আগন্তুকের চোখে হাসির ছটা লক্ষ করল।

'প্রথমত এটাই নিয়ম। দ্বিতীয়ত, অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে নয়,

আপনার কুকুরের বিরুদ্ধে। কুকুরকে ত আর আমরা পড়তে দিচ্ছি না।' বলে লোকটা হাসতে লাগল।

বিমের প্রভুও মৃদু হাসল। বিম্ কিন্তু একটুও হাসল না — সে বুঝতে পারছিল যে তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে, কিন্তু কী ব্যাপার, কী বৃত্তান্ত তা সে বুঝতে পারল না — নাঃ লোকটা দেখছি বড়ই দুর্বোধ্য!

'কুকুরটাকে দূর ক'রে দিতে হবে।' বিমের দিকে আঙুল উঁচিয়ে এই কথা বলে আগন্তুক হাত নেড়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল।

বিমের বুঝতে বাকি রইল না ওর কাছ থেকে লোকটা কী চাইছে — ওকে চলে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে ও এক পাও সরল না।

ইভান ইভানভিচ বলল:

'তা যিনি অভিযোগ করেছেন তাঁকে একবার ডাকুনই না — কথা ব'লে দেখা যাক, হয়ত বা মিটমাট করে ফেলা যাবে।'

আগন্তুকের কাছ থেকে যা আশা করা যায় নি, একথায় তা-ই ঘটল — সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিছুক্ষণ বাদেই এসে ঢুকল এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে।

'এই যে খুড়ীকে নিয়ে এলাম।'

মহিলাটিকে বিম্‌ও জানত — বেঁটেখাটো গড়নের, শরীরে মেদের আধিক্য, খিটখিটে মেজাজের, বাড়ির আঙ্গিনায় একটি বেঞ্চে সর্বক্ষণ বসে থাকে আরও কিছু হাত-পা ঝাড়া মহিলাদের সঙ্গে। একবার বিম্ তার হাতও চেটেছিল (ব্যক্তিগতভাবে মহিলার প্রতি আবেগে গদগদ হয়ে ঠিক নয়, সাধারণভাবে মানুষের প্রতি অনুভূতি বশতই ও এটা করে), ফলে সে হাউমাউ ক'রে ওঠে, পাড়ার বাড়িগুলোর খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে সারা উঠোন মাত ক'রে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। চিৎকার-চেঁচামেচি করে সে কী বলে বিম্ বুঝতে পারে নি, ও ঘাবড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালায়, বাড়ির দরজায় গিয়ে দরজার গা আঁচড়াতে থাকে। খুড়ীর কাছে এছাড়া আর কোনো অপরাধে ও অপরাধী নয়। এখন সেই খুড়ীরই আগমন ঘটল। দেখে ত ওর অবস্থা কাহিল! ও প্রথমে প্রভুর পায়ের কাছে ঘেঁসে এলো, প্রভু যখন ওর গায়ে হাত বুলাল তখন ও লেজ গুটিয়ে নিজের চৌকিতে উঠে গিয়ে সেখান থেকে আড়চোখে মহিলাকে দেখতে লাগল। বিম্ খুড়ীর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না,

খুড়ী বারবার হাত নেড়ে ছাতার পাখির মতো কিচিরমিচির করে যাচ্ছিল। তবে তার কটমটে চাউনি আর ভাবভঙ্গি দেখে বিম্ বুঝতে পারল সে ভুল লোককে চেটেছিল বলেই এত কাণ্ড। বিমের বয়স কম, বড় কম, এখনও ও অনেক কিছু বুঝতে পারে না। ও হয়ত মনে মনে ভাবছিল: 'অপরাধ অবশ্যই করে ফেলেছি, কিন্তু এখন আর কী করা যাবে?' অন্তত ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল ও এই রকমই কিছু একটা বলতে চায়।

কিন্তু বিমের কখনও এটা মনে হয় নি যে ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।

'কামড়াতে গিয়েছিল! কাম্-ড়াতে গিয়েছিল! আরেকটু হলেই কামড়ে দিয়েছিল!'

ইভান ইভানভিচ মহিলার বকবকানি মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সরাসরি বিমের উদ্দেশে বলল:

'বিম্, আমার চটিজোড়া এনে দে ত।'

বিম্ সোৎসাহে আজ্ঞা পালন করে প্রভুর সামনে শুয়ে পড়ল। ইভান ইভানভিচ শিকারীর জুতো খুলে ফেলে পায়ে চটি গলাল।

'আচ্ছা, এবারে বুটজোড়া নিয়ে যা।'

বিম্ এ কাজটাও করল — একটা একটা করে দুটো জুতো নিয়ে এসে আলনার নীচে রেখে দিল।

খুড়ীর মুখে বাক্য সরল না, তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আগন্তুক তারিফ করে বলল:

'সাব্-বাস! দেখ কাণ্ড, এলেম আছে দেখছি। আরও কিছু পারে নাকি?' শেষ কথাগুলো বলার সময় মহিলার দিকে কেমন যেন একটা বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাল সে।

ইভান ইভানভিচ মহিলাকেও অনুরোধ জানাল:

'বসুন, বসুন না আপনি।'

মহিলা আঁচলের তলায় দুহাত গুটিয়ে বসল। ইভান ইভানভিচ বিমের সামনে চেয়ার রেখে আদেশ দিল:

'বিম্! চেয়ারে উঠে আয়!'

বিম্‌কে দ্বিতীয়বার কোন কথা বলতে হয় না। এখন সবাই চেয়ারে বসে। খুড়ী ঠোঁট কামড়াল। আগন্তুক সন্তুষ্টচিত্তে পা নাচাতে নাচাতে বলল:

'ভালো, বেশ হচ্ছে, দিব্যি।'

এদিকে বিমের প্রভু বিমের দিকে তাকিয়ে কায়দা করে চোখ টিপল, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'আচ্ছা, এবারে তোর থাবাটা দে দেখি।'

ওরা হাতে হাত মেলাল।

'ওরে বোকাটা, এব্যারে অতিথির হাতে হাত মিলিয়ে ওঁকে নমস্কার জানা দেখি।' এই বলে আঙুল দিয়ে আগন্তুককে দেখিয়ে দিল।

আগন্তুক হাত বাড়াল।

'আচ্ছা, কেমন আছ ভাই, কেমন আছ?'

বিম্ যেমন যেমন করা উচিত সব মার্জিত ভাবে করে গেল।

মহিলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কামড়াবে না?'

ইভান ইভানভিচ অবাক হয়ে বলল:

'কী যে বলেন! হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলুন: 'দেখি থাবা!'

প্রৌঢ়া সত্যি সত্যিই আঁচলের তলা থেকে হাত বার করে বিমের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'তবে হ্যাঁ, কামড়াবি না কিন্তু,' সে ওকে সাবধান করে দিল।

কিন্তু এর পর যা ঘটল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বিম্ তড়াক করে লাফিয়ে চলে গেল তার চৌকিতে, তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে শরীরের পিছন দিক ঠেকিয়ে কোনা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রভুর দিকে। ইভান ইভানভিচ ওর দিকে এগিয়ে এসে গায়ে হাত বুলাল, গলার কলার ধরে টেনে নিয়ে এলো অভিযোগকারিণীর কাছে।

'দে, থাবা বাড়িয়ে দে...'

না, বিম্ থাবা বাড়িয়ে দিল না। মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। এই প্রথম কথার অবাধ্য হল। মুখ গোমড়া করে পায়ে পায়ে ফের চলে গেল কোনায় — ধীর মন্থর গতিতে, কাচুমাচু ভাব করে, নিরুৎসাহ হয়ে।

ওঃ তারপর যা কান্ডটা ঘটল! প্রৌঢ়া যেন শুকিয়ে চিড় খেয়ে ঝনঝন শব্দে ফেটে পড়ল। ইভান ইভানভিচের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল:

'তুমি আমাকে অপমান করলে! কোথাকার এক নেড়ী কুত্তা কিনা আমাকে, একজন সোভিয়েত নারীকে গেরাহ্যিই করে না!' বিমের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল:

'আচ্ছা, আচ্ছা... আমি... দাঁড়া না!'

'যথেষ্ট হয়েছে!' আগন্তুক আচমকা মহিলার ওপর খেঁকিয়ে উঠল। 'দেখাই যাচ্ছে গুচ্ছের বাজে বাজে কথা বলছ। ও তোমাকে কামড়ায় নি, কামড়ানোর কোন মতলব পর্যন্ত ওর ছিল না। ও যে তোমাকে দেখে ভয়েই জড়সড়!'

প্রৌঢ়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় বলল:

'তুমি তাই বলে অমন গলা ফাটিও না।'

'চোপ!' আগন্তুক এক কথায় নিজের বিরক্তি প্রকাশ করে ইভান ইভানভিচকে বলল, 'এদের মতো মানুষের সঙ্গে এমন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।' এর পর ফের প্রৌঢ়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হুঃ 'সোভিয়েত নারী', আহা কী কথা! যাও এখান থেকে!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আরও একবার গোলমাল পাকিয়ে দেখ না, বেইজ্জতি করে ছেড়ে দেব। যাও বলছি!' অভিযোগ লেখা কাগজটি মহিলার চোখের সামনে সে ছিঁড়ে ফেলল।

আগন্তুকের শেষ কথাগুলো বিম্ বেশ ভালো বুঝতে পারল। খুড়ী সদর্পে মাথা উঁচিয়ে কারও দিকে দৃষ্টিপাত না করে চুপচাপ চলে গেল, যদিও বিম্ এখন তার ওপর তীক্ষ্মদৃষ্টি রাখল, এমন কি সে চলে যাবার পর, তার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবার পরও দরজার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল না।

ইভান ইভানভিচ বলল:

'আপনি কিন্তু ওঁর সঙ্গে বেশ খানিকটা অভদ্রতাই করলেন।'

'এছাড়া কোন উপায় ছিল না, আপনাকে বলে রাখলাম: গোটা পাড়ায় ঘোঁট পাকিয়ে বেড়ায়। আমি জানি বলেই বললাম। এই যে এসব ঘোঁটবাজ আর নিন্দুকের দল আমার কোথায় বসে আছে,' এই বলে সে নিজের ঘাড়ে চাপড় মারল। 'কাজকম্ম বলতে কিছু নেই, তাই কেবল মতলব আঁটে কার ওপর কামড় বসাবে। এসব লোককে লাই দিলে গোটা বাড়িটা রসাতলে যেতে দেরি হবে না।'

বিম্ সর্বক্ষণ ওদের দুজনের মুখভঙ্গি, হাবভাব ও কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল, বেশ বুঝতে পারল যে আগন্তুক লোকটি আর ওর প্রভু আদৌ শত্রু নয়, এমন কি দেখেশুনে এটাই মনে হয় যে ওরা একে অন্যকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। বিম্ আরও অনেকক্ষণ ওদের ওপর নজর রাখল, পরে ওরা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেও বিম্ কিন্তু

দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। একবার যখন মূল বিষয়টা ও ঠিক ধরতে পারল তখন বাদবাকি ব্যাপারে ওর তেমন কোন উৎসাহ রইল না। বিম্ আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল, যেন বলতে চায়: 'আপরাধ নেবেন না।'

প্রভুর রোজনামচা থেকে

আজ হাউসিং এস্টেটের সভাপতি এসেছিল, কুকুর সম্পর্কে অভিযোগের তদন্ত করল। বিমেরই জয় হল। আমাদের আগন্তুক কিন্তু রাজা সলোমনের মতো ন্যায় বিচার করল। লোকটা স্বভাবগুণী বলতে হয়!

গোড়ায় বিম্ কেন তার ওপর গর্জন করে উঠল? ও হ্যাঁ, বুঝেছি! আমি যে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিই নি, সে ঢুকতে তার দিকে কটমট করে তাকাই (শিকারের দফারফা হয়ে গেল ভেবে)! বিম্ও তাই ওর কুকুরসুলভ স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করল — প্রভুর শত্রু মানে আমারও শত্রু। এক্ষেত্রে লজ্জা আমারই হওয়া উচিত, বিমের নয়। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় কথা বলার ভঙ্গি, মুখভঙ্গি, হাবভাব উপলব্ধি করার কী সূক্ষ্ম ক্ষমতাই না বিমের আছে! এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

পরে হাউসিং এস্টেটের সভাপতির সঙ্গে আলোচনা বেশ জমে উঠল। শেষ কালে সে আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে লাগল। বলল:

'একবার ভেবে দেখ — আমার এই বাড়িতে দেড়শটি ফ্ল্যাট! কিন্তু চার-পাঁচটা ঘোঁটবাজ নিষ্কর্মা লোক হলেই হয়ে গেল — আর দেখতে হবে না, এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসবে যে সকলের তিষ্ঠোন দায় হবে। সবাই ওদের জানে, সবাই ভয় পায়, শাপ-শাপান্তও যে একেবারে করে না এমন নয়। আরে বাবা, লোক খারাপ হলে ঘরের বেসিনও তাকে ছেড়ে কথা বলে না। সত্যি বলছি! আমার পরম শত্রু কে? কে আবার? — যে কাজ করে না। আমাদের এখানে ভাই কাজ না করেও খেয়েদেয়ে দিব্যি ভুঁড়ি বাগানো যায়। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে। যেমন হওয়া উচিত, তেমন নয়। ইচ্ছে হয় কাজ কর, আবার কাজ নাও করতে পার। বোঝ কাণ্ড! এই তোমার কথাই ধরা যাক না কেন, তুমি কী কর?'

'লিখি,' আমি বললাম, যদিও বুঝতে পারলাম না ঠাট্টা করছে, নাকি গুরুত্ব দিয়ে বলছে (রসিক লোকেরা অনেক সময় এমন ভাব করে যে বোঝা ভার)।

'আরে ছোঃ, এটা আবার একটা কাজ হল! বসে বসে সময় কাটানো — কাজ নেই, কম্ম নেই, তা টাকাকড়ি দেয় ত?'

'দেয়,' আমি জবাব দিলাম। 'তবে টাকা আমি কমই পাই। বয়স হয়ে গেছে, পেন্‌শনের ওপর আছি আর কি।'

'আর পেনশনের আগে — কী কাজ করতে?'

'আমি সাংবাদিক। খবরের কাগজে কাজ করতাম। আর এখন ঘরে বসে একটু-আধটু লিখি।'

'লেখ?' তার প্রশ্নের মধ্যে কৃপার ভাব ফুটে উঠল।

'লিখি।'

'বেশ, তা-ই যদি হয় ত চালিয়ে যাও। এটা অবিশ্যি ঠিক যে তুমি লোকটা মন্দ নও — দেখে শুনে ত তা-ই মনে হয়। অথচ দেখ দেখি... বলছিলাম না! আমিও পেনশন পাই, একশ রুবল, কিন্তু কাজ করি হাউসিং এস্টেটের সভাপতি হিশেবে, বিনা বেতনে কাজ করি, মনে রাখবে। সারাটা জীবন কর্তৃস্থানীয় কাজ করা আমার অভ্যেস, ঐ সব পোস্টের বিশেষ লিস্টি থেকে কেউ আমাকে কখনও বাদ দিতে পারে নি, দ্বিতীয় ধাপে কখনও নামতে হয় নি। কেবল শেষের দিকে লিস্টি থেকে খারিজ করে দেওয়া হল — নামাতে নামাতে নামিয়ে দেওয়া হল অনেক নীচে। শেষ কাজের জায়গা একটা ছোট্ট কারখানা। সেখান থেকেই পেনশন। কিন্তু পার্সোনাল পেনশন আমার জুটল না — ছোটখাটো একটা খিঁচ আছে... মানুষমাত্রের কাজ করা উচিত। আমার এই মত।'

'কিন্তু আমার কাজও ত কঠিন,' আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলাম।

'লেখার কথা বলছ? রাবিশ। তোমার বয়স যদি কম হত, তাহলে তোমাকে আমি এক হাত দেখে নিতাম। কিন্তু তুমি যখন পেনশনভোগী তখন আর কথা চলে না। তবে হ্যাঁ, কমবয়সী কেউ যদি কাজ না করে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব — হয় কাজ কর, নয়ত দূর হয়ে যাও এখান থেকে।'

লোকটা ঠিকই এই বাড়িতে নিষ্কর্মাদের কাছে একটা যমের মতো। মনে হয় এখন তার জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান যত সব নিষ্কর্মা, নিন্দুক লোকজন আছে, আর যারা পরের অন্ন ধ্বংস করে, তাদের সবাইকে তুলোধুনো করা; তবে সে যে-কাউকে শিক্ষা দিয়ে থাকে কোন বাছবিছার না করে — আর এ ব্যাপারে তার উৎসাহের কমতি নেই। লেখাও যে একটা কাজ এটা তার সামনে প্রমাণ করতে পারা অসম্ভব বলেই মনে হল — এক্ষেত্রে

সে হয় চালাকি খাটিয়ে কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য রসিকতা করে ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছে, নয়ত স্রেফ অনুকম্পা প্রকাশ করছে (ভাবটা এই যে তা লিখুক গে যাক — এর চেয়েও কট্টর নিষ্কর্মা লোক আছে)।

যাবার সময় তাকে বেশ প্রসন্ন দেখা গেল, ছলচাতুরী ছেড়ে দিয়ে সরল ভাবে সে বিমের গায়ে হাত বুলাল, বলল:

'তা তুই থাক্ তোর মনে, বুঝলি। খুড়ীকে ঘাঁটাতে যাস না, বুঝলি?' তারপর আমার উদ্দেশে বলল, 'আচ্ছা, চালিয়ে যাও। লেখ, লেখ, না লিখে উপায় আর কি? কাজটাই যখন এই।'

আমরা পরস্পরের করমর্দন করলাম। বিম্ তার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে লেজ নাড়াতে নাড়াতে দোরগোড়া পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল। বিমের আলাপ হল একজন নতুন লোকের সঙ্গে: তার নাম পাভেল তিতিচ রিদায়েভ — সংক্ষেপে সকলে যাকে 'পাল্ তিতিচ্' বলে ডাকে।

তবে একজন শত্রুও বিমের জুটল — সেই খুড়ীটি, পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে একমাত্র মানুষ যাকে বিম্ বিশ্বাস করে না। কুৎসা রটিয়েকে কুকুর ঠিকই সনাক্ত করতে পেরেছে।

কিন্তু আজকের মতো শিকারের দফারফা হয়ে গেল। দেখা যায় মানুষ হয়ত আশা করে আছে দিনটা ভালো যাবে, কিন্তু এসে জুটল যত রাজ্যের উৎপাত। এমন ত হয়ই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হলুদ বন

এই ঘটনার পর এক দিন ওরা দুজনে বাড়ি থেকে বেরোল। প্রথমে ওরা চলল ট্রামে চেপে, ট্রামের পাদানীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যে মেয়েটি ট্রাম চালাচ্ছিল দেখা গেল সে ইভান ইভানভিচ ও বিম্ দুজনেরই চেনা। ড্রাইভার-মেয়েটি যখন ট্রাম লাইনের পয়েণ্ট বদল করার জন্য বেরিয়ে এলো তখন বলাই বাহুল্য, বিম্ তাকে সম্ভাষণ জানাল। মেয়েটি বিমের কানের পেছনটা নেড়ে দিয়ে ওকে আদর করল, কিন্তু বিম্ হাত চাটল না, কেবল থাবা-গুলো একটু আধটু নাড়িয়ে নড়েচড়ে বসল, ঝটপট শব্দে লেজ নেড়ে এর উত্তরে যথোচিত প্রতিসম্ভাষণ জানাল।

এর পর একেবারে শহরের বাইরে গিয়ে ওরা বাসে চাপল। তখন খুব ভোরবেলা, এই সময় বাসে লোকও ছিল কম — সাকুল্যে পাঁচ-ছয়জন।

বাসে চড়ার সময় ড্রাইভার 'কুকুর' আর 'নিয়ম নেই' এই কথাগুলো কয়েকবার আউড়ে গজগজ করে কী সব যেন বলল। বিম্ সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল — ড্রাইভার ওদের নিতে চায় না, গতিক সুবিধের নয় — মুখ দেখে বুঝতে বাকি রইল না। যাত্রীদের মধ্যে একজন ওদের পক্ষ নিল, আরেকজন আবার উলটে ড্রাইভারকে সমর্থন করল। বিম্ প্রবল আগ্রহভরে কথা কাটাকাটি লক্ষ করতে লাগল। শেষকালে ড্রাইভার বাস থেকে বেরিয়ে এলো। বাসের দরজার সামনে বিমের প্রভু ড্রাইভারের হাতে হলদেটে রঙের একটা কাগজ ধরিয়ে দিল, বিম্‌কে সঙ্গে নিয়ে দরজার সামনের ধাপে পা রেখে ওপরে উঠল, সীটে বসে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিষণ্ন ভাবে বলল: 'ধুত্তোর!'

বিম্ অনেক দিন হল লক্ষ করেছে লোকে নিজেদের মধ্যে কী যেন সব কাগজপত্র চালাচালি করে, সেগুলো থেকে যে কিসের গন্ধ বেরোয় বোঝা ভার। একবার সে টেবিলে রাখা কাগজগুলোর মধ্যে একটায় রক্তের গন্ধ টের পেল। ওটাতে নাক ঠেকিয়ে প্রভুর মনোযোগ আকর্ষণেরও চেষ্টা করল, কিন্তু প্রভু নির্বিকার। তা ত হবেই — ঘ্রাণশক্তি থাকলে ত! আর সেই এক কথা: 'অমন করে না।' শুধু কী তাই? কাগজগুলো টেবিলের টানার ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দিল। অবশ্য আরেক কথা — যখন ওগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তখন ওগুলোতে রুটির, সসেজের, মোটের ওপর একটা দোকান-দোকান গন্ধ থাকে; কিন্তু বেশির ভাগ কাগজেই গন্ধ পাওয়া যায় অসংখ্য হাতের। লোকে এই কাগজগুলোকে পছন্দ করে, বিমের প্রভুর মতো তারাও এগুলোকে পকেটে কিংবা টেবিলের টানার ভেতরে লুকিয়ে রাখে। এ সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারের বিন্দুবিসর্গ বিমের বোধগম্য না হলেও একটা জিনিস কিন্তু সে অনায়াসে বুঝে ফেলল: ড্রাইভারকে প্রভু যেই কাগজটা দিল অমনি ত্যদের মধ্যে আর কোন বিবাদ রইল না। তবে ইভান ইভানভিচ যে কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বন্ধুর চোখ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার পরও বিম্ ধরতে পারল না। মোটের ওপর, কাগজের ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা পর্যন্ত তার পক্ষে করা সম্ভব হল না — এটা কুকুরের বুদ্ধির অগম্য; ও জানত না এই কাগজ কোন এক সময় ওর সর্বনাশের কারণ হয়ে দেখা দেবে।

হাইওয়ে থেকে বন পর্যন্ত ওরা গেল পায়ে হেঁটে।

ইভান ইভানিভচ বনের ধারে এসে থামল জিরিয়ে নেওয়ার জন্য, এই ফাঁকে বিম্ কাছাকাছি এলাকাটা খ্ুঁটিয়ে খ্ুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এরকম বন এর আগে ও কখনও দেখে নি। বন ত আসলে সেই একই বন — বসন্তকালে ওরা এখানে এসেছিল, গ্রীষ্মকালেও (অমনি, ঘ্রের বেড়াতে), কিন্তু এখন চারধারে সব কেবল হল্দ আর হল্দ, লাল টকটকে — মনে হচ্ছিল ব্ঝি স্র্যের আলোয় এখানে সব জ্বলছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে।

গাছপালা সবে তাদের পরিচ্ছদ ছাড়তে শ্রু করেছে, গাছের পাতা বাতাসে দোল খেতে খেতে লীলায়িত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে খসে পড়ছে। ম্দ্ ঠান্ডার আমেজ, একটা সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব সর্বত্র, তাই বেশ ফুর্তি-ফুর্তি লাগছিল। শরতের বনভূমির একটা বিশেষ গন্ধ আছে, এ গন্ধ অন্পম, দীর্ঘস্থায়ী আর বিশ্দ্ধ — এতই বিশ্দ্ধ যে বিম্ বহ্ দ্র থেকে প্রভুর অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল। মেঠো ইঁদ্রকে ও অনেক দ্রে থাকতেই 'ধরে ফেলল', কিন্তু তার পিছ্ নিল না (ওর ত জানাই আছে — তুচ্ছ ব্যাপার!), কিন্তু জীবন্ত কিসের যেন একটা ঘ্রাণ দ্র থেকে ধক করে নাকে এসে লাগতে বিম্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারে কাছাকাছি এগিয়ে এসে অসংখ্য কাঁটাওয়ালা একটা গোল পিন্ড দেখতে পেয়ে বিম্ তারস্বরে হাঁকডাক শ্রু করে দিল।

ইভান ইভানভিচ একটা কাটা গ্ঁড়ির ওপর বসে ছিল, ডাক শ্নে উঠে দাঁড়িয়ে বিমের কাছে এগিয়ে এলো।

'না বিম্, অমন করে না! ধরে না, ওরে বোকা। এটাকে বলে কাঁটাচুয়া। পেছনে! পেছনে চলে আয়!' এই বলে বিম্কে ওখান থেকে সরিয়ে আনল।

তার মানে, দেখা যাচ্ছে, কাঁটাচুয়া একটা খ্দে জন্তু, আর জন্তুটা ভালোও বটে, কিন্তু ওকে ছ্ঁতে মানা।

এবারে ইভান ইভানভিচ ফের গাছের কাটা গ্ঁড়িটার ওপর গিয়ে বসল, বিম্কেও বসতে হ্কুম করল, নিজে মাথার ক্যাপটা খ্লে পাশে মাটিতে রেখে গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে রইল, কান পেতে রইল বনের অশ্রুত নীরবতায়। আর বলাই বাহ্ল্য হাসছিল! শিকারের শ্রুতে তাকে সাধারণত যেমন দেখায় এখন তাকে তেমনি দেখাচ্ছিল।

বিম্ও কান পেতে শ্নছিল।

একটা ছাতারপাখি উড়ে এসে নির্লজ্জের মতো কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে পালিয়ে গেল। ডাল থেকে ডালে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো

একটা দোয়েলপাখি, তারস্বরে শিস দিয়ে উঠে ডালে ডালে লাফাতে লাফাতেই পালিয়ে গেল ওখান থেকে। এদিকে খুদে কিংলেটটার কান্ড দেখ! — একেবারেই সামনে চলে এসেছে, ডাকছে: 'চিক্, চিক্, চিক্!' নাঃ, পারা যায় না ওকে নিয়ে! দেখতে ত ঐ একরত্তি — গুবরে পোকার সমান, কিন্তু দেখ ডাক ছাড়ছে কেমন: 'চিক্, চিক্, চিক্!' যেন সংবর্ধনা জানাচ্ছে!

এছাড়া কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই — সর্বত্র নিস্তব্ধতা।

অবশেষে প্রভু উঠে দাঁড়াল, খাপ খুলে বন্দুক বার করল, বন্দুকে গুলি ভরল। উত্তেজনায় বিম্ কাঁপতে লাগল। ইভান ইভানভিচ ওর মাথার পেছনের ঝাঁকড়া লোম ধরে নাড়িয়ে ওকে আদর করল, ফলে বিম্ আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

'আচ্ছা, বেটা... এবারে খোঁজ!'

বিম্ চলল। গাছপালার পাশ কাটিয়ে, স্প্রিংয়ের মতো দুলতে দুলতে, গুড়ি মেরে, প্রায় নিঃশব্দে, গুটি গুটি পায়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলল। ইভান ইভানভিচ ধীরে ধীরে ওর পিছন পিছন চলতে লাগল, বন্ধুর কাজ দেখে সে তারিফ না করে পারছিল না। এখন বন, বনের সমস্ত সৌন্দর্য গৌণ হয়ে গেছে, মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে বিম্, ওর সাবলীল, উদ্দীপনাময় লঘু চলনভঙ্গি। মাঝে মাঝে ডেকে এনে ইভান ইভানভিচ ওকে শুয়ে থাকার আদেশ দিচ্ছে, যাতে ওর উত্তেজনাটা কমে আসে, কাজের সঙ্গে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। দেখতে দেখতে বিম্ এগিয়ে চলল সমতালে, এখন ও নিজের কাজ জানে। 'সেটারের' কাজ — একটা বড় রকমের শিল্প! বিম্ চলেছে মাথা উঁচু করে, স্বচ্ছন্দ দ্রুত তালে; মাথা নুইয়ে, হেঁট হয়ে সন্ধান চালানোর প্রয়োজন নেই ওর। ও এখন উঁচু হয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে, এই অবস্থায় ওর রেশম-কোমল লোম সুগঠিত ঘাড়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে ও অমনিতেই সুন্দর, তায় আবার মাথা উঁচু করে চলেছে মর্যাদাভরে, আত্ম-বিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে।

এই সব মুহূর্ত ইভান ইভানভিচের কাছে ছিল আত্মবিস্মৃতির মুহূর্ত। সে ভুলে যেত যুদ্ধের কথা, ভুলে যেত বিগত জীবনের দুঃখকষ্ট আর নিজের নিঃসঙ্গতা। এমন কি তার পুত্র, তার নাড়ির বন্ধন, যাকে নিষ্ঠুর যুদ্ধ ছিনিয়ে নিয়েছে, সেও যেন এই সময় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, মনে হত পুত্র মৃত হওয়া সত্ত্বেও তাকেও যেন পিতা আনন্দ দান করছে। সেও যে শিকারী ছিল! ভালোবাসার পাত্র মৃত হলেও দূরে সরে যেতে পারে না। মৃতব্যক্তির

বয়স ত বাড়েই না, উপরন্তু যে অবস্থায় সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল জীবিত প্রিয়জনের স্মৃতিতে সে তেমনই রয়ে যায়। ইভান ইভানভিচের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি — হৃদয়ের ক্ষত তার শুকিয়ে গেলেও ক্ষতস্থান সব সময় ব্যথা করে। শিকারের সময় হৃদয়ের যে-কোন ব্যথা অন্তত সামান্য হাল্কা ত হয়ই। শিকারী হয়ে জন্মানোর এটাই একটা মস্ত সুবিধা।

দেখতে দেখতে বিমের গতি মন্থর হয়ে এলো, মাকুর ভঙ্গিতে চলন ও সঙ্কীর্ণ করে ফেলল, মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গুটি গুটি পায়ে গুঁড়ি মেরে চলল। তার গতিভঙ্গির মধ্যে, মৃদু, সতর্ক ও লীলায়িত গতিভঙ্গির মধ্যে মার্জার প্রকৃতিসুলভ কী যেন একটা ছিল। এখন ওর মাথাটা টান টান হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় ধড়ের সঙ্গে এক সমতলে এসে গেছে। ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা প্রসারিত লেজটা পর্যন্ত ঘ্রাণের ক্ষীণধারা গ্রহণের জন্য একাগ্র হয়ে উঠেছে। পদক্ষেপের সময় উঠছে কেবল একটি থাবা। আরও একটি পদক্ষেপ — পরের থাবাটিও আগের মতোই বেশ কিছুক্ষণের জন্য উঠে শূন্যে স্থির হয়ে থেকে নিঃশব্দে নেমে এলো মাটিতে। শেষকালে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, এবারেও তেমনি, বিমের সামনের ডান থাবাটা শূন্যে উঠে স্থির হয়ে রইল, মাটি ছুঁল না।

পেছন পেছন বন্দুক বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে এলো ইভান ইভানভিচ। এখন দুটি প্রস্তরমূর্তি — কুকুর আর মানুষ।

বনভূমি নিস্তব্ধ। কেবল সূর্যের উজ্জ্বল ধারায় অবগাহন করতে করতে বার্চ গাছের সোনালি পাতাগুলো সামান্য ক্রীড়াচাঞ্চল্য প্রকাশ করছিল। পরম গরিমাময় দৈত্যাকার ওক গাছগুলোর পাশে, পিতৃপিতামহ আর প্রপিতামহদের পাশে জড়সড় হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ ওক গাছেরা। অ্যাস্প গাছের শাখায় যে কয়েকটা ধূসর-রুপোলি পাতা রয়ে গেছে সেগুলো নিঃশব্দে মৃদু মৃদু কাঁপছে। আর হলুদ ঝরাপাতার রাশির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুরটি — প্রকৃতি আর ধৈর্যবান মানুষের এক পরম সৃষ্টি। শরীরের একটি পেশীও কাঁপছে না! এই সব মুহূর্তে বিম্‌কে দেখলে মনে হয় ও যেন জীবন্মৃত — এটা অনেকটা ভাববিহ্বল অবস্থার মতন। একেই বলে হলুদ বনে শিকারী কুকুরের ক্লাসিক স্থির ভঙ্গি।

'সামনে বেটা, সামনে...'

বিমের তাড়া খেয়ে বনমোরগ পাখনা মেলে উড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি!

বন চমকে উঠল, জবাবে ক্ষুব্ধ বিরক্ত হয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। মনে হল ওক আর অ্যাস্প উপবনের সীমান্তে যে বার্চ গাছটা চড়াও হয়েছে সেটা যেন ভয়ে শিউরে উঠল। মহাকায় ওক গাছেরা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। পাশের অ্যাস্প গাছটা কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি করে এক রাশ পাতা ঝরিয়ে দিল।

বনমোরগটা একটা ডেলার মতো ধপ করে মাটিতে এসে পড়ল। বিম্ নিয়মমাফিক ঠিক যেমন করা উচিত সেই ভাবে প্রভুকে শিকারটা তুলে দিল। প্রভু বিম্‌কে আদর করল, নিখুঁত কাজের জন্য ওকে কৃতজ্ঞতাও জানাল, কিন্তু পাখিটা করতলে তুলে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে প্রভু বিষণ্ণকণ্ঠে চিন্তিত ভাবে বলল:

'এঃ, না হলেই হত...'

বিম্ ইভান ইভানভিচের মুখের দিকে ভালো করে তাকাল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। ইভান ইভানভিচ বলে চলল:

'কেবল তোর জন্যেই রে বোকাটা, তোর জন্যেই করতে হয়। অমনিতে কোন মানে হয় না।'

এবারেও বিম্ বুঝতে পারল না — এমন জিনিস বোঝা ওর অসাধ্য। কিন্তু সেদিনকার গোটা শিকারপর্বে বন্দুকধারী এই শিকারীটি অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। প্রভু একটা বনমোরগও গুলি করে মারতে পারল না দেখে কুকুর বিম্ দারুণ বিরক্ত হল। অথচ শেষ পাখিটাকে প্রভু নিখুঁত হাতে গুলি ছুড়ে ঘায়েল করল।

বাড়িতে যখন ওরা ফিরে এলো ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। দুজনেই ক্লান্ত, তবে প্রসন্ন, পরস্পরের প্রতি প্রীতিমুগ্ধ। বিম্ ত ওর নিজের তক্তপোষের ওপর শুতেই চায় না, সেখান থেকে বিছানা টেনে ইভান ইভানভিচের খাটের কাছে নিয়ে এসে পাশে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। ওর এই আচরণের মধ্যে একটা অর্থ ছিল — ওকে 'জায়গায় যা' বলে তাড়িয়ে দেওয়ার উপায় থাকছে না, কারণ 'জায়গা' ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ইভান ইভানভিচ ওর কানের পিছন দিক হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল, দুই কাঁধের উঁচু দুই ফলকে মৃদু চাপড় মারল। বন্ধুত্বটা মনে হচ্ছে পাকাপোক্তই হবে।

রাতের বেলায় কিন্তু ইভান ইভানভিচ কেন যেন অস্ফুট স্বরে গোঙাতে লাগল, বিছানা ছেড়ে উঠে ট্যাবলেট খেল, আবার শুয়ে পড়ল। বিম্ প্রথমে সতর্ক হয়ে কান পেতে শুনল, বন্ধুর দিকে তাকাল, তারপর উঠে খাট থেকে বন্ধুর হাত বেরিয়ে থাকতে দেখে সেটা চাটল।

'গোলার টুকরো রে বিম্, গোলার টুকরো... নড়াচড়া করছে। খারাপ লাগছে রে, বেটা,' হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে ইভান ইভানভিচ বলল।

'খারাপ' — এই শব্দটা বিমের ভালোই জানা ছিল, বহুকাল ধরেই ওটা ওর জানা। আর 'গোলার টুকরো' কথাটাও ও অনেকবার শুনেছে, কিন্তু কথাটা ও বুঝতে পারত না। বুঝতে না পারলেও কুকুরের সহজাত বোধশক্তি দিয়ে আন্দাজ করতে পারত যে এর মধ্যে উদ্বেগজনক, অশুভ, ভয়াবহ একটা কিছু আছে।

কিন্তু সব ভালোয় ভালোয় কেটে গেল: সকালে বেড়ানোর পর ইভান ইভানভিচ টেবিল-চেয়ারে বসল, নিত্যকার মতো সামনে সাদা কাগজ রেখে তার ওপর কাঠি দিয়ে খসখস আওয়াজ করে যেতে লাগল।

প্রভুর রোজনামচা থেকে

গতকালের দিনটা বেশ ছিল। শরৎকাল, সূর্য, হলুদ বন, বিমের অপূর্ব কর্মপটুতা — ঠিক যেমনটা দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের ভেতরে কিসের যেন একটা আক্ষেপ। কিসের? কেন?

বাস্-এ বিম্ নির্ঘাত লক্ষ করে থাকবে আমার দীর্ঘশ্বাস ফেলা, তবে আমাকে যে ও বুঝতে পারে নি এটাও নিশ্চিত। একটা কুকুরের পক্ষে আদৌ ধারণা করা সম্ভব নয় যে আমি বাস-ড্রাইভারকে ঘুষ দিলাম। কুকুরের এতে কীই বা আসে যায়? কিন্তু আমার? একটা ছোটখাটো 'কাজের' জন্য রুবল দিই কিংবা আরেকটু বড় কাজের জন্য — বিশ, অথবা খুব বড় কোন কাজের জন্য হাজার রুবল — তাতে কোন তফাত হয় কি? যে যাই বলুক না কেন, লজ্জার কথা। মনে হয় যেন তুচ্ছ একটা জিনিসের জন্য নিজের বিবেক বিকিয়ে দিলাম। তা ত বটেই। মানুষের সঙ্গে বিমের কোন তুলনা চলে না, মানুষের চেয়ে ও অনেক নীচে, তাই ব্যাপারটা সে কখনও আঁচই করতে পারবে না।

বিমের বোঝার ক্ষমতা নেই যে এই কাগজ আর বিবেক অনেক সময়

সরাসরিভাবে পরস্পর নির্ভরশীল। কিন্তু দেখ দেখি, কী অদ্ভুত মানুষ আমি! একটা কুকুরের পক্ষে যতটা পারা সম্ভব তার চেয়ে বেশি কি ওর কাছ থেকে আশা করা উচিত? কুকুরকে ত আর গড়েপিটে মানুষ করা যায় না!

আরও একটা কথা: পশুপাখি মারতে আমার এখন কষ্ট হয়। এর কারণ, সম্ভবত, বার্ধক্য। চারদিকের পরিবেশ এত সুন্দর ছিল, তারই মাঝখানে হঠাৎ কিনা একটা মরা পাখি! আমি নিরামিষাশী নই, ভণ্ডও নই যে পশুপাখির মৃত্যুযন্ত্রণার ফলাও বর্ণনা দেব অথচ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাদের মাংসও ভোজন করব। কিন্তু একটা জিনিস আমি করি — মনে মনে ঠিক করে নিই সারা দিনে একটা-দুটোর বেশি বনমোরণ শিকার করব না। একটাও যদি না করি তাহলে অবশ্য আরও ভালো হয়, কিন্তু তাহলে বিম্ আর শিকারী কুকুর থাকে না এবং আমাকেও পাখি কিনতে হয়, যে-পাখি আমার জন্য শিকার করবে অন্য কোন লোক। না, এটা চলে না।... তাছাড়া, সত্যি বলতে গেলে কি, আমার এই আবেদন কার কাছে? নিজের কাছে — এমন একজন লোকের কাছে, যার ব্যক্তিসত্তা দীর্ঘকালের একাকীত্বে দ্বিধাবিভক্ত, আর সে একাকীত্ব কিছু পরিমাণে অনিবার্যও বটে। যুগযুগান্তর ধরে মানুষকে তা থেকে উদ্ধার করে আসছে কুকুর।

তাহলে? তাহলে কোথা থেকে, কেন গতকালের এই আক্ষেপ? শুধুই কি গতকালের? আমার চিন্তার কোথাও কি কোন ফাঁক থেকে যাচ্ছে?.. কালকের দিনটির কথাই ধরা যাক: এক দিকে সুখের প্রবল বাসনা, অন্যদিকে সেই হলুদ রঙের রুবলের নোট; এক দিকে হলুদ বন, অন্যদিকে মরা পাখি। এটা কী? এ কি নিজের বিবেকের সঙ্গে একটা লেনদেন নয়?

ও হ্যাঁ! যে চিন্তাটা গতকাল মনে উদয় হয় নি: লেনদেনের ব্যাপার নয়, সে হল বিবেকের ভর্ৎসনা, যারা মনুষ্যত্ব হারিয়ে অনর্থক প্রাণিহত্যা করে তাদের সকলের জন্য মনঃকষ্ট। অতীতের ঘটনা থেকে, অতীতের স্মৃতিচারণ থেকে আমার মনে পশুপাখির জন্য করুণা জাগছে, সেই করুণা ক্রমবর্ধমান আকার ধারণ করছে।

আমার মনে পড়ে:

শিকারী সমিতির পরিচালকমণ্ডলী ক্ষতিকর পাখি হিশেবে ম্যাগপাইদের বিনাশ করার এক নির্দেশ জারী করেছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে জীববিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ঐ নির্দেশ জারী করা হয়েছিল। শিকারীরা সবাই পরিষ্কার বিবেক নিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে ম্যাগপাই শিকার

করতে থাকে। বাজজাতের পাখি সম্পর্কেও ঐ রকম নির্দেশ ছিল। শিকারীরা তাদেরও নির্বিচারে হত্যা করে। নেকড়ে সম্পর্কেও। নেকড়েদের ত বলতে গেলে সম্পূর্ণ বিনাশ করে ফেলা হয়। নেকড়ে মারতে পারলে তিনশ রুবল (পুরনো টাকায়) পুরস্কার দেওয়া হত, আর ম্যাগপাই কিংবা চিলের ঠ্যাঙ শিকারী সমিতিকে দেখাতে পারলে পাঁচ কোপেক নাকি পঞ্চাশ কোপেক ঐ রকম কিছু একটা দেওয়া হত — ঠিক কত, এখন আর তা মনে নেই।

কিন্তু হঠাৎ নতুন এক নির্দেশবলে চিল আর ম্যাগপাইকে উপকারী পাখি বলে ঘোষণা করা হল, বলা হল ওরা নাকি পাখিদের শত্রু নয়, তাই ওদের হত্যা করা নিষেধ। এককালে ওদের ধ্বংস করার যে কঠোর নির্দেশ জারী হয়েছিল তার জায়গায় জারী হল কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

এখন একমাত্র একটি পাখিই রয়ে গেল, যাকে ধ্বংস করা যেতে পারে, যে পাখি ঐ আইনের আওতায় পড়ে না — সে হল পাতিকাক। পাতিকাক নাকি অন্যান্য পাখিদের বাসা নষ্ট করে (প্রসঙ্গত, ম্যাগপাইয়ের বিরুদ্ধেও এরকম সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল)। অথচ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে স্তেপ অঞ্চলের এবং স্তেপ বনভূমির পাখিরা যে মারা যায় তার জন্য কাউকে দায়ী করা হয় না। অনিষ্টকারী জীবদের হাত থেকে বনভূমি ও শস্যক্ষেত্র বাঁচাতে গিয়ে আমরা পাখিদের ধ্বংস করি আর তাদের ধ্বংস করার ফলে নষ্ট হয় বন। যাকে আমরা মানবসমাজের সহচর ও জঞ্জাল সাফকারী বলে চিরকাল জেনে এসেছি অপরাধ হল কিনা সেই পাতিকাকের?

অপরাধ কারও ঘাড়ে চাপাতে হলে পাতিকাকের ঘাড়েই ত চাপাতে হয়!—পাখিদের মৃত্যুর জন্য পাতিকাককে যে অপরাধী করা হচ্ছে তার পেছনে যুক্তি ত অতি সাধারণ, খুবই বিশ্বাসযোগ্য সে যুক্তি!

মৃত্যুকে নিয়ে দীর্ঘকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভয়ঙ্কর। সংযমনোভাবাপন্ন জীববিজ্ঞানী ও শিকারীরা ইতিমধ্যেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাখি ও বনভূমি সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

মৃত্যুকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে আমি কোন কালে, যখন দরকার ছিল তখন কি জোরগলায় কিছু বলেছি? না, বলি নি। আর সেই জন্যই ত বিবেকের প্রতি আমার তিরস্কার। আমার কণ্ঠস্বর কি নিস্তেজ, কি দুর্বলই না মনে হবে যদি আমি এখন পিছনের দিনগুলিতে ফিরে গিয়ে বলি:

'পাতিকাককে বাঁচান আপনারা! মানুষের বাসস্থানকে জঞ্জালমুক্ত ক'রে চমৎকার পরিচ্ছন্ন রাখে এই পাখি। বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করুন ওকে! একজন ব্যঙ্গবিদ্রূপ রচয়িতা যেমন সমাজের আত্মিক মালিন্য দূর করে এই পাখিও তেমনি আমাদের আশপাশের এলাকাকে আবর্জনামুক্ত করতে সাহায্য করে, এরই জন্য রক্ষা করা উচিত ওকে। পাখিদের ডিম না হয় করলই বা একটু আধটু চুরি, কিন্তু পাতিকাক আছেই ত এই জন্য যাতে পাখিরা তাদের বাসা তৈরি করতে শেখে। মনে রাখবেন, এই চপলমতি, বিদ্রূপকারী পাখি একমাত্র পাখি যার প্রগল্‌ভতা এতই সরল যে গাছের ওপর বসে সরাসরি লোকের মুখের দিকে চেয়ে দুম করে বলে ফেলতে পারে 'কা-কা-আর্-র!' (অর্থাৎ ভাগ্ বোকা!) আর আপনি সরে যাওয়ামাত্র গাছের ডাল থেকে উড়ে নীচে চলে আসবে, ঠাট্টার সুরে কা-কা করতে করতে ফের মনোযোগ দিয়ে ভোজন করতে থাকবে পচাগলা মাংসখন্ড, যে মাংসখন্ড কোন কুকুরও কস্মিনকালে মুখে তুলবে না। তাই বলি এই পাখিকে বাঁচান, বাঁচান পক্ষিজগতের জঞ্জাল সাফকারী পাতিকাককে! ওকে ভয় করার কোন কারণ নেই। চেয়ে দেখুন না, ওকে ছাড়া অমনিতেই যে জায়গাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেখান থেকে খুদে সোয়ালো পাখিগুলো পর্যন্ত কেমন একসঙ্গে মিলে ঠোকর মেরে ওকে খেদিয়ে দিচ্ছে, আর ও শ্লেষভরে কা-কা ডাক ছাড়তে ছাড়তে ঐ জায়গা ছেড়ে উড়ে গিয়ে বসছে পূতিগন্ধময় একটা জায়গায়। রক্ষা করুন, বাঁচান পাতিকাককে!'

কথাগুলো বাস্তবিকই তেমন একটা জোরদার শোনাত না, যুক্তিগ্রাহ্যও হত না। তবে বিম্ সম্পর্কে লেখা এই খাতাটার মধ্যেই থাক না হয়। এক্ষুনি আমি খাতার মলাটের ওপর লিখে ফেলি: 'বিম্'। এখানে যা কিছু থাকবে সে কেবল নিজের জন্য, শুধুই আমার জন্য। বিম্ যখন ওর নিজের জন্মের জন্য অপরাধী বলে গণ্য তখন ওর সম্মান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আমি এই রোজনামচা লিখতে শুরু করি এটা ঠিকই, কিন্তু দেখতে দেখতে রোজনামচা এমনই পল্লবিত হয়ে উঠেছে যে এখন আর কেবল বিমের প্রসঙ্গ নয়, আমার নিজের সম্পর্কেও যাবতীয় কথা এতে স্থান পাচ্ছে। আমার এই রোজনামচা সম্ভবত কেউ ছাপাতে যাবে না — কারই বা আগ্রহ হবে 'আমার কুকুর ও আমি' প্রসঙ্গ পড়তে? কেউ রস পাবে না। তাই কোল্‌ৎসভের কথায় বলতে ইচ্ছে করে:

নাহি লিখি ক্ষণিকের যশাকাঙ্ক্ষা তরে,
লেখা মোরে উচ্ছ্বসিত আনন্দ বিতরে;
উৎস তার প্রাণসখা বন্ধুদের প্রীতি,
অতীতের সুখাবেশ, সুখকর স্মৃতি।

...বিম্ কিন্তু দিনের বেলায়ও শুয়ে থাকে — বড় বেশি খাটাখাটনি গেছে আমার বন্ধুটির, হলুদ বনের সঞ্জীবনী ঘ্রাণ ও প্রাণ ভরে নিয়েছে।

আহা হলুদ বন, হলুদ বন আমার! এখানেই ত আছে সুখের কণা, এ হল সেই জায়গা যেখানে মানুষ ধ্যানস্থ হতে পারে। শরতের রোদ ঝলমলে বনে মানুষের মন কলুষতা থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নেকড়ের ডেরায় হানা

শরৎকালে এক দিন ইভান ইভানভিচের সঙ্গে একজন দেখা করতে এলো। আগন্তুকের গা থেকে বন্দুক আর কুকুরের গন্ধ বেরোচ্ছিল। তার পরনে যদিও শিকারীর সাজসজ্জা ছিল না, যদিও আর দশটা নেহাৎ সাদামাঠা লোকের মতো সাধারণ পোশাক পরে সে এসেছে তবু তার করতলে বন্দুকের চিহ্ন, গায়ে বনের মৃদু গন্ধ আর জুতোয় শরতের ঝরাপাতার সুবাস বিমের কাছে ধরা পড়ে গেল। বলাই বাহুল্য, অতিথির গা শুঁকে, প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে এবং উৎসাহ ভরে লেজ নেড়ে বিম্ এই সব কথা বলল। লোকটাকে সে এই প্রথম দেখল, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই বিম্ মনের মধ্যে কোন সন্দেহ না রেখে নির্দ্বিধায় তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিল।

আগন্তুক কুকুরের ভাষা জানত, তাই সস্নেহে বলল:

'আমি কে চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে আমি কে। সাবাস! বেশ, বেশ।' বিমের মাথায় মৃদু চাপড় মেরে দৃঢ়স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল: 'বোস!'

বিম্ আদেশ পালন করল — বসল, বসে বসে অধীর আগ্রহে এদিক ওদিক থাবা নাড়তে লাগল। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল।

প্রভু ও আগন্তুক প্রসন্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে করমর্দন করল।

'বাঃ!' বিম্ কিঁউ কিঁউ আওয়াজ করে বলল।

বিমের দিকে দৃষ্টিপাত করে আগন্তুক বলল:

'বুদ্ধিমান কুকুর দেখছি।'

'বিম্ ভালো, ওর চেয়ে ভালো আর হয় না!' ইভান ইভানভিচ সায় দিয়ে বলল।

এই ভাবে ওদের তিনজনের মধ্যে সামান্য বাক্যবিনিময় হল। এর পর আগন্তুক শিকারীটি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল, কাগজটার ওপর আঙুল চালাতে চালাতে বলল:

'এই যে, এই এখানে, নেকড়ের খোঁড়লের একেবারে ভেতরটায়। আমি নিজে নকল ক'রে ডাক ছেড়ে দেখেছি। পাঁচটা সাড়া দিল — তিনটে ছানাপোনা, দুটো ধেড়ে। একটাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওঃ নেকড়ে বটে!'

বিম্‌কে সন্ধানে পাঠানোর সময় প্রভু 'এই যে এখানে, এখানে' বলে থাকে। তাই 'এখানে' বলতে যে কী বোঝায় বিমের কাছে অজানা নয়। কথাটা শোনামাত্র ও কান খাড়া করল। কিন্তু 'নেকড়ে' কথাটা কানে যেতে ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল — এ হল বুনো কুকুরের সেই ভয়ানক গন্ধ, যে-গন্ধ বিম্‌কে এক সময় ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, আর তখনই প্রভু পায়ের চিহ্ন দেখিয়ে বারবার 'নেকড়ে, নেকড়ে! এটা নেকড়ে রে বিম্!' — এই বলে ওকে সতর্ক করে দেয়। এখন এই শিকারীও বলল: 'ওঃ নেকড়ে বটে!'

আগন্তুক চলে গেল, চলে যাবার সময় বিমের কাছ থেকেও বিদায় নিল।

ইভান ইভানভিচ টোটায় গুলি ভরতে বসল — বড় বড় মটরদানার আকারের সীসার গুলির ওপর আলুর ময়দা ছড়িয়ে টোটায় পুরে সেগুলো ঠাসতে লাগল।

রাতে বিম্ সুস্থির হয়ে ঘুমোতে পারল না।

ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই বিমের প্রভু ওকে সঙ্গে করে বন্দুক নিয়ে ঘর থেকে বের হল, বেরিয়ে এসে ওরা রাস্তার কোনায় অপেক্ষা করতে লাগল। শিগগিরই একদল শিকারী-বোঝাই একটা বড় মোটরগাড়ি এগিয়ে এলো। ওরা গাড়ির পেছনে ছইয়ের নীচে কয়েকটা বেঞ্চের ওপর বসে ছিল, বসে ছিল চুপচাপ, গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে। ইভান ইভানভিচ প্রথমে

বিম্‌কে বসিয়ে দিল, তারপর নিজেও ছইয়ের ভেতরে উঠে বসল। গতকালের শিকারীটি ইভান ইভানভিচকে বলল:

'উ'হ্ন, বিম্‌কে সঙ্গে ক'রে কেন?'

কে যেন কঠোর স্বরে বলল:

'ঝাড়া দেবার সময় কুকুর থাকলে চলবে না। ওকে বাদ দিতে হবে। গলার আওয়াজ করবে — তাহলেই শিকারের দফারফা, ঝাড়া দিয়ে কোন লাভ হবে না।'

'বিম্‌ আওয়াজ করবে না,' ইভান ইভানভিচ অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল। 'ও পিছু ধাওয়া করার কুকুর নয়।'

একসঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক তার কথায় আপত্তি তুলল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল এই যে গতকালের আগন্তুক বলল:

'যাক গে। বিমের সঙ্গে বাড়তি জায়গাটায় রাখা যাবে আপনাকে। একটা জায়গা আছে, ইভান ইভানভিচ — দেখা গেছে যেখানে যেখানে পতাকা পুঁতে চিহ্ন দেওয়া হয়েছে তার বাইরেও ঐ বাড়তি জায়গাটায় জলের ধারার ওপর দিয়ে নেকড়ে বেরিয়ে আসে।'

বিম্‌ অনুমান করতে পারল যে ওকে ওরা নিতে চায় না। ও নিজেও ওদের সকলের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে লাগল, কিন্তু অন্ধকারে কারও সেটা নজরে পড়ল না। যাই হোক, গাড়ি শেষকালে ছাড়ল।

পরিচিত বনরক্ষকের পোস্টের সামনে গাড়ি যখন এসে থামল ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। বিম্‌সুদ্ধ সবাই নিঃশব্দে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, কারও মুখে কোন কথা নেই। তারপর অনেকক্ষণ ধরে পরপর সার বেঁধে বনের প্রান্ত বরাবর চলল। কেউ ধূমপান করল না, কাশল না, এমন কি কারও জুতোয় জুতো ঠেকার আওয়াজ উঠল না, সকলে চলতে লাগল কুকুরের মতো সন্তর্পণে — সবারই জানা আছে কোথায়, কেন, কী উদ্দেশ্যে তারা চলেছে। জানত না কেবল বিম্‌, কিন্তু সেও ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলল তার প্রভুকে। প্রভু চলতে চলতে বিমের কান একবার সামান্য স্পর্শ করল, অর্থাৎ যেন বলল: বেশ বেশ, এই ত চাই বিম্‌।

সকলের আগে আগে চলেছে প্রধান — গতকালের সেই আগন্তুক শিকারীটি। লোকটি হাত তুলতেই সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের তিনজন বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে আরও নিঃশব্দে চলে গেল বনের ভেতরে, কিছুক্ষণ বাদেই তারা আবার ফিরে এলো। এবার দলনেতা মাথার

টুপি খুলে ওপরে নাড়াল, টুপি নেড়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল। এই ইঙ্গিত পেয়ে দলের অর্ধেক শিকারী তার অনুসরণ করল, সেই সঙ্গে অন্যদের পিছন পিছন ইভান ইভানভিচ এবং বিম্‌ও। বিম্‌ চলল সবার শেষে। ওর চেয়ে নিঃশব্দে আর কারও চলার সাধ্য ছিল না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইভান ইভানভিচ ওর রসি ছাড়ল না।

দলনেতার মৌন আদেশে, প্রথম যে লোকটি তার পিছন পিছন যাচ্ছিল সে ঝোপের আড়ালে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ঐ রকমই পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে ওক উপবনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল দ্বিতীয় জন, তারপর তৃতীয়জন — এই ভাবে একে একে প্রত্যেকে যে যার নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাকি রইল দলনেতার কাছাকাছি ইভান ইভানভিচ আর বিম্‌। ওরা চলতে লাগল আগের চেয়েও সন্তর্পণে। এবারে বিম্‌ দেখতে পেল তাদের পথের এক পাশ দিয়ে একটা ফিতে টানা আছে, তাতে ঝুলছে আগুনের মতো লাল টকটকে কতকগুলো কাপড়ের টুকরো, সেগুলো স্থির হয়ে আছে, নড়াচড়া করছে না। শেষকালে দলপতি ওদের দুজনকেও একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল, নিজে ফিরে চলে গেল পেছনে।

বিমের সজাগ কান কিন্তু লোকটার পায়ের শব্দ ঠিকই শুনতে পেল, যদিও মানুষদের কাছে মনে হচ্ছিল সে-শব্দ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। বিম্‌ আন্দাজ করতে পারল যে দলনেতা বাদবাকি শিকারীদেরও কোথায় যেন নিয়ে গেল, কিন্তু অনেকটা দূরে, তাই তারা যত দূরে সরে যেতে লাগল ততই বিমের পক্ষে পর্যন্ত খসখস আওয়াজ আলাদা করে চেনা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত নেমে এলো নিস্তব্ধতা। বনভূমির সজাগ, উদ্বেগাকুল নিস্তব্ধতা। প্রভু যেভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার হাঁটু যেরকম কেঁপে উঠল, যেভাবে নিঃশব্দে বন্দুক খুলে সে টোটা ভরল, তারপর বন্ধ করে চাপা উত্তেজনা নিয়ে ফের স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তা দেখেও এটা বুঝতে বিমের বাকি রইল না।

ওরা ঘন কাঁটাঝোপে ভরা একটা খাতের একপাশে বাদাম গাছের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। চারধারে বিশাল বিশাল ওকের মহারণ্য — মৌন, নীরব; এখন তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। প্রতিটি মহীরুহ একেকজন মহারক্ষীতুল্য। আর তাদের মাঝখান দিয়ে বেড়ে উঠেছে ছোট ছোট

গাছপালার ঘন জঙ্গল — তাতে আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠছে এই চিরন্তন অরণ্যের প্রবল মহিমা।

বিম্ এক মূর্তিমান অখণ্ড মনোযোগে পরিণত হয়েছে। ও স্থির হয়ে বসে বসে গন্ধ ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত চাঞ্চল্যকর কিছুর সন্ধান ও পাচ্ছে নি, কেননা বাতাস নিস্তরঙ্গ। এটাই কিন্তু বিমের অস্থিরতার কারণ। যখন সামান্যতম বায়ুপ্রবাহও থাকে তখন বিম্ জানতে পারে সামনে কোথায় কী আছে, তখন সবই ওর নখদর্পণে, কিন্তু বাতাস যখন পড়ে যায়, তায় আবার এই রকম বনের মধ্যে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা কঠিন, বিশেষত যখন ওর প্রাণের বন্ধু পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে।

তারপর হঠাৎ শুরু হয়ে গেল।

গুলি ছুঁড়ে সংকেত করা হল। গুলির আওয়াজে বনের নিস্তব্ধতা যেন বড় বড় কয়েকটা খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ল। প্রতিধ্বনি উঠল কখনও ওখানে, কখনও এখানে, কখনও বা দূরে কোথাও। এর পর বনের ঐ প্রতিধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই যেন দূর থেকে, অনেক দূর থেকে ভেসে এলো দলপতির কণ্ঠস্বর:

'লেগে পড়-ও-ও! ও-হো-হো!'

ইভান ইভানভিচ বিমের কানের ওপর ঝুঁকে পড়ে অস্ফুট স্বরে বলল: 'শুয়ে পড়্!'

বিম্ শুয়ে পড়ল। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

'ও-হো-হো-ও-ও!' ওদিকে শোনা গেল খেদাড়েদের হাঁক ডাক।

নিস্তব্ধতা এখন নানা কণ্ঠস্বরে, অপরিচিত, ক্রুদ্ধ ও হিংস্র নানা কণ্ঠের ধ্বনিতে খানখান হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। গাছপালার গায়ে দমাদম লাঠি পেটার আওয়াজ উঠল, হৈ-হট্টগোল কিচিরমিচির আওয়াজ মনে হল যেন শ' খানেক মৃত্যুপথযাত্রী ম্যাগপাই আকুলিবিকুলি করছে। খেদাড়েদের বেষ্টনী ছোট হতে হতে সামনে এগিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি, হল্লা, আকাশের দিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ।

শেষকালে বিম্ টের পেল সেই গন্ধ, অল্পবয়সে যার পরিচয় ও পেয়েছিল: নেকড়ে! ও প্রভুর পায়ের কাছে ঘেঁষে এলো, সামান্য কাছে — একেবারেই সামান্য! তারপর পায়ে ভর দিয়ে একটু উঠে দাঁড়িয়ে লেজ খাড়া করল। ইভান ইভানভিচের কিছু বুঝতে বাকি রইল না।

ওরা দুজনেই দেখতে পেল — নিশানের সারি বরাবর গুলির আওয়াজ

ছাড়াই দেখা দিয়েছে একটা নেকড়ে। নেকড়েটা চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে, মাথা নীচু করে, লেজটা ঝুলছে লাঠির মতো লম্বা হয়ে। মুহূর্তের মধ্যে জন্তুটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় তক্ষুনি বেষ্টনীর ভেতরে শোনা গেল গুলির আওয়াজ, তারপর আরও একটা গুলির আওয়াজ।

বন গমগম করে উঠল, ক্রোধে অনেকটা যেন ক্ষিপ্ত, অস্থির হয়ে উঠল।

বেষ্টনীতে আরও একবার গুলি চলল। এই গুলিটা একেবারে কাছে শোনা গেল। কোলাহল ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসতে থাকে।

নেকড়েটা, বিশাল বুড়ো নেকড়েটা হঠাৎই দেখা দিল। এসে হাজির হয়েছে কাঁটাঝোপে ঢাকা খাতটা ধরে, কিন্তু নিশানগুলো দেখতে পেয়ে ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন সামনে কোন বাধা পেয়েছে। এখানে, খাতের ওপরে লাইনের অন্যান্য জায়গার তুলনায় নিশানগুলো ঝুলছিল অনেকটা উঁচুতে, জন্তুর মাথার তিনগুণ ওপরে। এদিকে লোকজনের হৈ-হট্টগোল একেবারে কাছে চলে এসেছে। নেকড়েটা কেমন যেন একটু ইতস্তত ক'রে, এমনকি নিস্তেজভাবে নিশানের সারির নীচ দিয়ে চলে গেল — এবারে ও এসে পড়েছে ইভান ইভানভিচ ও বিমের পনেরো মিটারের মধ্যে। এবারে সে কয়েকটা ঝটকা মারল, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই মানুষ ও কুকুর দুজনেই লক্ষ করল যে জন্তুটা আহত হয়েছে: ওর শরীরের একপাশে রক্তের ছোপ ফুটে উঠেছে, মুখের চারপাশ থেকে লালচে আভার গাঁজলা বেরোচ্ছে।

ইভান ইভানভিচ গুলি ছুঁড়ল।

নেকড়ে হঠাৎ সমস্ত শরীরটা নিয়ে চারপায়ে লাফিয়ে উঠল, ঘাড় না ফিরিয়ে গুলির দিকে ঘুরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রশস্ত বিশাল কপাল, চোখে জোড়া রক্তবর্ণ, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, লালচে ফেনা বেরোচ্ছে। ... তবু কিন্তু ওকে এতটুকু, এতটুকু তুচ্ছ মনে হচ্ছে না। ওকে, এই স্বাধীন বন্য জন্তুটাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। না, ভীরু ও আদৌ নয়, ধরাশায়ী হওয়ার ইচ্ছে ওর নেই, এখনও নেই। দাম্ভিক এই জন্তুটা; কিন্তু না, অবশেষে ধরাশায়ী হল, ধীরেধীরে থাবা দিয়ে এদিক-ওদিক হাতড়াতে হাতড়াতে মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর স্থির হয়ে গেল, আর ছটফট করল না, শান্ত হয়ে এলো।

ঘটনাটার ধাক্কা বিম্ সহ্য করতে পারল না। ও লাফিয়ে উঠে শরীর টানটান করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু শিকারী কুকুরের এ কী ভঙ্গি! পিঠের লোম আলুথালু, দুই কাঁধের উঁচু ফলকের ওপরকার লোম প্রায়

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, লেজ দুপায়ের মাঝখানে গোটানো: যে আজ মৃত এবং মৃত বলেই বিপজ্জনক নয়, অথচ ভীতিপ্রদ — যার ছায়ামাত্র, রক্তাক্ত শরীর পর্যন্ত ভীতির উদ্রেক করে — সারমেয়কুলের সেই দর্পিত অধিপতিকে দেখে, নিজের জাতভাইকে দেখে ক্রোধ ও ভীতিমিশ্রিত এ কী কুৎসিত ভঙ্গি বিমের! বিম্ তার জাতভাইকে ঘৃণা করে। বিম্ বিশ্বাস করে মানুষকে, নেকড়েকে সে বিশ্বাস করে না। বিম্ তার জাতভাইকে দেখে ভয় পেলেও নেকড়ে কিন্তু বিম্‌কে ভয় পায় নি — এমন কি মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পরেও নয়।

...এদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি আরও এগিয়ে আসতে থাকে। আরও গুলির আওয়াজ — পর পর দুটি নল থেকে গুলি ছুটল। মনে হয় কোন সেয়ানা নেকড়ে বেষ্টনীর খুব কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে খুব সম্ভব একেবারে শেষ মুহূর্তে, লোকজনের সতর্কতায় যখন খানিকটা ঢিলে পড়েছে, যখন তারা সকলে এক জায়গায় এসে মেলার চেষ্টা করছে, ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে গেছে। শেষকালে জঙ্গলের ভেতর থেকে আবির্ভাব ঘটল দলনেতার, ইভান ইভানভিচের দিকে এগিয়ে এসে বিমের দিকে তাকিয়ে বলল:

'ওরে ব্বাপ্‌স! মোটে কুকুরের মতো দেখতে লাগছে না — আস্ত একটা জানোয়ার! দুটো কিন্তু শেষকালে বেড় ভেঙে বেরিয়ে গেল। একটা জখম হয়েছে।'

ইভান ইভানভিচ বিমের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল, ওকে মিষ্টি কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করল। বিমের পিঠের লোম যদিও যথাস্থানে এসে বিন্যস্ত হয়ে পড়ল, তবু ও তখনও একই জায়গায় পাক খেতে লাগল, লোকজনের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জিভ বার করে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল। দুই শিকারীতে মিলে যখন নেকড়ের লাশ দেখতে গেল তখন বিম্ তাদের সঙ্গে ত গেলই না বরঞ্চ সমস্ত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে রশিটা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মিটার তিরিশেক দূরে সরে গিয়ে হলুদ ঝরা-পাতার রাশির ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে কাঁপতে লাগল বিকারগ্রস্তের মতো। ইভান ইভানভিচ বিমের কাছে ফিরে এসে লক্ষ করল বিমের চোখ রক্তবর্ণ — লাল টকটক করছে। জানোয়ারই বটে!

'ওঃ বিম্ রে! খারাপ লাগছে বুঝি তোর? তা ত লাগবেই। অমন হওয়াই ত স্বাভাবিক রে বেটা, খুবই স্বাভাবিক।'

দলনেতা বলল:

'মনে রাখবে ইভান ইভানভিচ, নেকড়ে দিয়ে 'সেটার' কুকুরের দফা রফা করে দেওয়া যায় — এর পরে বনে যেতেও ভয় করবে। কুকুর হল গিয়ে গোলাম, আর নেকড়ে — স্বাধীন জানোয়ার।'

'অমনিতে কথাটা ঠিকই, কিন্তু বিমের বয়স চার বছর হল — বয়স্ক কুকুরই বলতে হবে ওকে, যে বয়সে বনকে ভয় পেতে পারে সে বয়স পার হয়ে এসেছে ও। তবে হ্যাঁ, বনে নেকড়ে আছে টের পেলে আর তোমারে কাছছাড়া হচ্ছে না — পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলেই বলবে — 'নেকড়ে!'

'তা বটে, নেকড়েরা ছোট ছোট মুরগীছানাদের সমান 'সেটার'দের নেয়। কিন্তু এটাকে এখন আর নিতে পারবে বলে মনে হয় না — বিশেষ করে নেকড়ে আছে টের পেলে যখন তোমার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করে বেড়ায়।'

'তাহলেই দেখলে ত! এক বছর বয়স পর্যন্ত জন্তুজানোয়ার দিয়ে ভয় দেখানো উচিত নয়। আর তারপর — কী আর করার আছে! — দেখেশুনে শিখুক গে।'

ইভান ইভানভিচ বিম্‌কে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল, দলপতি মরা নেকড়েটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেদাড়েদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

শিকারীরা সকলে বনরক্ষকের পোস্টের সামনে জড় হয়ে একেক পাত্র পান করল, উৎসাহ-উদ্দীপনায়, ফুর্তিতে তারা কলরব করে উঠল। এই সময় বিম্‌ নেকড়ের গন্ধে সংক্রামিত হয়ে, বিহ্বল অবস্থায়, লাল টলটকে চোখ আর ভয়ংকর চেহারা নিয়ে ওদের সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে লতাপাতার বেড়া দেওয়া একটা জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে একা শুয়ে ছিল। ইস, বিম্‌ যদি জানতে পারত যে ভাগ্যের পরিহাসে এর পরে কোন একবার এই বনেই লোকে ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে!

পোস্টের কর্তা, বনরক্ষক ওর সামনে এগিয়ে এসে আলগোছে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলল:

'বেশ কুকুর, ভালো কুকুর। বুদ্ধিমান বলতে হবে। এই যে এতক্ষণ ধরে নেকড়ে শিকারের জন্যে বন ঝাড়া দেওয়া হল এই সময়ের মধ্যে একবারও ঘেউ ঘেউ করে নি টুঁ শব্দটি করে নি।'

এখানে কুকুরকে সকলে ভালোবাসতেন।

কিন্তু শিকারীরা গাড়িতে চড়ে বসতে ইভান ইভানভিচ যখন বিম্‌কে

ওখানে বসিয়ে দিল তখন বিম্ লোম খাড়া করে কি'উ কি'উ আওয়াজ করতে করতে তড়াক করে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে গেল: তিনটে মরা নেকড়ের সঙ্গে থাকতে ও নারাজ।

তা দেখে দলপতি বলল:

'আচ্ছা! এ কুকুর দেখছি এখন আর বেঘোরে মারা যাবার পাত্র নয়!'

সামনে, ড্রাইভারের পাশের সীটে যে অচেনা স্থূলকায় শিকারীটি বসে ছিল সে অসন্তুষ্টচিত্তে নেমে এসে ভারী শরীর নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে গাড়ির পেছনে গিয়ে উঠে বসতে ইভান ইভানভিচ বিম্‌কে নিয়ে খালি জায়গাটায় গিয়ে বসল।

* * *

এই ঘটনার পর ওরা আর খুব বেশি বনমোরগ শিকারে যেতে পারে নি, যে কয়বার গেছে প্রত্যেকবারই বিম্ তার অভ্যাসমতো চমৎকার খেটেছে। কিন্তু নেকড়ের অস্তিত্ব টের পেলেই হল — অমনি ও শিকার বন্ধ করে দেবে, প্রভুর পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়বে, এক পাও এগোবে না। এই ভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি ও প্রকাশ করত 'নেকড়ে' কথাটি। এটা ভালোই বলতে হবে। নেকড়ের ডেরায় হানা দেওয়ার পর ইভান ইভানভিচের প্রতি বিমের ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল, প্রভুর শক্তির ওপর আরও বেশি বিশ্বাস জন্মাল ওর। বিমের আস্থা জন্মাল মানুষের উদারতার ওপর। বিশ্বাস এক পরম সম্পদ। ভালোবাসাও তাই। এই বিশ্বাস ছাড়া কোন কুকুরই কুকুর পদবাচ্য নয়, তাকে তখন বলা যেতে পারে স্বাধীন নেকড়ে কিংবা (তার চেয়েও খারাপ কিছু) ভবঘুরে কুকুর। যে-কোন কুকুর তার প্রভুর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ঘরছাড়া হলে কিংবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে, এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বেছে নেয়। কিন্তু পরম দুর্ভাগ্য সেই কুকুরের, যে তার প্রিয় বন্ধু মানুষকে হারায়; সে তখন বন্ধুকে খুঁজতে থাকবে, তার প্রতীক্ষায় দিন গুনবে। কুকুর তখন আর স্বাধীন নেকড়েতে পরিণত হতে পারে না, সাধারণ ভবঘুরে কুকুরের পর্যায়ে নামতে পারে না, সে থেকে যায় আগের মতোই তার হারানো বন্ধুর প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিঃসঙ্গ।

প্রিয় পাঠক, দীর্ঘ বছরের এবং সারমেয়জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ

ধরনের একনিষ্ঠ প্রভুভক্তির যে অসংখ্য বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় সেখান থেকে কোন কাহিনী আমি বিবৃত করতে বসি নি। আমি বলব কেবল বিম্ নামে এক কুকুরের কথা, যার একটা কান ছিল কালো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্ধু-বিদায়

একবার শিকারের পর ইভান ইভানভিচ বাড়ি ফিরে বিম্‌কে খাইয়ে দাইয়ে, রাতের খাবার না খেয়ে, বাতি না নিভিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল। সেই দিন বিমের অনেক খাটা-খাটনি গিয়েছিল, তাই ও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল, কিছু শুনতে পেল না। কিন্তু পরের কয়েকদিন ধরে বিম্ লক্ষ করতে লাগল যে প্রভু দিনের বেলায়ও বেশ ঘন ঘন শুয়ে পড়ছে, বিষণ্ণ হয়ে কী যেন ভাবছে, মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছে। এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেল বিম্ তার নিজের প্রয়োজনে একা একা ঘুরতে বের হয় — অল্প সময়ের জন্য। এর পর ইভান ইভানভিচ একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, কোন রকমে দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে বিম্‌কে বাইরে ছেড়ে আসে বা বিম্ বাইরে থেকে এলে ওকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে দেয়। একদিন বিছানায় শুয়ে প্রভু কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক করুণ সুরে কাতরাতে লাগল। বিম্ এগিয়ে এসে খাটের কাছে বসল, বন্ধুর মুখ ভালো করে নিরীক্ষণ করল, তারপর বন্ধুর প্রসারিত হাতটার ওপর মাথা রাখল। ও দেখতে পেল প্রভুর মুখের কী হাল হয়েছে: বিবর্ণ, পাণ্ডুর মুখটা, চোখের কোণে কালি পড়েছে, দাড়ি-না-কামানো খোঁচা খোঁচা থুতনিটা ছুঁচলো হয়ে উঠে আছে। ইভান ইভানভিচ বিমের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু, দুর্বল স্বরে বলল:

'কি রে, এখন কী করব বল্, বেটা? আমার অবস্থা খারাপ বিম্, ভালো ঠেকছে না। গোলার ভাঙা টুকরো... হৃৎপিণ্ডের নীচের দিকটায় সরে এসেছে। খারাপ লাগছে, বিম্।'

তার কণ্ঠস্বর এতই অস্বাভাবিক শোনাল যে বিম্ উদ্বেগ বোধ করল। ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করতে করতে ও থেকে থেকে দরজা আঁচড়াতে লাগল,

যেন প্রভুকে ডেকে বলতে চাইল: 'ওঠো, চল, আমরা যাই।' কিন্তু ইভান ইভানভিচের নড়াচড়া করতে সাহস হচ্ছিল না। বিম্‌ ফের তার পাশে বসে পড়ে মৃদুস্বরে কিঁউ কিঁউ করতে লাগল।

'ঠিক আছে বিম্‌, আয় চেষ্টা করে দেখা যাক,' কোন রকমে কথাগুলো উচ্চারণ করে ইভান ইভানভিচ উঠে বসল।

কিছুক্ষণ খাটের ওপর বসে থেকে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, এক হাতে দেয়ালে ভর দিয়ে অন্য হাতে বুক চেপে ধরে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বিম্‌ বন্ধুর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে তার পাশে পাশে চলল; একবারও, ভুলেও লেজ নাড়াল না। ও যেন বলতে চাইল: হ্যাঁ, এই ত চাই। চল, চল, আস্তে আস্তে চলা যাক।

সিঁড়ির মুখের চত্বরে বেরিয়ে ইভান ইভানভিচ পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপল। বেল টিপতে দরজা খুলল ল্যুসিয়া নামে একটা ছোট মেয়ে। ইভান ইভানভিচ তাকে কী যেন বলল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ছুটে বাড়ির ভেতরে গিয়ে বুড়ি স্তেপানভ্‌নাকে ডেকে আনল। ইভান ইভানভিচ সেই 'গোলার টুকরো' কথাটা তাকে বলামাত্র সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল, ইভান ইভানভিচের বাহুমূল চেপে ধরে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

ঘরে ফিরে আসতে ইভান ইভানভিচ যখন আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়ল তখন বুড়ি বলল:

'আপনার শুয়ে থাকা উচিত, ইভান ইভানভিচ। শুয়ে থাকা উচিত। এই যে হ্যাঁ, এই ভাবে। উঠবেন না, শুয়ে থাকুন।'

এই বলে টেবিল থেকে দরজার চাবিগোছা তুলে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল, বার্ধক্যজড়িত পায়ে খুটখুট করতে করতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

'শুয়ে থাকা' কথাটি বুড়ি তিন-তিনবার এমন ভাবে আওড়ায় যে বিমের মনে হল ওটা বুঝি ওকেই উদ্দেশ্য করে বলা। ও তাই খাটের পাশে শুয়ে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে: প্রভুর করুণ অবস্থা, স্তেপানভ্‌নার উদ্বেগ এবং সে যে দরজার চাবির গোছা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গেল — এর কোনটাই বিমের মনে দাগ না কেটে পারল না, ও তাই উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদেই বিম্‌ শুনতে পেল দরজার গায়ে চাবির ফুটোয় কে যেন চাবি ঢোকাল, খুট করে আওয়াজ হল, দরজা খুলে গেল, বাইরের ঘরে শোনা গেল কথাবার্তা। এর পর প্রবেশ করল স্তেপানভ্‌না, তার পেছন পেছন

সাদা স্মক পরা তিনজন অপরিচিত লোক — দুজন মহিলা, একজন পুরুষ। তাদের গা থেকে যে গন্ধ আসছিল তেমন গন্ধ সচরাচর অন্য লোকদের গা থেকে পাওয়া যায় না; বরং ঘরের দেয়ালে ঝোলানো সেই বাক্সের গন্ধের সঙ্গে ওর অনেকটা মিল আছে। প্রভু যখন বলে: 'আমার খারাপ লাগছে রে বিম্, শরীরটা খারাপ লাগছে' — একমাত্র তখনই ঐ বাক্সটা খোলে।

পুরুষমানুষটি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে খাটের দিকে পা বাড়াল। এমন সময়...

বিম্ ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার বুকে সামনের দুই পায়ের থাবা ঠেকিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দুবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল, যেন চিৎকার করে বলল: 'ভাগ! ভাগ!'

পুরুষমানুষটি বিম্‌কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এক লাফে পিছু হটে গেল, মহিলা দুজন লাফিয়ে সরে গেল বাইরের ঘরে। এদিকে বিম্ সরে গিয়ে খাটের পাশে বসল, ওর সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে, দেখে মনে হচ্ছিল বন্ধুর এই দুঃসময়ে অজ্ঞাতকুলশীল লোকজনকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়ার চেয়ে ও জান দিতেও প্রস্তুত।

ডাক্তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন:

'ওঃ কুকুর বটে! কী করা এখন?'

একথায় ইভান ইভানভিচ ইশারায় বিম্‌কে আরও কাছে ডাকল, সামান্য ফিরে ওর মাথায় হাত বুলাল। বিম্‌ও বন্ধুর কাঁধ ঘেঁষে সরে এসে তার ঘাড়, মুখ, হাত চাটতে লাগল।

ইভান ইভানভিচ ডাক্তারের দিকে চেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল:

'এগিয়ে আসুন।'

ডাক্তার এগিয়ে এলেন।

'আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন আমার দিকে।'

ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দিতে ইভান ইভানভিচ বলল:

'নমস্কার।'

উত্তরে ডাক্তারও বললেন:

'নমস্কার।'

বিম্ ডাক্তারের হাতে নাক ঠেকাল, কুকুরের ভাষায় এর অর্থ হল: 'কী আর করা যাবে! আমার বন্ধু যখন তখন আমারও বন্ধু।'

স্ট্রেচার নিয়ে আসা হল। ইভান ইভানভিচকে স্ট্রেচারে তোলা হল। ইভান ইভানভিচ বলল:

'স্তেপানভ্না... বিম্‌কে দেখবেন দয়া করে। সকালে বাইরে ছাড়বেন। ও নিজেই চলে আসবে তাড়াতাড়ি।... বিম্ আমার জন্য অপেক্ষা করবে।' তারপর বিমের দিকে ফিরে বলল, 'অপেক্ষা করবি, অপেক্ষা করবি।'

বিম্ জানত 'অপেক্ষা করা' কাকে বলে। দোকানের সামনে — 'বসে থাক, অপেক্ষা কর', শিকারের সময় র‍্যাকস্যাকের সামনে বসিয়ে রেখে — 'বসে থাক, অপেক্ষা কর!' এবারে ও লেজ নেড়ে অস্ফুটস্বরে ডাকল, যার অর্থ: 'আচ্ছা, আমার বন্ধু তাহলে ফিরবে। ও যাচ্ছে, কিন্তু ফিরবে, শিগগিরই ফিরবে।'

একমাত্র ইভান ইভানভিচই ওর ভাষা বুঝল, বাকিরা কেউ বুঝতে পারল না — সকলের চোখ দেখে এটা বুঝতে বাকি রইল না বিমের। বিম্ স্ট্রেচারের সামনে বসে স্ট্রেচারের ওপরে থাবা রাখল। ইভান ইভানভিচ হাত বাড়িয়ে ওর থাবা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'অপেক্ষা করিস রে বেটা, অপেক্ষা করিস।'

কিন্তু বন্ধুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে — এটা এর আগে বিম্ কখনও দেখে নি।

ওরা যখন স্ট্রেচার নিয়ে গেল এবং বাইরে থেকে খুট করে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল তখন ও দরজার সামনে শুয়ে পড়ল, সামনের দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে মেঝের ওপর রাখল — কোন কুকুরের যখন ব্যথা লাগে বা মন খারাপ হয় তখন সে এই ভাবেই শোয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মরার সময়ও তারা এই ভঙ্গিতে শোয়।

কিন্তু অন্ধের বহুকালের সঙ্গী, পথপ্রদর্শক সেই কুকুরটির মতন বিম্ শোকে-দুঃখে মারা গেল না। সেই কুকুরটি প্রভুর কবরের কাছে শুয়ে থাকত, কবরখানার ভালোমানুষ দয়াপরবশ হয়ে তার জন্য খাবার নিয়ে এলে সে খাবার ও গ্রহণ করত না, পাঁচদিনের দিন সূর্যোদয়ের সময় তার মৃত্যু হল। এটা সত্যি ঘটনা, কোন মনগড়া কাহিনী নয়। কুকুরের অসাধারণ অনুরাগ ও প্রভুভক্তির কথা জানে বলেই কুকুর সম্পর্কে কোন শিকারীকে কদাচিৎ বলতে শোনা যাবে: 'টেঁসে গেছে', বলবে 'মারা গেছে'।

না, বিম্ মারা গেল না। ওকে স্পষ্ট বলা হয়েছে: 'অপেক্ষা করিস।' ও

বিশ্বাস করে — বন্ধু ফিরে আসবে। কতবারই ত এরকম হয়েছে, ওকে বলেছে 'অপেক্ষা করিস' — ঠিক ফিরে এসেছে।

অপেক্ষা করে থাকা! এখন এটাই হয়ে দাঁড়াল বিমের জীবনের একমাত্র ব্রত।

কিন্তু সেই রাতটা একা একা কাটানো কী কঠিন, কী যন্ত্রণাদায়কই না ওর মনে হয়েছিল! কী যেন একটা ঘটতে চলেছে, সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তেমন নয়। ঐ লোকগুলোর স্মক থেকে যেন বিপদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। বিম্ বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

মাঝরাতে যখন চাঁদ উঠল তখন বিমের অসহ্য ঠেকতে লাগল। অমনিতেই প্রভু যখন পাশে পাশে থাকে তখনও এই চাঁদ বিম্‌কে সব সময় অস্থির করে তোলে: চাঁদের চোখ আছে, এই মরা চোখজোড়া দিয়ে সে চেয়ে দেখে, মরণশীতল আলোর ঝলক ফেলে সে। বিম্ সব সময় তাকে এড়িয়ে যায়, সরে যায় অন্ধকার কোণে। আর এখন তার দৃষ্টি দেখে রীতিমতো কাঁপুনি আসছে শরীরে, কিন্তু প্রভু নেই পাশে। তাই এখন গভীর রাতে বিম্ টেনে টেনে চাপাস্বরে ককিয়ে উঠল, যেমন ভাবে কেউ আর্তনাদ করে বিপদের মুখে পড়লে। ওর বিশ্বাস ছিল কেউ না কেউ শুনতে পাবে, এমন কি বলা যায় না প্রভুর কানেও যেতে পারে।

এলো স্তেপানভ্‌না।

'কী হল রে বিম্? কী ব্যাপার? ইভান ইভানভিচ নেই। এ-হে-হে, খারাপ লাগছে।'

বিম্ না চোখের দৃষ্টি দিয়ে, না লেজ নেড়ে তার কথার কোন জবাব দিল না। ও কেবল দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। স্তেপানভ্‌না আলো জেবলে দিয়ে চলে গেল। আলো জবলার সঙ্গে সঙ্গে মন খানিকটা হালকা হল — চাঁদ অনেকটা দূরে সরে গেল, তার আলো কমে গেল। বিম্ চাঁদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সোজা বাতির নীচে জায়গা করে নিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফের দরজার সামনে গিয়ে শুল — অপেক্ষা করতে হবে যে!

সকালে স্তেপানভ্‌না জাউ নিয়ে এসে বিমের খাবারের বাটিতে ঢেলে দিল, কিন্তু বিম্ উঠে পর্যন্ত দাঁড়াল না। অন্ধের পথপ্রদর্শক কুকুরটার বেলায়ও এই রকম ঘটেছিল — তার জন্য যখন খাবার আনা হত তখন সে উঠত না।

'বোঝ একবার, কেমন নরম মনটা, অ্যাঁ? এ যে ধারণারই আনা যায় না!

আচ্ছা যা, একটু বেড়িয়ে আয় বিম্।' দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'যা যা, বেড়িয়ে আয়।'

বিম্ মাথা তুলে মনোযোগ দিয়ে বুড়ির দিকে তাকাল। 'বেড়ানো' কথাটি ওর পরিচিত, এর অর্থ স্বাধীনতা, আর 'যা যা, বেড়িয়ে আয়' — অর্থ হল পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কাকে বলে, বিমের জানা আছে — অর্থাৎ প্রভুর আজ্ঞামতো সবই তুমি করতে পার। কিন্তু এখন প্রভু নেই, অথচ ওকে বলা হচ্ছে: 'যা, বেড়িয়ে আয়।' এ কেমন ধারা স্বাধীনতা?

কুকুরদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে হয় স্তেপানভ্‌নার জানা ছিল না, কিন্তু এটা সে জানত যে বিমের মতো কুকুরেরা কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে এবং যে-সমস্ত কথা ওরা জানে সেগুলোর ধারণক্ষমতা অনেক, পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থদ্যোতক। সরলমনে সে বিম্‌কে বলল:

'জাউ যদি খেতে না চাস তাহলে যা, কিছু খুঁজে পেতে বার করে খা গে। তুই ত ঘাসপাতাও ভালোবাসিস। বলা যায় না হয়ত ডাস্টবিন খুঁজেও কিছু পেতে পারিস (সরল বিশ্বাসে সে এই কথাগুলো বলল — তার জানা ছিল না যে বিম্ ডাস্টবিনের ধারে কাছে যায় না)। যা, খোঁজ গে।'

বিম্ উঠে দাঁড়াল, এমন কি গা ঝাঁকানিও দিল। এটা কী ব্যাপার? 'খুঁজে বার কর', 'খোঁজ'? কী খুঁজে বার করতে হবে? 'খোঁজ' — এর অর্থ, লুকনো কোন পনীরের টুকরো খুঁজে বার কর, শিকার খুঁজে বার কর, কোন হারানো কিংবা লুকনো জিনিস খুঁজে বার কর। 'খোঁজ' — এ হল আদেশ, কিন্তু কিসের খোঁজ করতে হবে সেটা বিম্ ঠিক করে অবস্থা বুঝে, ঘটনা কোন দিকে চলছে তা দেখে। কিন্তু এখন কী খুঁজতে হবে?

এসবই ও স্তেপানভ্‌নাকে বলল চোখের ভাষায়, লেজ নেড়ে, সামনের দুই থাবা প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক নেড়েচেড়ে; কিন্তু স্তেপানভ্‌না ওর কথার ছিটেফোঁটাও বুঝতে পারল না, তাই আবার বলল:

'যা, বেড়িয়ে আয়। খোঁজ গে!'

বিম্ দরজার দিকে ছুটল। বিদ্যুৎগতিতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে ছুটে নেমে এলো উঠোনে। খুঁজতে হবে খুঁজে বার করতে হবে প্রভুকে! এ-ই তাহলে ওকে খুঁজতে হবে — এছাড়া আর কীই বা হতে পারে! কথাটা ও এই ভাবে বুঝল। এই ত এখানে স্ট্রেচারটা ছিল। হ্যাঁ, এখানেই ছিল। সাদা স্মক পরা যেই লোকগুলো এসেছিল তাদের মৃদু, খুবই মৃদু একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে জায়গাটায়। গাড়ির চিহ্ন। বিম্ একটা পাক খেয়ে নিল,

গন্ধটা হৃদয়ঙ্গম করে নিল ও (যে-কোন কুকুর, এমন কি অতি অপদার্থ কোন কুকুরও এক্ষেত্রে তাই করে থাকবে), কিন্তু আবার — আবার সেই একই চিহ্ন। সেই চিহ্ন ধরে গিয়ে ও রাস্তায় বেরিয়ে এলো, কিন্তু বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কোনার কাছাকাছি ওটা হারিয়ে ফেলল — ওখানে গোটা রাস্তাটায় ঐ একই টায়ার-টায়ার গন্ধ। মানুষের পায়ের চিহ্ন হয় নানা ধরনের, অনেক রকমের, কিন্তু মোটরগাড়ির দাগগুলো সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সবগুলোই একরকম। কিন্তু যে চিহ্নটা ওর দরকার সেটা উঠোন থেকে বেরিয়ে রাস্তার ঐ কোনাটায় গেছে, তার মানে ওকেও যেতে হবে ঐ দিকটায়।

বিম্ এ রাস্তা ও রাস্তা ছুটোছুটি করে বেড়াল, বাড়ির কাছাকাছি এসে ইভান ইভানভিচের সঙ্গে যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়াত সেই সমস্ত জায়গাও পাক দিয়ে দেখল — কোথাও কোন চিহ্নমাত্র নেই। একবার দূর থেকে একজনের মাথায় চেক-কাটা টুপি দেখতে পেয়ে ও ছুটে গিয়ে লোকটার নাগাল ধরেছিল — কিন্তু না, প্রভু নয়। আরও মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার পর ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে চেক-কাটা টুপি মাথায় অজস্র লোকে রাস্তায় যাতায়াত করে। বিম্ আর কোত্থেকে জানবে যে এ বছরের শরৎকালে কেবল চেক-কাটা টুপিই বাজারে বিক্রি হয়েছে, আর তাই সেগুলো সবার পছন্দ না হয়ে উপায় ছিল না! এর আগে এদিকটায় ও তেমন একটা নজর দেয় নি, কেননা কুকুরদের সব সময় এবং প্রধানত মনোযোগ থাকে (তারা মনেও রাখে) মানুষের পোশাকের নীচের অংশটার প্রতি। এই স্বভাবটা তারা পেয়েছে নেকড়েদের কাছ থেকে, এটা তাদের প্রকৃতিদত্ত, শত শত বছরের অবদান। যেমন শিয়াল — শিকারী যদি কেবল কোমর-সমান উঁচু ঘন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, সে যদি নড়াচড়া না করে এবং বাতাসে যদি তার গায়ের গন্ধ ভেসে না আসে, তাহলে শিয়ালের পক্ষে তার উপস্থিতি টের পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে বিম্ এই ঘটনাটির মধ্যে অতর্কিতে কেমন যেন একটা দূরসম্পর্কিত অর্থের সন্ধান পেল: বুঝতে পারল ওপর থেকে সন্ধান করার কোন অর্থ হয় না, যেহেতু রঙের বিচারে মাথা অনেকেরই একরকম হতে পারে, একের সঙ্গে অন্যের মিল দেখা যেতে পারে।

পরিষ্কার দিনটা। কোন কোন রাস্তার ফুটপাত ঝরাপাতায় ঢাকা পড়ে ছোপ ছোপ দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও পাতা ঘন হয়ে ঝরে পড়ে আছে, প্রভুর পায়ের সামান্যতম চিহ্নও যদি পড়ত বিম্ ঠিক ধরতে পারত।

কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই।

দিনের মাঝামাঝি সময় বিম্ হতাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় একটা বাড়ির উঠোনে ও হঠাৎ স্ট্রেচারের চিহ্ন আবিষ্কার করল — এখানে স্ট্রেচার রাখা হয়েছিল। এর পর ঐ একই গন্ধের ধারা ভেসে এলো একটা পাশ থেকে। বিম্ সেই ধারার সূত্র ধরে লোকের পায়ে মাড়ানো পথ বয়ে এগিয়ে চলল। একটা বাড়ির দরজার চৌকাট থেকে ভেসে আসছে সাদা-স্মক-পরা লোকজনের গন্ধ। বিম্ দরজার গা আঁচড়াতে লাগল। একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল, তারও পরনে সাদা স্মক। দরজা খুলেই কিন্তু সে আঁতকে উঠে এক লাফে পিছনে সরে গেল। কিন্তু বিম্ যত উপায়ে সম্ভব মেয়েটিকে প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল: 'ইভান ইভানভিচ এখানে আছে কি?'

'চলে যা, চলে যা!' চিৎকার করে এই কথা বলে মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দরজাটা একটু ফাঁক করে কার উদ্দেশে যেন চেঁচিয়ে বলল: 'পেত্রোভ্! কুত্তাটাকে খেদিয়ে দাও ত। নইলে বড় কর্তা আমাকে আর আস্ত রাখবেন না, গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবেন, বলবেন, 'খোঁড়ল না এম্বুলেন্স — কী এটা?' খেদাও!'

গ্যারেজের কাছ থেকে একটা লোক এগিয়ে এলো, তার পরনে কালো রঙের একটা ঢিলে পোশাক। লোকটা বিমের উদ্দেশে মাটিতে পা ঠুকল; অনেকটা যেন কর্তব্যের খাতিরেই, এমন কি কিছুটা আলস্যভরেও বটে গলা উঁচিয়ে বলল:

'তবে রে হারামজাদা! যা! যা বলছি!'

তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের কোন আভাস পাওয়া গেল না।

'বড় কর্তা', 'খোঁড়ল', 'খেদানো', 'আস্ত না রাখা', 'গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগানো' — এ ধরনের কোন কথাই বিম্ বুঝত না, এমন কি কস্মিনকালে শোনেও নি, আর 'এম্বুলেন্স'? — সে ত দূরস্থান। তবে 'চলে যা', 'যা বলছি' — এই কথাগুলো বলার ভঙ্গি ও মেজাজের সঙ্গে মিলিয়ে ও দিব্যি বুঝতে পারল। এখানে বিম্‌কে ঠকানো যাবে না। ও দৌড়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে বসল, তাকিয়ে রইল ঐ দরজাটার দিকে। লোকে যদি জানত বিম্ কী খুঁজছে তাহলে ওকে হয়ত সাহায্য করতে পারত, যদিও ইভান ইভানভিচকে এখানে আনা হয় নি, তাকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কী আর করা যাবে যদি কুকুর মানুষকে বুঝতে পারে, অথচ মানুষ সব সময় কুকুরকে না বুঝতে পারে, এমন কি একে অন্যকে বুঝতে

না পারে! অবশ্য এরকম গভীর ভাবনাচিন্তা বিমের অগম্য। আরও যে ব্যাপারটা বিমের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল তা এই যে এতটা আস্থা নিয়ে, সহজসরল অকপট মনে দরজার গা আঁচড়ানো সত্ত্বেও এমন কী কারণ থাকতে পারে যার ভিত্তিতে ওকে ওখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, যেখানে কিনা ওর বন্ধুর থাকাটা খুবই সম্ভব।

কাছে একটা লাইলাকে ঝোপ ছিল। পাতা ঝরতে থাকায় ঝোপটা বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। বিম্ সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল ঝোপের ধারে। কত গাড়ি যে এলো গেল! একেকটা গাড়ির ভেতর থেকে সাদা স্মক-পরা লোকজন বেরিয়ে আসে, কাউকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, কেউ বা স্রেফ ঐ সব লোকের পিছন পিছন হেঁটে চলে; ক্বচিৎ কখনও গাড়ি থেকে স্ট্রেচারে করে লোক বার করা হয়। তখন বিম্ খানিকটা এগিয়ে এসে গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা করে দেখে — না, প্রভু নয়। সন্ধ্যা নাগাদ অন্যান্য লোকজনেরও দৃষ্টি পড়ল কুকুরটার ওপর। কে যেন এক টুকরো সসেজ নিয়ে এলো — বিম্ ছুঁয়েও দেখল না; আরেকজন আবার গলার কলার চেপে ওকে ধরতে গেল — বিম্ দৌড়ে সরে গেল। এমন কি কালোরঙের ঢোলা পোশাক পরা সেই লোকটি কয়েকবার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সমবেদনার দৃষ্টিতে বিমের দিকে তাকাল, মাটিতে পা ঠুকল না। বিম্ মূর্তির মতন স্থির হয়ে বসে রইল, কাউকে কিছু বলল না। অপেক্ষা করতে লাগল।

আবছা আঁধার ঘনিয়ে আসতে ওর টনক নড়ল — আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে যে প্রভু এতক্ষণে বাড়িতে ফিরে এসেছে! একথা মনে হতেই ও ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটল।

শহরের রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটছে একটা সুন্দর কুকুর — ধলা কুকুর, কান তার শামলা, গায়ের লোম চকচক করছে, দেখেই বোঝা যায় বেশ পরিচর্যা করা হয় কুকুরটাকে। যে-কোন ভালোমানুষ এ দৃশ্য দেখে বলবেন: 'আহা, কী সুন্দর শিকারী কুকুর!'

বিম্ নিজের বাড়িতে এসে দরজার গা আঁচড়াল, কিন্তু দরজা কেউ খুলল না। তখন ও কুণ্ডলী পাকিয়ে চৌকাটের সামনে শুয়ে পড়ল। খাবার কিংবা জলপানের — কোন ইচ্ছাই তার হল না — বিন্দুমাত্র না। মন খারাপ।

সিঁড়ির চত্বরে বেরিয়ে এলো স্তেপানভ্না। বিম্‌কে দেখতে পেয়ে বলল:

'আহা রে বেচারি! এসেছিস?'

বিম্ কেবল একবার লেজ নাড়াল (অর্থাৎ 'এসেছি')।

'আচ্ছা, এবারে তাহলে রাতের খাবার খা,' সকাল বেলার জাউয়ের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল।

বিম বাটি ছঁুল না।

'হুঁ যা ভেবেছি — নিজেই খাবার খুঁজে খেয়ে এসেছিস। বেশ বেশ, বুদ্ধি আছে তাহলে। ঘুমো এখন।' এই বলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

সেই রাতে বিম্ আর ডাকাডাকি করল না। কিন্তু দরজা ছেড়ে নড়ল না — অপেক্ষা করতে হবে যে!

সকাল হতে আবার ছটফট করতে লাগল। খুঁজতে হবে, বন্ধুকে খুঁজতে হবে! এটাই ওর জীবনের ব্রত — একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। স্তেপানভ্না যখন ওকে রাস্তায় ছাড়ল তখন প্রথমেই ও ছুটে গেল সাদা স্মক-পরা লোকগুলোর কাছে। কিন্তু এবারে থলথলে চেহারার কে একজন লোক সকলের উদ্দেশে তর্জনগর্জন করল, ঘন ঘন 'কুকুর' কথাটা শোনা গেল তার মুখে। বিমের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়ল লোকগুলো, যদিও মনে হল যেন অনেকটা ইচ্ছা করেই এমন ভাবে ছুঁড়ছে যাতে ওর গায়ে না লেগে পাশে গিয়ে পড়ে। ওরা লাঠিসোটা উঁচিয়ে ওর দিকে ধেয়ে গেল, শেষকালে লম্বা একটা ডালের ছড়ি দিয়ে ওকে কষে মারল। বিম্ ওখান থেকে ছুটে দূরে সরে গিয়ে খানিকটা বসে থাকার পর সিদ্ধান্ত করল ওখানে প্রভু থাকতে পারে না, থাকলে ওকে ওরা এমন নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দিত না। বিম্ তাই মাথা সামান্য হেঁট ক'রে চলে গেল।

শহরের রাস্তা দিয়ে বিষণ্নমনে চলেছে এক নিঃসঙ্গ কুকুর — বিনা কারণে, মিছিমিছি ওকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল।

বেরিয়ে গিয়ে পড়ল একটা কর্মব্যস্ত রাস্তায়। কাতারে কাতারে লোক চলেছে, সবাই কর্মব্যস্ত, কদাচিৎ তাড়াহুড়োর মাঝখানে নিজেদের মধ্যে দু' একটা কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে, জনস্রোত চলছে ত চলছেই, কোথায় কে জানে, এর যেন কোন শেষ নেই। বিমের সম্ভবত হঠাৎ মাথায় খেলল: 'আচ্ছা, এখান দিয়ে প্রভু যেতে পারে ত?' ভাবামাত্রই কোন রকম যুক্তিতর্কের অপেক্ষা না করে গেট থেকে খানিকটা দূরে একটা কোণে ছায়ায় গিয়ে বসল, বসে বসে নজর রাখতে লাগল রাস্তার লোকজনের ওপর, বলতে গেলে একটা লোকও ওর মনোযোগ এড়াল না।

প্রথমত বিম্ লক্ষ করল সব লোকেরই গায়ে যেন গাড়ির ধোঁয়ার গন্ধ,

আর তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে নানা রকম বৈশিষ্ট্যসূচক অন্যান্য গন্ধ।

ঐ যে চলেছে একেবারে ক্ষয়ে যাওয়া ঢাউস একজোড়া জুতো পায়ে রোগা লম্বা লোকটি, জালিব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছে আলু, যেমন আলু বাড়িতে এনেছিল বিমের প্রভু। রোগা লোকটা আলু নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার গা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে তামাকের। দ্রুত পা ফেলছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলেছে, মনে হচ্ছে বুঝি কারও নাগাল ধরতে যাচ্ছে। কিন্তু ওটা কেবল মনেই হচ্ছে— আসলে সে ভাবে দেখতে গেলে প্রত্যেকেই কারও না কারও নাগাল ধরতে যাচ্ছে। সকলেই কিছু একটা খুঁজছে — মাঠে পরীক্ষার সময় বিমের বেলায় যেরকম হয় — নইলে রাস্তায় ছুটতে যাবে কেন, ছুটে বাড়ির দরজায় এসে ফের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার ছুটতেই বা যাবে কেন?

রোগা লোকটা চলতে চলতে কথা ছুঁড়ে দিল:

'এই যে শামলা-কান, কী খবর?'

বিম্ মনোযোগ বিচ্ছিন্ন না ক'রে, লোকজন নিরীক্ষণ করতে করতেই মাটিতে লেজটা সামান্য নাড়িয়ে গম্ভীর ভাবে প্রতিনমস্কার জানাল।

আবার এই যে, এই লোকটার পিছন পিছন চলেছে আরেকজন, তার গায়ের ওভারঅল থেকে গন্ধ ছাড়ছে দেয়ালের — দেয়াল চাটলে, ভিজে দেয়াল থেকে যেমন গন্ধ বেরোয়। লোকটা প্রায় আগাগোড়া ছাইছাই-সাদা রঙের। নিয়ে চলেছে একটা ভারী ব্যাগ আর সাদা একটা লাঠি — লাঠিটার আগায় আবার ছোট্ট একটু দাড়ি।

লোকটা বিম্‌কে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, জিজ্ঞেস করল:

'কী রে? এখানে কী করছিস? প্রভুর জন্যে ঠায় বসে অপেক্ষা করছিস বুঝি? নাকি হারিয়ে গেছিস?'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করতে হবে,' সামনের দুটি থাবা একটু নাড়াচাড়া করে একথাই বলতে চাইল বিম্।

'তাহলে এই নে।' লোকটা তার ব্যাগ থেকে একটা মোড়ক বার করল, বিমের সামনে একটা মিঠাই রেখে ওর কালো কানটার পেছনে মৃদু চাপড় মারল। 'খা খা।' (বিম স্পর্শও করল না।) 'ট্রেনিং পাওয়া দেখছি। বুদ্ধিমান জাতের। পরের হাত থেকে খাচ্ছে না,' এই বলে সে নিঃশব্দে, নিশ্চিন্তমনে এগিয়ে চলল। লোকটাকে দেখে আর দশজনের মতো মনে হল না।

আর যার কাছে যা-ই হোক না কেন, বিমের কিন্তু ভালো লাগল এই

লোকটাকে। লোকটা জানে 'অপেক্ষা করা' কাকে বলে, বলেছে 'অপেক্ষা করার' কথা, বিম্‌কে বুঝতে পেরেছে।

ইয়া মোটা, নাদুসনুদুস লোকটা বয়ে নিয়ে চলেছে একটা মোটা ফাইল, তার হাতে একটা মোটা ছড়ি, নাকে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা — লোকটার সবই মোটা-মোটা। তার গা থেকে যে গন্ধ বেরোচ্ছে সেটা যে কাগজের তাতে কোন সন্দেহ নেই — ঠিক এই রকম কাগজের ওপরই ইভান ইভানভিচ কাঠি দিয়ে খসখস করত; এছাড়াও যেন পাওয়া যাচ্ছে সেই হলুদ কাগজের গন্ধ, যে কাগজ লোকে সব সময় পকেটে রাখে। চলতে চলতে বিমের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা বলল:

'ধুত্তোর! বোঝ কাণ্ড! কোথায় এসে ঠেকেছি আমরা? — বড় রাস্তার ওপর কুত্তা, অ্যাঁ?'

একটা আঙ্গিনার গেট থেকে বড় ডাণ্ডাওয়ালা ঝাড়ু হাতে এক চৌকিদার বেরিয়ে এসে মোটার পাশে দাঁড়াল। মোটা লোকটা আঙুল দিয়ে বিম্‌কে দেখিয়ে চৌকিদারের দিকে ফিরে বলল:

'দেখতে পাচ্ছ? তোমারই এলাকায় কিন্তু, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঘটনা যখন চোখের সামনে তখন দেখতে পাচ্ছি বৈকি!' এই বলে চৌকিদার লম্বা ঝাড়ুর দাড়িটা ঊর্ধ্বমুখে রেখে ডাণ্ডায় ভর দিয়ে দাঁড়াল।

'দেখতে পাচ্ছ... দেখতে পাচ্ছ না হাতী,' চটে গিয়ে বলল লোকটা। 'মিঠাই পর্যন্ত খাচ্ছে না, খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। এর পর আমরা আর বাঁচি কী করে?' রাগে সে ফেটে পড়ছে।

'তা তোমার আর বেঁচে কাজ নেই,' এই বলে চৌকিদার উদাসীন ভঙ্গিতে যোগ করল: 'ঈস্‌, কী রোগা হয়ে গেছে, আহা বেচারি!'

'কী! অপমান করছ!' গাঁক গাঁক করে বলল মোটা।

তিনটে অল্পবয়সী ছোকরা ওদের কথাবার্তা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারা কেন জানি একবার মোটার দিকে, আরেকবার বিমের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

'হাসির কী হয়েছে তোমাদের শুনি? হাসছ কেন? আমি ওকে বললাম... কুকুর! হাজারটা কুকুর, প্রত্যেকের পেছনে দু'-তিন কিলো করে মাংস — দিনে লাগছে দু'-তিন টন। একবার ভেবে দেখ কত দাঁড়াচ্ছে!'

ছেলেদের মধ্যে একজন আপত্তি তুলে বলল:

'তিন কিলো একটা উটেও খেতে পারে না।'

চৌকিদার বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ওর ভুল শুধরে দিল:

'উটে মাংস খায় না।' বলেই হঠাৎ ঝাড়ুর ডান্ডাটা আড়াআড়ি বাগিয়ে ধরে বেশ জোরে জোরে মোটার পায়ের সামনে অ্যাসফল্ট বাঁধানো পথ ঝটাঝট ঝাড়ু দিতে লাগল। হেঁকে বলল: 'সরে যান, সরে যান মশাই! কী হল? কী বললাম? — মাথায় কি থান ইঁট আছে নাকি?'

মোটা বিরক্ত হয়ে থুতু ফেলে স্থানত্যাগ করল। ঐ তিনটি ছোকরাও মুখ টিপে হাসতে হাসতে নিজেদের পথ ধরল। ওরা চলে যেতে চৌকিদারের ঝাড়ু দেওয়াও থেমে গেল। সে বিমের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল:

'বসে থাক, অপেক্ষা কর্। আসবে 'খন।' তারপর চলে গেল গেটের ভেতরে।

এই সব কথা কাটাকাটির মধ্য থেকে বিম্ যে কেবল 'মাংস', 'কুকুর', এমন কি সম্ভবত 'কুত্তা' — এই কথাগুলিই বুঝতে পারল তা নয়, কথা বলার ভঙ্গিও সে শুনেছে, আর বড় কথা সব দেখেছে — একটা বুদ্ধিমান কুকুর এ থেকে সহজেই অনুমান করে নিতে পারে যে মোটার পক্ষে বেঁচে থাকাটা খারাপ, কিন্তু চৌকিদারের পক্ষে — ভালো; একজন — মন্দস্বভাবের, আরেকজন — ভালোমানুষ। বিমের চেয়ে আর কেই বা ভালো জানে যে ভোরের আলো ফোটার আগে রাস্তায় বেঁচে থাকার মতো মানুষ বলতে একমাত্র চৌকিদারদেরই দেখা যায়, আর তারা কুকুরদের ভক্তিশ্রদ্ধার চোখে দেখে? চৌকিদার যে মোটাকে তাড়িয়ে দিল এটা বিমের কতকটা ভালোই লেগেছে। তবে হ্যাঁ, মোটের ওপর এই আকস্মিক তুচ্ছ ঘটনাটি বিমের মনোযোগটা কেবল বিক্ষিপ্ত করল, যদিও অভিজ্ঞতাটা হয়ত বা কাজেরই — এই অর্থে, যে ও এখন অস্পষ্টভাবে আন্দাজ করতে পারছে সব লোক একরকম নয়—কেউ ভালো, কেউ বা মন্দ। যাই হোক না কেন, আমরা বলব এটা অন্যের দৃষ্টি থেকেই লাভের। কিন্তু আপাতত বিমের কাছে এর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই — অত কথা ভাবার সময় ওর নেই — রাস্তায় যারা যাতায়াত করছে ও কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের দেখতে লাগল।

কোন কোন মহিলার গা থেকে পাওয়া যাচ্ছিল লিলি ফুলের মতো অসহ্য কটু গন্ধ, সাদা-সাদা সেই সব ফুলের গন্ধ যাতে ঘ্রাণশক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং যার সামনে বিমের বোধশক্তি সর্বদাই লোপ পেয়ে যায়; এরকম ক্ষেত্রে বিম্ মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ

করে রাখছিল — এটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। অধিকাংশ মহিলারই ঠোঁটের রঙ ঐ নিশানগুলোর মতো, যেগুলো নেকড়ের ডেরায় হানা দেবার সময় বিম্ দেখতে পেয়েছিল। এই রঙটাও বিমের পছন্দ নয় — কোন জন্তুরই নয়, বিশেষত কুকুর আর ষাঁড়ের ত নয়ই। প্রায় সব স্ত্রীলোকই হাতে একটা না একটা কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিম্ লক্ষ করে দেখল জিনিস-হাতে পুরুষমানুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে, কিন্তু স্ত্রীলোক — প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

...কিন্তু না, ইভান ইভানভিচের কোন পাত্তা নেই। বন্ধু আমার! তুমি কোথায়?

জনস্রোত চলেছে ত চলেইছে। লোকজনের মাঝখানে বিম্ মনের দুঃখ খানিকটা ভুলে থাকল, ওর নিরানন্দ ভাব অনেকটা যেন কেটে গেল, ও আরও মনোযোগ দিয়ে সামনের দিকে লক্ষ রাখতে লাগল ইভান ইভানভিচ যাচ্ছে কিনা। আজ বিম্ এখানে অপেক্ষা করবে। ওকে অপেক্ষা করতে হবে!

একটা লোক বিমের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। লোকটার মুখে লক্ষ করার মতো জটিল কুঞ্চনরেখা, নাকটা খাঁদা, পুরুষ্টু ঠোঁটজোড়া ঝুলে পড়েছে, চোখদুটো প্যাটপেটে। সে হুংকার দিয়ে উঠল:

'কী জঘন্য ব্যাপার!' (রাস্তার লোকজন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।) 'সর্বত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা, মহামারী, পাকস্থলীর ক্যানসার, আর এখানে? — এটা কী?' বিমের দিকে হাত ছুঁড়ে করতল প্রসারিত করে দিয়ে সে বলল। 'এখানে কিনা এত লোকজনের মাঝখানে, খেটে-খাওয়া লোকজনের একেবারে মধ্যিখানে বসে আছে মূর্তিমান ছোঁয়াচে রোগ!'

লোকটার কথায় আপত্তি তুলে একজন তরুণী বলল:

'সব কুকুরই রোগ ছড়ায় না। চেয়ে দেখুন, কী সুন্দর কুকুর! — দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।'

খাঁদা-নাক একবার ওপর থেকে নীচে, আরেকবার নীচ থেকে ওপরে দৃষ্টি বুলিয়ে মেয়েটির আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল, বলল:

'কী বর্বরতা! কী বর্বরতাই না দেখতে পাচ্ছি আপনার মধ্যে!'

অতঃপর... ইস্ বিম্ যদি মানুষ হত! অতঃপর এগিয়ে এলো সেই বয়স্থা স্ত্রীলোকটি, সেই 'সোভিয়েত নারী', যে কুৎসা রটিয়েছিল বিমের

নামে। বিম্ প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে গা ঝাড়া দিয়ে দু' কাঁধের উঁচু ফলকের ওপরকার লোম আলুথালু করে ও আত্মরক্ষামূলক পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। বিমের কাছ থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে লোকজন অর্ধবৃত্তাকারে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। বয়স্থা স্ত্রীলোকটি তাদের দিকে তাকিয়ে তড়বড় করে বলতে লাগল:

'বর্বরতা বলে বর্বরতা! আরে, এটা যে আমাকে কামড়েছে। কা-ম-ড়ে-ছে!' বলার সঙ্গে সঙ্গে সে সকলকে নিজের হাতটা তুলে দেখাল।

পোর্টফোলিও হাতে এক তরুণ জিজ্ঞেস করল:

'কামড়েছে? কোথায়? দেখান।'

'কথা শোন একবার! নাক টিপলে ত দুধ পড়ে!' এই বলে সে হাতটা লুকিয়ে ফেলল।

খাঁদা-নাক বাদে আর সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

ইনস্টিটিউটের ছাত্রটার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলল সে:

'ইনস্টিটিউটে শিক্ষা দিয়েছে বটে তোকে, শয়তানের ছা। আহা, শিক্ষার বলিহারি! জঘন্য! তুই কি না আমাকে, একজন সোভিয়েত নারীকে বিশ্বাস করিস না? এতদূর আস্পর্ধা! এর পরে তোর কী গতি হবে? বন্ধুরা আমার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কোন্ জাহান্নামে আমরা যেতে বসেছি? তাহলে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে আমাদের এখানে সোভিয়েত শাসনক্ষমতা বলে কিছু নেই?'

গালাগাল শুনে তরুণটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দারুণ ক্ষেপে গেল।

'অন্যের দৃষ্টিতে যদি আপনি দেখতে পেতেন আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, তাহলে হয়ত এই কুকুরটাও আপনার ঈর্ষা উদ্রেক করত।' স্ত্রীলোকটির দিকে পা বাড়িয়ে এগিয়ে এসে সে গলা চড়িয়ে বলল: 'অপমান করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?'

বিম্ যদিও একটি কথাও বুঝতে পারছিল না, তবু আর ও সহ্য করতে পারল না — বয়স্থা স্ত্রীলোকটির দিকে ও লাফ মেরে সর্বশক্তিতে ঘেউঘেউ করে উঠল, কিন্তু আর বেশিদূর না গিয়ে, চার পায়ে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিল (এর পরও যদি কিছু ঘটে তার জন্য ওর কোন দায়দায়িত্ব নেই)। মার্জিত আর কাকে বলে! কিন্তু হাজার হোক — কুকুর ত।

বয়স্থা স্ত্রীলোকটি বিকট আর্তনাদ ছাড়ল:

'মিলি-শিয়া! মিলি-শিয়া!'

কোথায় যেন হুইস্‌ল বেজে উঠল, কে একজন এগিয়ে এসে চড়া গলায় বলল:

'সরে যান, সরে যান সবাই! যে যার কাজ যান!' লোকটা মিলিশিয়াম্যান (বিম্‌ উত্তেজিত থাকা সত্ত্বেও লেজটা কিন্তু সামান্য নাড়াল)। 'কে চেঁচাল? আপনি?' বয়স্থা স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল।

অল্পবয়সী ছাত্রটি বলল:

'হ্যাঁ, উনিই।'

এবারে খাঁদা-নাক এগিয়ে এসে মিলিশিয়ার লোকটির ওপর বাক্যবাণ বর্ষণ করতে লাগল:

'চোখে দেখতে পান না নাকি? কী করতে আছেন আপনারা? কুকুর কুকুর — একটা জেলা-শহরের বড় রাস্তার ওপর কুকুর!'

'কুকুর!' বয়স্থা স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে বলল।

'আর সেই সঙ্গে এই যে এরকম সব জংলী পিথেকানথ্রোপাস!' ছাত্রটিও চিৎকার করল।

'ও আমাকে অপমান করেছে!' বয়স্থা স্ত্রীলোকটি প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

'সরে যান, সরে যান সবাই। আর আপনি, আপনি, হ্যাঁ আপনিও — ফাঁড়িতে চলুন,' বয়স্থা স্ত্রীলোক, তরুণ ও খাঁদা-নাককে দেখিয়ে সে বলল।

'আর কুকুর?' বয়স্থা স্ত্রীলোকটি হাউমাউ করে উঠল। 'সোজা মানুষ পেয়ে আমাদের ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর কুকুর কিনা...'

'যাব না,' তরুণটির সংক্ষিপ্ত কাটা জবাব।

আরও একজন মিলিশিয়াম্যান এগিয়ে এলো:

'কী ব্যাপার এখানে?'

টাই বাঁধা, মাথায় টুপিপরা একজন লোক ভারিক্কি চালে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলল:

'এই যে ইটি, এই ছাত্তরটি, মিলিশিয়াকে মান্যি করতে চায় না। এনারা, দুজনাই কোন আপিত্তি করতিছেন না, কিন্তু ইটির আপিত্তি। তার মানিই হল অমান্যি করা। কিন্তু সিটি চলে না। বলতিছে যখন, তখন যেতিই হয়। কত কিছুই না ঘটতি পারে...' কথাগুলো বলেই লোকটা সকলের দিক থেকে

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের কানের ভেতরে বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে এমন ভাবে কান খুঁটতে লাগল যে দেখে মনে হল বুঝি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ফুটোটা বড় করার চেষ্টায় আছে। বুঝতে বাকি থাকে না, নিজের চিন্তাভাবনার সারবত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশের জন্য এবং উপস্থিত লোকজনের সামনে — এমন কি মিলিশিয়ার লোকদের সামনেও নিজের সন্দেহাতীত শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যেই তার এই ভঙ্গি।

মিলিশিয়ার লোকদুজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল, যা হোক শেষ পর্যন্ত ছাত্রটিকেও সঙ্গে নিয়ে চলল। ওদের পেছন পেছন গুটিগুটি পায়ে চলতে লাগল থাঁদা-নাক আর বয়স্থা স্ত্রীলোকটি। এখন আর কুকুরের দিকে কারও নজর নেই, লোকে যে যার পথ ধরল — একমাত্র সেই মিষ্টি চেহারার মেয়েটি ছাড়া। সে বিমের দিকে এগিয়ে এসে ওর গায়ে হাত বুলাল, কিন্তু তারপর সেও চলল মিলিশিয়ার লোকদের পিছু পিছু। বিমের বুঝতে বাকি রইল না মেয়েটি নিজে থেকেই যাচ্ছে। মেয়েটিকে ও দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ পা চালাল, তারপর ছুটল, ছুটে মেয়েটার নাগাল ধরে তার পাশে পাশে চলতে লাগল।

মানুষ আর কুকুর চলেছে মিলিশিয়ার ফাঁড়িতে।

মেয়েটি চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল:

'কার জন্যে তুই অপেক্ষা করছিলি রে শামলা-কান?'

বিম্ মনমরা হয়ে মাথা হেঁট করে বসে পড়ল।

'ওরে আমার সোনা, তোর পেটটাও পড়ে গেছে দেখছি। আমি তোকে খাওয়াব, রোস, ভালো করে খাওয়াব রে শামলা-কান।'

বেশ কয়েকবার লোকের মুখে বিম্ 'শামলা-কান' বলে তাকে ডাকতে শুনেছে। প্রভুর মুখেও এক সময় শুনেছে: 'ওঃ, তুই শামলা-কান!' সেই কবে, অনেককাল আগে, যখন বিম্ ছোট ছিল তখন প্রভু বলেছিল। বিম্ ভাবল, 'কোথায় তুমি বন্ধু আমার?' ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে, বিষণ্ণ মনে ও আবার চলল মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে।

ওরা একসঙ্গে ফাঁড়িতে এসে ঢুকল। বয়স্থা স্ত্রীলোকটি সেখানে চেঁচাচ্ছিল, থাঁদা-নাক পুরুষটি গাঁক গাঁক করছিল, ছাত্রটি মাথা হেঁট করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। টেবিলের ধারে বসে ছিল মিলিশিয়ার একজন লোক,

অপরিচিত — অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে কেমন যেন কটমট করে ওদের তিনজনকেই তাকিয়ে দেখছিল।

'অপরাধীকে নিয়ে এলাম,' বিম্‌কে দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'বড় মিষ্টি এই জীবটি। ওখানে যা যা ঘটেছিল আমি একেবারে গোড়া থেকে দেখেছি, শুনেছি।' তারপর মাথা নেড়ে ইশারায় ছাত্রটিকে দেখিয়ে বলল, 'এই ছেলেটির কোন দোষ নেই।'

কখনও বিম্‌কে দেখিয়ে, কখনও বা ঐ তিনজনের কাউকে দেখিয়ে সে ধীরেসুস্থে বৃত্তান্ত বলে যেতে লাগল। বয়স্থা স্ত্রীলোক আর খাঁদা-নাক তার কথার মাঝখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে মিলিশিয়ার লোকটি ধমকে তাদের থামিয়ে দিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটির প্রতি মিলিশিয়ার লোকটি প্রসন্ন। কথার শেষে মেয়েটি রগড় করে বলল:

'আমি ঠিক বলছি কিনা শামলা-কান?' মিলিশিয়াম্যানের দিকে ফিরে যোগ করল, 'আমার নাম দাশা।' তারপর বিমের দিকে ফিরে বলল, 'আমি দাশা, বুঝেছিস?'

বিম্ নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল।

মিলিশিয়াকর্মী বিম্‌কে ডাকল:

'আচ্ছা, এদিকে আয় দেখি শামলা-কান।'

ও, 'এদিকে আয়' কথাটা বিম্ জানে। খুব জানে। বিম্ এগিয়ে এলো।

মিলিশিয়াকর্মী ওর ঘাড়ে মৃদু চাপড় মারল, কলারটা ধরে ভালো করে নম্বরটা দেখে নিয়ে কী যেন লিখল। বিম্‌কে আদেশ করল:

'শুয়ে পড়্!'

বিম্ আদেশ পালন করে শুয়ে পড়ল: পিছনের দুই পা শরীরের নীচে রেখে, সামনের দু'পা সোজা ছড়িয়ে দিয়ে, লোকটার চোখে চোখ রেখে মাথা সামান্য কাত করে।

এবারে মিলিশিয়াকর্মী টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলল:

'শিকারী সমিতি?'

'শিকার!' বিম্ চমকে উঠল। 'শিকার!' এখানে একথা কেন? এর অর্থ কী?

'শিকারী সমিতি? মিলিশিয়ার দপ্তর থেকে। চব্বিশ নম্বর দেখুন। 'সেটার'। নেই কেমন? না থেকে পারে না। বেশ ভালো কুকুর, ট্রেনিংপাওয়া কুকুর।... কী বললেন? নগরপরিষদ? বেশ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ফের

তুলে নিল, কী যেন জিজ্ঞেস করল, মুখে মুখে আওড়াতে আওড়াতে টুকে নিতে লাগল: 'সেটার' কুকুর... বাহ্যত বংশগত ত্রুটি আছে, বংশবৃত্তান্তের প্রমাণপত্র নেই, কুকুরের মালিক ইভান ইভানভিচ ইভানভ, একচল্লিশ নম্বর প্রয়েজ্‌জায়া স্ট্রীট। ধন্যবাদ।' এবারে মেয়েটির দিকে ফিরে বলল: 'আপনাকে সাবাস বলতে হবে, দাশা। কুকুরের মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

বিম্‌ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, মিলিশিয়াকর্মীর হাঁটুতে নাক ঠেকাল, দাশার হাত চাটল, তার চোখের দিকে তাকাল, সরাসরি চোখের ওপর দৃষ্টি রাখল — কেবল বুদ্ধিমান, আদুরে, বিশ্বাসপ্রবণ কুকুরের পক্ষেই এভাবে তাকান সম্ভব। ও কিন্তু বুঝতে পারল কথা হচ্ছে ইভান ইভানভিচ সম্পর্কে, যে লোকটি ওর বন্ধু, ওর ভাই, ওর কাছে ভগবান — অন্তত মানুষ হলে এক্ষেত্রে তা-ই বলত। উত্তেজনায় বিম্‌ কাঁপতে লাগল।

মিলিশিয়াকর্মী বয়স্থা মহিলা ও খাঁদা-নাকের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠে কড়া গলায় বলল:

'আচ্ছা, এবারে আসতে পারেন।'

খাঁদা-নাক সঙ্গে সঙ্গে ডিউটিরত মিলিশিয়াকর্মীর ওপর ঝাল ঝাড়তে লাগল:

'ব্যস্‌ হয়ে গেল? এরকম যদি আপনাদের বিচার হয়, তাহলে আইনশৃঙ্খলার আর কী অবশিষ্ট থাকবে? সব রসাতলে গেল!'

'যান, যান দাদু, আর দিক করবেন না। বললাম ত আসতে পারেন। বিশ্রাম করুন গে।'

'আমি আবার তোমার দাদু হলাম কোত্থেকে? আমি তোমার বাপের বয়সী। শ্লা শুয়োরের বাচ্চা, ভালো করে কথা বলতেও শেখে নি।' তারপর আঙুল দিয়ে ছাত্রটিকে দেখিয়ে বলল, 'আবার তোমরাই কিনা চাও এই এদের মানুষ করতে! হাত বুলোও, হাত বুলোও, বাবা বাছা করে মাথায় হাত বুলোও। রোসো, ও-ই একদিন তোমাদের ওপর খেঁকিয়ে ডাক ছাড়বে! — ঘেউ! টের পাবে, যখন তোমাদের গিলে খাবে।' লোকটা সত্যি সত্যিই হুবহু কুকুরের গলায় ঘেউ ডাক ছাড়ল।

বিম্‌ও জবাবে ঐ একই রকম ডাক ছাড়ল।

ডিউটিরত মিলিশিয়াকর্মী হো হো করে হেসে বলল:

'দেখলেন ত বাবামশাই, কুকুর কিন্তু বুঝতে পারে, দরদ দেখাচ্ছে।'

মানুষ আর কুকুরের দ্বৈত ডাক শুনে বয়স্থা স্ত্রীলোকটি চমকে উঠে বিমের কাছ থেকে পিছু হটে দরজার দিকে সরে গিয়ে আর্তকণ্ঠে বলল:

'ও আমাকে দেখে অমন করছে, আমাকে দেখে। দেখ কান্ড! মিলিশিয়ার ফাঁড়িতে পর্যন্ত! সোভিয়েত নারীকে রক্ষা করার কেউ নেই!'

শেষকালে ওরা দুজনে চলে গেল।

ছাত্রটি এবারে মুখ বেজার করে জিজ্ঞেস করল:

'আমাকে কি আটকে রাখছেন?'

'মিলিশিয়াকে মানতে হয়। ফাঁড়িতে ডেকে পাঠালে যেতেই হয়। এটা নিয়ম।'

'নিয়ম? সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে চোরের মতো করে টেনে হিঁচড়ে মিলিশিয়ার দপ্তরে নিয়ে আসা — এটাকে নিয়ম বলতে চান? উচিত ছিল ঐ মহিলাটিকে পনেরো দিনের জেল দেওয়া, আর আপনারা কিনা... হুঃ, যত সব!' এই বলে বিমের কানটা সামান্য নেড়ে দিয়ে চলে গেল।

এবারে কিন্তু বিম্ মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না — মন্দ লোকেরা মিলিশিয়াকর্মীকে গালাগাল করে, ভালো লোকেরাও গালাগাল করে, মিলিশিয়াকর্মী গালাগাল সহ্য করে, শুধু তা-ই নয়, উত্তরে মৃদু হাসে। কোন বুদ্ধিমান কুকুরের পক্ষেও ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব বলে মনে হয় না।

'নিজেই পৌঁছে দেবেন ত?' ডিউটিরত মিলিশিয়াকর্মী জিজ্ঞেস করল দাশাকে।

'হ্যাঁ। বাড়ি চল্ রে শামলা-কান, বাড়ি চল্।'

বিম্ এবারে আগে আগে চলল। চলতে চলতে ফিরে তাকায়, দাঁড়িয়ে পড়ে দাশার জন্য অপেক্ষা করে। 'বাড়ি চল্' কথাটা ও চমৎকার বোঝে, দাশাকে ও বাড়ির দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল। লোকে কিন্তু ধারণা করতে পারে নি যে ও নিজেই ফ্ল্যাটে আসতে পারত। তারা ভেবেছিল যে কুকুরটার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম আছে; বুঝতে পারল কেবল দাশা, একমাত্র দাশা — ফেকাসে-চুল এই মেয়েটি, যার বড় বড় ভাবালু চোখদুটো থেকে দরদ ঝরে পড়ছে, যার ওপর প্রথম দৃষ্টিতেই বিমের বিশ্বাস জন্মেছিল। বিম্ দাশাকে নিজের বাড়ির দরজার সামনে নিয়ে এলো। দাশা দরজার বেল টিপল — কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আরও একবার বেল টিপল, এবার পড়শীদের ফ্ল্যাটের। বেরিয়ে এলো স্তেপানভ্না। বিম্ তাকে সম্ভাষণ জানাল — ওকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল গতকালের তুলনায় প্রফুল্ল, ও বলতে চাইল: 'দাশা

এসেছে। আমি দাশাকে নিয়ে এসেছি।' (বিম্ যেভাবে একবার স্তেপানভ্‌না-র দিকে, আরেকবার দাশার দিকে তাকাচ্ছিল তাতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।)

মহিলা দুজন মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল, ওদের কথাবার্তার মাঝখানে 'ইভান ইভানভিচ' ও 'গোলার টুকরো' এই কথাগুলো কয়েকবার শোনা গেল। এর পর স্তেপানভ্‌না ইভান ইভানভিচের ফ্ল্যাটের দরজা খুলল। বিম্ দাশাকে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানাল — তার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না। দাশা প্রথমেই খাবারের বাটিটা নিল, জাউয়ের গন্ধ শুঁকে বলল:

'নষ্ট হয়ে গেছে।'

ময়লা ফেলার বালতিতে জাউ ফেলে দিয়ে এসে বাটি ধুয়ে মেঝেতে রাখল।

'আমি এক্ষুনি আসছি। অপেক্ষা করিস, শামলা-কান,' সে বলল।

'ওর নাম বিম্,' স্তেপানভ্‌না শুধরে দিয়ে বলল।

'অপেক্ষা করিস বিম্,' বলে দাশা বেরিয়ে গেল।

স্তেপানভ্‌না চেয়ারে বসল। বিম্ তার মুখোমুখি বসল, কিন্তু বারবার দরজার দিকে তাকাতে লাগল।

স্তেপানভ্‌না ওর সঙ্গে কথা বলা শুরু করল:

'তুই কিন্তু বুদ্ধিমান কুকুর। একা পড়ে গেছিস, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কে তোকে মন থেকে ভালোবাসে সেটা বুঝতে পারিস। আমাকে দেখছিস ত রে বিম্, এই আমিও... বুড়ো বয়সে নাতনিটাকে নিয়ে আছি। বাপ-মা ত জন্ম দিয়েই খালাস, কোথায় সেই সাইবেরিয়ায় গিয়ে বসে আছে, মেয়েটা আমার কাছে মানুষ হচ্ছে। নাতনি আমার কিন্তু আমাকে ভালোবাসে, বেশ ভালোবাসে, মনেপ্রাণে ভালোবাসে।'

স্তেপানভ্‌না বিম্‌কে উপলক্ষ করে আসলে নিজের কাছে নিজের মনের কথা উজাড় করে দিচ্ছিল। এই ভাবে দেখা যায় কখন কখন মনের কথা বলার মতো কাউকে সামনে না পেলে মানুষ কুকুরের সঙ্গে, প্রিয় ঘোড়া কিংবা প্রতিপালনকারিণী গাভীর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু কুকুরেরা বিশেষ বুদ্ধি রাখে বলে মানুষের কষ্ট বেশ ভালো বুঝতে পারে, সব সময় সমবেদনা প্রকাশ করে। আর এখানে দুঃখকষ্ট দুই তরফেরই: স্তেপানভ্‌না ত সরাসরি বিমের কাছে অভিযোগই প্রকাশ করছে, আর বিম্ মনে মনে দুঃখ পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে এই ভেবে যে সাদা স্মক-পরা লোকগুলো ওর বন্ধুকে

নিয়ে চলে গেছে। সারা দিনের মধ্যে যত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সেগুলো কিছুক্ষণের জন্য ওর ব্যথাবেদনা ভুলিয়ে রেখেছিল মাত্র, কিন্তু এখন নতুন করে, আরও বেশি করে তা জেগে উঠল। স্তেপানভ্‌নার কথার মধ্যে ও আলাদা করে চিনতে পারল দুটো পরিচিত শব্দ: 'বেশ', আর 'আমার কাছে' — কথাগুলো বলার সময় তার কণ্ঠে বিষাদমাখা আন্তরিক আবেগ ঝরে পড়ছিল। বলাই বাহুল্য, বিম্‌ তার আরও কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, কোলে মাথা রাখল, এদিকে স্তেপানভ্‌না চোখে রুমাল চাপল।

দাশা একটা মোড়ক হাতে নিয়ে ফিরল। বিম্‌ নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে এলো, একটা পা তার চটির ওপর আর মাথাটা অন্য পায়ের থাবার ওপর রেখে মেঝের ওপর উবু হয়ে শুয়ে পড়ল। এই ভঙ্গি করে ও বলতে চাইল: 'ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ।'

দাশা কাগজের মোড়ক খুলে দুটো কাটলেট আর দুটো আলুর চপ বার করে বাটির ভেতরে রেখে বলল:

'নে।'

গত তিন দিন হল বিম্‌ মুখে কুটোটিও কাটে নি, কিন্তু তবু সে দাশার দেওয়া খাবার খেল না। দাশা ওর দুই কাঁধের উঁচু ফলকে মৃদু চাপড় মেরে সস্নেহে বলল:

'নে বিম্‌, নে, খা।'

দাশার কণ্ঠস্বর কোমল, দরদমাখা, মৃদু — মনে হচ্ছিল যেন শান্ত। তার হাতের স্পর্শ উষ্ণ, নরম, স্নেহময়। কিন্তু বিম্‌ কাটলেট স্পর্শ করল না — মুখ ঘুরিয়ে নিল। দাশা বিমের মুখ খুলে মুখের ভেতরে কাটলেট গুঁজে দিল। বিম্‌ দাশার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মুখের ভেতরে কাটলেট নিয়ে বসে থাকল, দেখতে দেখতে কাটলেট আপনা আপনিই গলার ভেতরে চলে গেল। দ্বিতীয় কাটলেটটার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। আলুর চপের ক্ষেত্রেও।

স্তেপানভ্‌নাকে দাশা বলল:

'ওকে জোর করে খাওয়ানো দরকার। প্রভুর জন্যে ও মন খারাপ করছে, তাই খাচ্ছে না।'

স্তেপানভ্‌না অবাক হয়ে বলল:

'বল কী! কুকুর নিজেই খাবার খুঁজে বার করবে। রাস্তায় কত কুকুরই না ঘুরঘুর করে বেড়ায়, কিন্তু না খেয়ে কেউ থাকে না।'

'কী করা যায়?' বিম্‌কে দাশা জিজ্ঞেস করল। 'এভাবে ত বেঘোরে মারা যাবি দেখছি।'

'না না, তা কেন হবে?' স্তেপানভ্‌নার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। 'এরকম বুদ্ধিমান কুকুর বেঘোরে মারা পড়ে না। দিনে একবার আমি ওর জন্যে পাতলা জাউ রান্না করব। কী আর করা যাবে? হাজার হোক প্রাণী ত।'

দাশা কী যেন ভেবে বিমের গলার কলার খুলে নিল।

'আমি যতক্ষণ কলার নিয়ে না আসছি ততক্ষণ বিম্‌কে বাইরে ছাড়বেন না। কাল দশটা নাগাদ আসব।... আচ্ছা, ইভান ইভানভিচ এখন কোথায়?' স্তেপানভ্‌নাকে সে জিজ্ঞেস করল।

বিম্‌ নড়েচড়ে উঠল — প্রভুর কথা হচ্ছে!

'এরোপ্লেনে করে মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হার্টের জটিল অপারেশন। গোলার টুকরোটা একেবারে কাছে কিনা!'

বিম্‌ অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনল, শুনতে পেল: 'গোলার টুকরো', আবার 'গোলার টুকরো'! কথাটা শোকবার্তার মতন শোনায়। কিন্তু ওরা যখন ইভান ইভানভিচের কথা বলছে তখন সে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। খুঁজতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে!

দাশা চলে গেল। স্তেপানভ্‌নাও। বিম্‌কে ফের একা রাত কাটাতে হবে। এখন ও থেকে থেকে ঘুমে ঢুলে পড়ছে, কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। আর প্রতিবারই ও স্বপ্নে দেখতে পায় ইভান ইভানভিচকে — হয় বাড়িতে, নয়ত শিকারে। তখন ও লাফিয়ে উঠে সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়, ঘরের আনাচে-কোনাচে শুঁকতে শুঁকতে ঘোরাঘুরি করে, নিস্তব্ধতার মধ্যে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে, তারপর আবার শুয়ে পড়ে দোরগোড়ায়। ডালের বাড়ি খেয়ে যেখানটা কেটে গিয়েছিল সে জায়গাটা ভীষণ জ্বালা করছে, কিন্তু এত বড় শোকের তুলনায়, না জানতে পারার বেদনার তুলনায় এ ব্যথা তুচ্ছ।

অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে। দাঁত চেপে অপেক্ষা করতে হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আবার সন্ধান

সেদিন সকালে বিমের প্রায় কান্না পেয়ে গেল। সূর্য এতক্ষণে জানলার মাথার ওপরে উঠে গেছে, কিন্তু কারও পাত্তা নেই। দরজায় কান পেতে শুনল — বাড়ির এদিককার ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, লোকজন ওপরের তলা থেকে তাদের ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে কিংবা নীচ তলা থেকে ওপরে উঠছে। সবগুলো পদশব্দই চেনা, কিন্তু প্রভু নেই, নেই ত নেই-ই। অবশেষে শোনা গেল দাশার চটির শব্দ — হ্যাঁ, তারই বটে, কোন সন্দেহ নেই। বিম্ আওয়াজ করে নিজের অস্তিত্ব জানাল। মানুষের ভাষায় ওর চিৎকারের অর্থ দাঁড়ায়: 'আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি, দাশা!'

'এই যে, এই এক্ষুনি,' দাশা সাড়া দিল, তারপর স্তেপানভ্নার দরজার বেল টিপল।

ওরা দুজনে এসে ঢুকল বিমের ঘরে। দুজনকেই সম্ভাষণ জানাল বিম্, তারপর দরজার কাছে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, মহিলাদের দুজনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে লেজ নাড়াতে নাড়াতে যেন কাতর অনুনয় জানাল: 'দরজা খোল। খুঁজতে যেতে হবে।'

দাশা ওর গলায় কলার পরিয়ে দিল। কলারের গায়ে শক্ত করে আঁটা ইয়া চওড়া একটা তক্‌মা আকারের পেতলের পাত, তার ওপর খোদাই করে লেখা আছে: 'নাম বিম্। প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। নিজের বাড়ি ভালোমতো জানে। আপাতত ফ্ল্যাটে একা। আপনাদের কাছে অনুরোধ, ওর কোন ক্ষতি করবেন না।' বিজ্ঞপ্তিটা দাশা স্তেপানভ্নাকে পড়ে শোনাল।

স্তেপানভ্না অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলল:

'তোমার মনটা যে কী ভালো, কী বলব! কুকুর ভালোবাস বুঝি?'

দাশা বিমের গায়ে হাত বুলাল, উত্তরে যা বলল সেটা অদ্ভুত শোনাল:

'স্বামী ছেড়ে চলে গেছে, ছেলেটা মারা গেছে। আমার বয়স তিরিশ। একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'একা। ওঃ আমার বাছা রে!' বিড়বিড় করে বলল স্তেপানভ্না। 'আরে এ যে...'

কিন্তু দাশা ওর কথা শেষ করতে দিল না, বলল:

'আচ্ছা, যাই।' দোরগোড়ায় এসে যোগ করল: 'আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে বিম্‌কে ছাড়বেন না — আমার পেছন পেছন ছুটতে পারে।'

দাশার সঙ্গে সঙ্গে বিম্‌ দরজা দিয়ে গলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু দাশা ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্তেপানভ্‌নার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

এক ঘণ্টারও বেশি কাটে নি — বিম্‌ কি'উ কি'উ শুরু করে দিল, তারপর ককাতে লাগল মনের দুঃখে, এমনই কাতরস্বরে যে এরই জন্য লোকে বলে থাকে 'কুকুরের মতো ককাতে ইচ্ছে করছে'।

স্তেপানভ্‌না ওকে ছেড়ে দিল (দাশা এখন অনেক দূরে), বলল:

'যা, যা। সন্ধেবেলায় পাতলা জাউ রান্না করে দেব 'খন।'

বিম্‌ তার কথায় মন দিল না, চোখের দিকেও নজর দিল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নীচে নেমে গেল — তার পরই পড়ল গিয়ে উঠোনে। উঠোনে মাকুর চালে কিছুক্ষণ এধার-ওধার করার পর বেরিয়ে এলো রাস্তায়, একটু দাঁড়িয়ে কী যেন ভেবে নিল, পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গন্ধের ভাষা পড়তে লাগল — এমন কি যেসব গাছের গায়ে ওর জ্ঞাতিভাইদের মূত্রত্যাগের চিহ্ন আঁকা ছিল এবং যেগুলোর ভাষা পড়া প্রতিটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কুকুরের অবশ্যকর্তব্য, সেদিকে পর্যন্ত ও মনোযোগ দিল না।

সারা দিনের মধ্যে বিম্‌ ইভান ইভানিভচের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। সন্ধ্যার আগে আগে নিছক সন্দেহভঞ্জনের উদ্দেশ্যে ও ঘুরতে ঘুরতে শহরের নতুন করে ঢেলে সাজানো একটা এলাকার এক কাচ গাছপালায় ঘেরা পার্কে গিয়ে ঢুকল। খানিকটা বসে থেকে নাক দিয়ে যতদূর সম্ভব আশপাশ পরীক্ষা করে দেখার পর ও চলে যাওয়ার উদ্যোগ করল। এমন সময় বছর বারো বয়সের একটা ছেলে খেলতে খেলতে সঙ্গীসাথীদের ছেড়ে বিমের কাছে এগিয়ে এলো। কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল।

'তুই কাদের বাড়ির?' প্রশ্নটা সে এমন ভাবে করল যেন বিম্‌ তার জবাব দিতে পারবে।

বিম্‌ প্রথমত ছেলেটাকে সম্ভাষণ জানাল: লেজ নাড়াল, তবে বিষণ্ণ ভাবে, মাথাটা কাত করে — প্রথমে এক দিকে, তারপর আরেক দিকে। এই ভঙ্গির আরও একটি অর্থ হল ও প্রশ্ন করছে: 'আর তুমি? — তোমার পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

ছেলেটা বুঝতে পারল কুকুর আপাতত তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না, সাহস করে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'কী খবর রে, শামলা-কান?'

বিম্ যখন থাবা বাড়িয়ে দিল, ছেলেটা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'ওরে ভাই, তোরা এদিকে আয়, এসে দেখে যা!'

ওরা ছুটে এলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রথম ছেলেটা উল্লসিত হয়ে বলল:

'তোরা চেয়ে দ্যাখ, চোখে কী রকম বুদ্ধি ঝিলিক দিচ্ছে!'

একটা গোলগাল, ফোলাফোলা চেহারার ছেলে যুক্তি দেখিয়ে বলল:

'বলা যায় না, কুকুরটা হয়ত তালিম-পাওয়া। তোলিয়া, ওরে তোলিয়া, তুই ওকে কিছু একটা বল্ — দেখা যাক ও বুঝতে পারে কিনা।'

তৃতীয় ছেলেটি বাকিদের তুলনায় একটি বড় — সে ভারিক্কি চালে জানাল:

'তালিম-পাওয়া কুকুর। দেখছিস না গলায় ফলক ঝুলছে।'

রোগাপটকা একটা ছেলে আপত্তি তুলে বলল:

'তালিম-পাওয়া, না হাতী! তা-ই যদি হত তাহলে অমন টিঙটিঙে আর মনমরা হত না।'

ইভান ইভানভিচ না থাকায় বিম্ সত্যি সত্যিই সাংঘাতিক রোগা হয়ে গেছে, তার আগের চেহারা আর নেই: পেটের চামড়ায় টান পড়েছে, না আঁচড়ানোর ফলে হাঁটুর ওপরকার লোম এলোমেলো হয়ে জট পাকিয়ে গেছে, পিঠের লোমের সে চাকচিক্য আর নেই। মনঃকষ্ট আর অনাহার কারোই সৌন্দর্য বর্ধন করে না — কুকুরেরও না।

তোলিয়া নামে ছেলেটি বিমের কপাল ছুঁতে বিম্ সকলের ওপর বেশ করে নজর বুলিয়ে নিয়ে এখন ওর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করল। এর পর একে একে সবাই বিমের গায়ে হাত বুলাতে লাগল, বিম্ তাতে কোন আপত্তি করল না। সম্পর্ক সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভালো হয়ে উঠল, আর সম্পূর্ণ পারস্পরিক বোঝাপড়া হয়ে গেলে আন্তরিক সখ্যও গড়ে উঠতে দেরি হয় না। তোলিয়া পেতলের ফলকের ওপর লেখাটা জোরে জোরে পড়ল, পড়ার পর উত্তেজিত হয়ে বলল:

'ও বিম! একা ফ্ল্যাটে থাকে! ওরে, শুনছিস তোরা, ওর খিদে পেয়েছে। যা দেখি তোরা বাড়িতে — যে যা পারিস এখানে নিয়ে আয়।'

তোলিয়া বিমের কাছে থাকল, অন্য ছেলেরা যার যার বাড়িতে ছুটে গেল। এবারে তোলিয়া গিয়ে বেঞ্চিতে বসল, আর বিম্ ওর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কুকুরের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তোলিয়া জিজ্ঞেস করল:

'তোর খারাপ লাগছে বোধহয় বিম্, তাই না? তোর প্রভু কোথায় রে?'

বিম্ তোলিয়ার জুতোয় নাক ঠেকিয়ে পড়ে রইল। দেখতে দেখতে এক এক করে ছেলেদের আবির্ভাব ঘটল।

গোলগাল, ফোলাফোলা চেহারার ছেলেটি এনেছে পেস্ট্রি। ওদের মধ্যে যে ছেলেটা বয়সে বড় সে এনেছে এক টুকরো সসেজ, রোগা এনেছে দুটো সরা-পিঠে। সমস্ত খাবার ওরা বিমের সামনে এনে রাখল, কিন্তু বিম্ শুঁকে পর্যন্ত দেখল না।

'ও অসুস্থ। হয়ত বা কোন ছোঁয়াচে রোগই হবে', এই বলে বিমের কাছ থেকে ভয়ে পিছিয়ে গেল রোগা।

গোলগাল ছেলেটা কেন যেন প্যাণ্টে হাত মুছল, সেও সরে গেল। বড় ছেলেটা বিমের নাকে সসেজ ঘষার পর স্থিরনিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত করল:

'খাবে না। ইচ্ছে নেই খাবার।'

গোলগাল তখনও তার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলল:

'মা বলেছে সব কুকুরই রোগ ছড়ায়। আর এটা ত রীতিমতো অসুস্থ।'

তোলিয়া রেগে খেঁকিয়ে উঠল:

'তাহলে যা, দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে। ...'রোগ ছড়ায়, রোগ ছড়ায়'... আরে বাপু, যারা রোগ ছড়ায় কুকুর-খেদাড়েরা তাদের টপাটপ ধরে, কিন্তু এটা — দেখতে পাচ্ছিস না কী রকম তক্‌মা আঁটা!'

ছেলেটার যুক্তিপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণে কাজ হল: ছেলের দল আবার ঘিরে দাঁড়াল বিম্‌কে। তোলিয়া কলার ধরে ওকে তুলল। বিম্ উঠে বসল। তোলিয়া ওর নরম ঠোঁট একদিকে ঘুরিয়ে ধরতে চোয়ালের অনেকখানি ভেতরে, যেখানে দাঁতের পাটি শেষ হয়েছে সেখানে একটা ফাঁক দেখতে পেল। সসেজের টুকরো ভেঙে নিয়ে ঐ ফাঁকের ভেতরে গলিয়ে দিল—বিম্ টুকরোটা গিলে ফেলল। আরও একটা টুকরো — এটাও গিলে ফেলল। এই ভাবে উপস্থিত সকলের অনুমোদনক্রমে সসেজ-পর্ব শেষ হল। সকলে

গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে লাগল, এদিকে গোলগাল বিমের প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ঢোক গিলে চলল, যদিও তার মুখের ভেতরে কিছু ছিল না: তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বিম্‌কে খাবার গিলতে সাহায্য করছে। পেস্ট্রির টুকরোটা কিছুতেই ভেতরে ঢোকানো গেল না — ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে গেল। বিম্‌ তখন শেষ পর্যন্ত পেস্ট্রি নিজেই নিল, উপুড় হয়ে শুয়ে দুই থাবার মাঝখানে ওটা ধরে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর খেয়ে ফেলল। বোঝাই গেল কাজটা ও করল তোলিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাবশত। তোলিয়ার হাত এমন দরদমাখা, তার চোখের দৃষ্টি এত কোমল, বুঝিবা সামান্য বিষাদমাখাই, আর বিমের জন্য তার এত মমতা যে অন্তরের বিপুল উচ্ছ্বাসের সামনে ও দাঁড়াতে পারল না, ওজর-আপত্তি খাটাতে পারল না। এর আগেও বাচ্চাদের সঙ্গে বিমের ভালোই বনত, কিন্তু এখন ওর চূড়ান্ত ভাবে বিশ্বাস হল যে ছোটরা সবাই ভালো, কিন্তু বড়রা অনেক রকমের — কেউ ভালো, কেউ মন্দ। ও অবশ্য এটা জানত না, ওর পক্ষে জানা সম্ভবও ছিল না যে এই ছোটরাই এক দিন বড় হবে, ওরাও নানা রকমের হবে। কিন্তু এই ভালো-মানুষ ছোটরাই কী ভাবে এবং কেন বড় হয়ে ঐ বয়স্থা স্ত্রীলোক ও খাঁদা-নাকের মতো খারাপ হয়ে যায় সে সব বিচার-বিবেচনা করা কুকুরের কম্ম নয়। ও স্রেফ তোলিয়ার খাতিরে পেস্ট্রিটা খেল — এর বেশি কিছু নয়। ফলে ওর মন অনেকটা হালকা হয়ে এলো, তাই সরা-পিঠে খেতেও আপত্তি করল না। তাছাড়া এক সপ্তাহের মধ্যে বিম্‌ এই নিয়ে মোট দ্বিতীয়বার খেল।

বিমের ভোজনপর্ব শেষ হওয়ার পর প্রথম কথা শুরু করল তোলিয়া:

'দেখা যাক, কী কেরামতি দেখাতে পারে ও।'

রোগা বলল:

'সার্কাসে লাফাতে হলে চিৎকার করে বলতে হয় 'আপ্‌'।

বিম্‌ সামান্য উঠে দাঁড়াল, মনোযোগ দিয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, অর্থাৎ 'কিসের ওপর দিয়ে — আপ্‌?'

ছেলেদের মধ্যে দুজন বেল্‌টের দুটো প্রান্ত ধরে দাঁড়াল, আর তোলিয়া আদেশ দিল:

'বিম্‌! আপ্‌!'

বিম্‌ অবলীলাক্রমে সামান্য বাধাটা লাফিয়ে পার হল। সকলে মুগ্ধ। গোলগাল স্পষ্ট হুকুম দিল:

'শুয়ে পড়্!'

বিম্ শুয়ে পড়ল (যা বলবে, তোমাদের খাতিরে সানন্দে করব)।

'বোস্', তোলিয়া বলল (বিম বসে পড়ল)। 'নিয়ে আয়!' এই বলে মাথার টুপি ছুঁড়ে দিল।

বিম্ টুপিটাও নিয়ে এলো। তোলিয়া দারুণ উল্লসিত হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল; বিম্‌ই বা ঋণী থাকবে কেন? — ও সোজা ছেলেটার গাল চেটে দিল।

বলাই বাহুল্য, এই ছোটদের সঙ্গ পেয়ে বিমের মন হালকা হয়ে এলো। কিন্তু ঠিক এই সময় ছড়ি দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এলো এক মাঝবয়সী পুরুষ। লোকটা এমন নিঃশব্দে এলো যে ছেলেরা ওকে লক্ষই করে নি, ওদের চমক ভাঙল যখন সে জিজ্ঞেস করল:

'কার কুকুর?'

লোকটার চালচলন ভারিক্কি, মাথায় সরু কানাতঘেরা ছাইরঙা টুপি, টাইয়ের বদলে গলায় একটা ছাইরঙা বো, পরনে ছাইরঙা কোট, সাদাটে ছাইরঙা প্যাণ্ট, মুখে ছোট ছাইছাই দাড়ি, চোখে চশমা। বিমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে আবার বলল:

'কী হল খোকারা? কুকুরটা কার, জিজ্ঞেস করছি যে!'

বড় ছেলেটি আর তোলিয়া দুজনেই একসঙ্গে উত্তর দিল, কিন্তু ওদের দুজনের উত্তর হল দুরকম।

একজন সরল মনে বলল:

'কারও নয়।'

'আমার,' তোলিয়া সতর্কতার সঙ্গে বলল। 'এই মুহূর্তে আমার।'

এই ছাইরঙা লোকটিকে তোলিয়া এর আগেও কয়েকবার দেখেছে — গম্ভীর ভঙ্গিতে একা একা পার্কের চারধারে চক্কর দিতে। এমন কি একবার তাকে একটা কুকুর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতেও দেখেছে — কুকুরটা কিছুতেই যেতে চাইছিল না। একবার আবার ছেলেদের দলের দিকে এগিয়ে এসে ওদের খুঁত ধরে বলে যে সকালের ছেলেপুলেদের মতন খেলতে ওরা জানে না, ভদ্রতার বালাই ওদের নেই, ওদের ঠিকমতো শিক্ষা দেওয়া হয় না—আগেকার দিনে এমন হত না, শুধু তা-ই নয়, ওদের জন্য, এই সমস্ত অকালকুষ্মাণ্ডদের জন্য লোকে যুদ্ধ করেছে, এমন কি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত করেছে, অথচ ওরা কিনা সে সবের কোন মূল্যে দেয় না, কিছুই করার

ক্ষমতা রাখে না — এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কী হতে পারে!

সেই দূর অতীতে ছাইরঙা যখন ওদের শিক্ষা দিয়েছিল তখন তোলিয়ার বয়স ছিল নয় বছর। এখন বারো। কিন্তু লোকটাকে তোলিয়ার মনে আছে। এখন তোলিয়া বিম্‌কে জড়িয়ে ধরে বসে থেকে বলল 'আমার'।

এবারে লোকটা অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে তোলিয়াকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে কী হল? কারো নয়, নাকি ওর?'

গোলগাল ছেলেটি ওদের কথাবার্তার মাঝখানে ফস করে বলে বসল:

'ওর গলায় ঐ যে ফলক ঝুলছে।'

ফলে বিপদ আর ঠেকানো গেল না। ছাইরঙা বিমের দিকে এগিয়ে এলো, ওর কানে মৃদু চাপড় মারল, কলারের ওপরকার লেখাটা পড়ল।

বিম্ ঠিক টের পেল, ওর বুঝতে বাকি রইল না যে ছাইরঙার গা থেকে কুকুরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, গন্ধটা ফিকে, বহু দিনের পুরনো, কিন্তু গন্ধ যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিম্ লোকটার চোখের দিকে তাকাল, তৎক্ষণাৎ ওর মন বিরূপ হয়ে উঠল, ও তাকে কোনমতে বিশ্বাস করতে পারল না — না কণ্ঠস্বরে, না চাউনিতে, এমন কি গায়ের গন্ধেও নয়। কোন লোকের গায়ে যে নেহাৎ অকারণে নানা কুকুরের পুরনো গন্ধ লেগে থাকবে এমন হতে পারে না। বিম্ ছাইরঙার হাত থেকে কলারটা ছাড়ানোর চেষ্টায় তোলিয়ার কাছে ঘেঁষে এলো, কিন্তু ছাইরঙা ওকে ছাড়ল না।

তোলিয়াকে ধমক দিয়ে সে বলল:

'মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়, খোকা। ফলকটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কুকুর তোমার নয়। লজ্জা করে না খোকা! বাবা-মা বুঝি তোমাকে এটাই শিখিয়েছেন? মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছেন? বড় হয়ে কী হবে তাহলে? এঃ হে হে!' এর পর পকেট থেকে একটা বেল্‌ট বের করে বিমের কলারের সঙ্গে আঁটল।

তোলিয়া বেলটটা খপ করে চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলল:

'ধরবেন না! দেবো না।'

ছাইরঙা ওর হাত ঠেলে সরিয়ে দিল।

'কুকুরটাকে যথাস্থানে জিম্মে করে দেওয়া আমার কর্তব্য। কে জানে হয়ত বা এর জন্যে থানায় ডাইয়ারী (লোকটা ডাইয়ারীই বলল) করতে হবে। হয়ত ওর মালিক অ্যালকো-হল (এই রকমই উচ্চারণ করল সে) খেয়ে উচ্ছন্নে

গেছে। সেক্ষেত্রে কুকুরটাকে বাজেয়াপ্ত করতে হয়। আমার চাকরিটাই এরকম — সব কিছু করি সৎভাবে, মানুষের মতো। এই হল কথা। ওর ফ্ল্যাট খুঁজে বার করব, যাচাই করে দেখব ঠিক কিনা।'

'কিন্তু ফলকটাই আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না' খোঁচা মেরে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞেস করল তোলিয়া।

'বিশ্বাস করি বৈ কি খোকা, খুবেই করি। কিন্তু...' একটা আঙুল ওপরে তুলে গুরুমশায়ের সুরে প্রায় বিজয়ীর ভঙ্গিতে সে বলল, 'ঐ যে বলে না, বিশ্বাস করো, কিন্তু যাচাই করে দেখো!' বলেই বিম্‌কে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

বিম্ জোর করে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল, তোলিয়ার দিকে ফিরে তাকাল, দেখতে পেল ক্ষোভে, দুঃখে তোলিয়া কাঁদছে, কিন্তু কী আর করা যাবে! যাই হোক পরে ঐ ছাইরঙার পেছন পেছনই লেজ গুটিয়ে মুখ নীচু করে চলতে হল। ওকে তখন চিনতেই পারা যাচ্ছিল না। ওর পুরো চেহারা-ছবি যেন বলছিল: 'প্রভু যখন কোথাও নেই তখন এমনই দুর্দশা হয় আমাদের এই কুকুরদের।' এক্ষেত্রে একটা কাজ করলেই কিন্তু ঝামেলা চুকে যায় — উরুতে কামড় দিয়ে মার ছুট। কিন্তু না, বিমের দ্বারা তা হবার নয়, সে হল মার্জিত রুচির কুকুর: অতএব নিয়ে চল যেখানে খুশি।

যে রাস্তা দিয়ে তারা চলল সেখানে নতুন নতুন ঘরবাড়ি। সব নতুন। সবগুলোই ছাইরঙা, আর এমন এক রকম দেখতে যে বিমের পক্ষেও গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। এই রকম একটা এক চেহারার বাড়ির তেতলায় ওরা উঠল, ওঠার সময় বিম্ লক্ষ করল দরজাগুলোও সব এক রকম।

দরজা খুলল একজন স্ত্রীলোক, তার পরনে ছাইরঙা পোশাক।

'আবার একটাকে নিয়ে এসেছ। হা ভগবান, কী কাণ্ড!'

'থাক থাক, আর নাকি কান্না নয়!' কড়া গলায় ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ছাইরঙা। বিমের গলা থেকে কলারটা খুলে দেখিয়ে বলল: 'এই যে দেখ, চেয়ে দেখ।' স্ত্রীলোকটি চশমা নাকে দিয়ে পড়তে লাগল, এদিকে পুরুষটি বলে চলেছে:'জ্ঞানগম্যি কিছু থাকলে ত! আরে বাবা, সারা প্রজাতন্ত্রে একমাত্র আমিই হলাম কুকুরের ব্যাজের কালেক্টর। আর এই যে ফলকটা — এটা একটা জিনিসের মতো জিনিস! পাঁচশটা ব্যাজ হল।'

বিম্ কিছু বুঝতে পারল না, বিন্দুবিসর্গ কিছুই বোধগম্য হল না

ওর — কোন পরিচিত শব্দ নেই, ভাবভঙ্গি থেকেও বোঝার উপায় নেই — এক কথায়, কিছুই নেই।

এবারে ছাইরঙা বাইরের ঘর থেকে ভেতরের ঘরে ঢুকল কলারটা হাতে করে। সেখান থেকে ডাকল:

'বিম্, আমার কাছে আয়!'

বিম্ খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে শেষকালে সাবধানে ভেতরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে ছাইরঙার কাছে এগিয়ে না গিয়ে দোরগোড়ায় বসে বসেই চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিল। পরিচ্ছন্ন দেয়ালে ঝুলছে মখমলে মুড়ে সেলাই করা কতকগুলো তক্তা, তক্তার গায়ে ঝুলছে কুকুরের সারি সারি স্মারকচিহ্ন— নম্বর লেখা পাত, টোকেন, মেডেল — কোনটা ছাইরঙা, কোনটা বা হলুদ, কয়েকটা সুন্দর সুন্দর বেল্ট আর কলার, কয়েকটা উন্নত ধরনের পশুমুখবন্ধনী এবং কুকুরের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সামগ্রী, এমন কি গলা টিপে মারার জন্য নাইলনের ফাঁস, যার তাৎপর্য অবশ্য বিমের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না; সংগ্রহের অধিকারী যে কোথা থেকে এই বস্তুটি যোগাড় করে তা মানুষের পক্ষে পর্যন্ত বোঝা অসম্ভব। বিমের কাছে ওটা সাধারণ একটা দড়ি বৈ আর কিছু নয়।

বিম্ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে দেখলে ছাইরঙার হাতের মধ্যে ওর গলায় বাঁধার কলারটা ঘুরছে, দেখতে দেখতে সে প্লাস দিয়ে পাতটা খুলে ফেলল, দেয়ালে ঝোলানো মখমলমোড়া একটা তক্তার গায়ে এ'টে লাগাল, নম্বর লেখা টিকিটটা নিয়েও তাই করল, তারপর বিমের গলায় কলারটা পরিয়ে দিয়ে বলল:

'তুই কুকুরটা ভালোই বলতে হবে।'

কোন এক সময় প্রভুও ঠিক এই কথাই বলত, কিন্তু এখন বিম্ বিশ্বাস করতে পারল না। ও বাইরের ঘরে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, বলতে চাইল: 'আমাকে ছেড়ে দাও! এখানে আমার কিছু করার নেই।'

স্ত্রীলোকটি বলল, 'এবারে ছেড়ে দিলেই ত হয়। এটাকে আবার এখানে টেনে আনার কী দরকার ছিল? রাস্তায় খুললেই হত।'

'কোন উপায় ছিল না — ছেলেছোকরারা পিছে লেগে ছিল। এখনও ছাড়া ঠিক হবে না: যেই দেখবে ফলকটা নেই অমনি জায়গামতো জানিয়ে দিতে পারে — তাহলেই হয়েছে। তাই বলি কি বরং ভোর না হওয়া পর্যন্ত থাকুক — এখানেই রাতটা কাটাক। ...শুয়ে পড়্!' বিম্‌কে সে আদেশ দিল।

বিম্ নিরুপায় হয়ে দোরগোড়ায় শুয়ে পড়ল। এবারেও সেই একই ব্যাপার: একবার গলা ছেড়ে গোঁ গোঁ ডাক ছাড়তে শুরু করলে, ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকলে, ছাইরঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেই কিন্তু ঝামেলা চুকে যেত। আর দেখতে হত না — ছাইরঙা ওকে ছেড়ে না দিয়ে পারত না। কিন্তু বিম্ অপেক্ষা করতে শিখেছে। তাছাড়া হয়রানও হয়ে পড়েছে, আর এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে অচেনা-অজানা লোকের বাড়ির দোরগোড়ায় পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য ঢুল্‌নি এসে গিয়েছিল, যদিও নিশ্চিন্তে ঘুমানো ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বিম্ এই প্রথম বাড়িতে, নিজের ফ্ল্যাটে না এসে অন্য কোথাও রাত কাটাচ্ছে। তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর বিম্ এটা বুঝতে উপলব্ধি করলেও চট চট করে বুঝে উঠতে পারল না ও এখন কোথায় আছে। বুঝতে পারার পর ওর প্রাণ আনচান করে উঠল। আবার ও স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে ইভান ইভানভিচকে; যতবার ওর তন্দ্রা এসেছে সঙ্গে সঙ্গে ও দেখতে পেয়েছে ইভান ইভানভিচকে, আর ঘুম ভাঙার পর অনুভব করেছে তার উষ্ণ হাতের স্পর্শ — এ হাত সেই যখন ও এতটুকু কুকুরছানা ছিল তখন থেকে ওর পরিচিত। কোথায় সে, আমার দরদী, ভালোমানুষ বন্ধু? কোথায়? এই শূন্যতা যে আর সহ্য করা যায় না! অসহনীয় এই একাকীত্ব, এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই। তার ওপর আবার ছাইরঙা লোকটার নাসিকাগর্জনে চতুর্দিক কম্পমান। আর ঐ মখমলমোড়া তক্তাগুলো থেকে ভেসে আসছে মরা কুকুরের গন্ধ। প্রাণটা হু-হু করে ওঠে। বিম কিঁউ কিঁউ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর দুবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল — অবশ্য এবারেও চাপা যেমন শিকারী কুকুর করে থাকে খরগোসের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে। কিন্তু শেষ কালে আর সহ্য করতে না পেরে একটানা কাতর ডাক ছাড়ল।

ও যেন কাঁদতে কাঁদতে বলল: 'ওঃ-হো-হো! ওঃ, ওগো কোথায় কে আছ! আমার কষ্ট হচ্ছে, বড় কষ্ট হচ্ছে বন্ধুকে ছাড়া। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, ছেড়ে দাও, আমি ওকে খুঁজতে যাই। ওঃ-হো-হো, ওগো কোথায় কে আছ!'

ছাইরঙা লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল, আলো জ্বালল, বিমের ওপর ছড়ির বাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে চাপা গলায় হিসহিস করে বলল:

'চোপ্, চোপ্, বেজন্মা! পাড়াপড়শীরা শুনতে পাবে। তবে রে হতভাগা! তাহলে এই পড়ল তোর পিঠে! কেমন লাগে?'

বিম্ সহজাত প্রবৃত্তিবশে কাত হয়ে সরে গিয়ে আঘাত থেকে মাথা বাঁচাতে লাগল। মানুষের মতো কাতরাতে লাগল: 'ওঃ... আঃ... উঃ... ওঃ...'

কিন্তু প্যাজী লোকটা শেষ পর্যন্ত কায়দা করে মাথায় জোর এক ঘা কষিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমের সংজ্ঞা লোপ পেল, ওর ঠ্যাঙ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, কিন্তু দ্রুত সংজ্ঞা ফিরে পেয়েই দরজার কাছ থেকে লাফ দিয়ে সরে গেল, শরীরের পেছনের ভাগ ঠেস দিয়ে কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচোল। এই প্রথম দাঁত খিঁচোল।

ছাইরঙা পিছিয়ে গেল।

'ইস্, দেখ কাণ্ড! হারামজাদা কামড়ানোর মতলব করছে আবার!' এই বলে দরজা হাঁ করে খুলে দিল।

কিন্তু দরজা যে সত্যি সত্যিই খোলা এটা পর্যন্ত বিমের বিশ্বাস হচ্ছিল না, এমন কি তখনও না যখন ছাইরঙা বলল:

'যা যা। বেড়া গে যা বিম্। যা রে লক্ষ্মীটি, যা।'

মারধোরের পর এই গদগদ তোষামুদে কণ্ঠস্বর, এহেন তোয়াজ, চাটুবাক্য বিমের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে পারল না। মারধোরের পর তোয়াজ!— বিমের জীবনে এ এক নতুন আবিষ্কার। সেই বয়স্থা স্ত্রীলোক আর খাঁদা-নাক — তারা নিছক বদলোক। কিন্তু এই এটা... বিম্ এটাকে এখন ঘৃণা করে। দারুণ ঘৃণা করে! বিম্ যেন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, বাস্তবিকই তাই।

বিম্ ঘাড়টা টান করে দাঁত খিঁচিয়ে ছাইরঙার দিকে এগোতে লাগল — নিঃশব্দে কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে, ধীরে ধীরে, কিন্তু মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে। ছাইরঙা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

'করিস কী? করিস কী রে তুই?'

রাত-কাপড়-পরা স্ত্রীলোকটি তারস্বরে ছাইরঙাকে বলল:

'খুব হয়েছে, এখন ঠ্যালা সামলাও! কা-মড়াবে!'

বিম্ দেখতে পেল ভয়ঙ্কর লোকটি ওকে ভয় পাচ্ছে, সে ওকে দারুণ ভয় করছে। ফলে বিমের সঙ্কল্প আরও জোরাল হল — ও লাফ দিল। শত্রু এতক্ষণ টালবাহানা করে নিস্তার পেয়ে গিয়েছিল। এবারে বিম্ ওর পশ্চাদ্দেশ কামড়ে দিল, তারপর একলাফে খোলা দরজা দিয়ে সোজা বাইরে।

বিম্ ছুটতে লাগল, ছুটতে ছুটতে মুখের মধ্যে অনুভব করল মানুষের পশ্চাদ্দেশের মাংসের স্বাদ। অথচ এই অংশটিকে ও দুচক্ষে দেখতে পারে না। না, বিম্ আর এখন নিজেকে হতভাগ্য ও করুণার পাত্র বলে মনে করে না, বরং নিজেকে সাহসী মনে করে, আর সাহসের সঙ্গে সব সময় মিশ্রিত থাকে গর্বের ভাব, আত্মমর্যাদাবোধ — এমন কি অতি নিরীহ প্রাণীর বেলায়ও।

প্রত্যুষের আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিম্ রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। ওর গলায় যদিও নিজের কলারটাই ছিল, কিন্তু এখন তার ওপর '২৪' লেখা নম্বরটা ছিল না। প্রথমে বেজায় তাড়াহুড়ো করার ফলে ও রওনা দিয়েছিল উলটো দিকে — অর্থাৎ শহরের দিকে না গিয়ে শহর থেকে বাইরে (এর পরে আর বাড়িঘর দেখা গেল না)। ও তাই আবার ফিরে এলো, ফিরে এসে পড়ল গিয়ে সেই এক ধাঁচের বাড়িঘরের গোলকধাঁধার মধ্যে। ঘুরল ঘুরল, কত যে পাক খেল, কিন্তু শেষকালে আবার পড়ল গিয়ে সেই বাড়ির সামনে যেখান থেকে ও পালিয়ে এসেছিল। এখানে আসার পরই ও চট করে সঠিক দিকের সন্ধান পেয়ে গেল, এ ব্যাপারে ওকে সাহায্য করল কুকুরসমাজের অতি সাধারণ একটি বিধি, যা মানুষের কাছে তেমন পরিচিত নয়: গতকাল ওকে যখন এখানে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন ও রাস্তার এক কোনায় ওর কোন এক জ্ঞাতিভাইয়ের মূত্রোৎকনের অস্তিত্ব টের পেয়েছিল, আরেক কোনায়—আরও একটার। এখন এই চিহ্নের সাহায্যে পরিচিত কোণ থেকে পরের কোণটায় ছুটে যাবার পরই ও সঠিক দিকনির্দেশ পেয়ে গেল। বস্তুতপক্ষে, এখানে কেবল বাড়ি খুঁজে পাওয়ার জন্য নয়, এখানে থেকে বের হতে গেলেও অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির অধিকারী হওয়া চাই। বিম্ যেমন অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির অধিকারী, তেমনি ওর সাধারণ বুদ্ধিরও কোন তুলনা নেই।

ও যখন নিজের বাড়ির কাছাকাছি এলো ততক্ষণে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে, সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠে চিরপরিচিত দরজার গা আঁচড়াল। কোন সাড়া মিলল না। আরও একবার আঁচড়াল — সেই একই ব্যাপার — নিস্তব্ধতা। সবচেয়ে বড় কথা, দোরগোড়ায় ইভান ইভানভিচের কোন চিহ্ন নেই। তাছাড়া তখন সবে সকাল হয়েছে, অত ভোরে, সকালের ঘুমের আমেজের মধ্যে স্তেপানভ্না যে বিমের সঙ্কেত শুনতে পাবে সে প্রশ্নই ওঠে না। ও চিন্তিতমনে দরজার সামনে খানিকক্ষণ বসে রইল।

প্রহারের সর্বাঙ্গে ব্যথায় জরজর করছে, মাথা ঢিপঢিপ করছে, দারুণ বমি বমি পাচ্ছে, শক্তিতে আর কুলোয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও চলল। চলল ওর বন্ধুর খোঁজে। বিম্ যদি না খোঁজে তবে আর কেই বা খুঁজবে তাকে?

শহরের মধ্য দিয়ে চলেছে একটা কুকুর, চোখেমুখে তার হতাশার চিহ্ন, কিন্তু প্রভুর প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তির এবং সাহসের কোন অভাব নেই তার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রেলওয়ে ক্রসিং-এর ঘটনা

দিনের পর দিন কেটে যায়। বিমের সেদিকে আর কোন খেয়াল নেই। ও নিয়মিত ভাবে শহরের আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালাতে থাকে। এখন শহরের খুঁটিনাটি কিছুই ওর জানতে বাকি নেই।

এখন ও আগে থেকে যাত্রাপথ স্থির করে নিয়ে চলে; লোকে ইচ্ছে করলে বিম্‌কে দিয়ে তাদের ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারত। ও যদি পার্কের কাছে হাজির হয় তার মানে ভোর পাঁচটা, রেলস্টেশনের কাছে হাজির হলে — ছয়টা, কারখানার সামনে — সাড়ে সাতটা, বড় রাস্তায় — বারোটা, নদীর বাঁ ধারের পথে — বিকেল চারটে ইত্যাদি।

এই সুযোগে নতুন নতুন লোকজনের সঙ্গেও ওর পরিচয় ঘটল। বিম্ এই সিদ্ধান্তে এলো যে বেশির ভাগ লোকই ভালো, কিন্তু ভালোমানুষেরা মুখ বুজে রাস্তা চলে, আর যারা খারাপ তারা সর্বক্ষণ বকবক করে। কিছু লোককে ও দেখতে পেল যাদের গায়ে তেলকালি আর লোহার গন্ধ (আগে ও বিচ্ছিন্নভাবে এরকম দু' একটা লোককে দেখেছে)। তারা রোজ সকাল আটটা নাগাদ একটা বিপুল স্রোতের আকারে গেট পেরিয়ে গুমটির দরজার ভেতরে ঢুকে পড়ে।

এই সময় লোকগুলো একদঙ্গল কাকের মতো এমন কলরব তোলে যে তা থেকে সম্ভবত কারও কিছু বোঝার সাধ্যি নেই, অবশ্য সে ব্যাপারে বিমের কোন আগ্রহও নেই। ও সেই জনস্রোতের এক পাশে বসে থাকে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, অপেক্ষা করে।

রোজ সকালে কারখানার নীল ওভারঅল পরা এক ছোকরা বিম্‌কে দেখে সম্ভাষণ জানায়: 'এই কালো-কান! কী খবর?' বলে সে তার মজুদ খাবারের একটা মোড়ক খুলে বিমের সামনে ধরত। 'আচ্ছা, বেঁচে আছিস তাহলে! বেশ বেশ।' মানবিক দরদমাখো হাতের থাবাটা সে বিমের দিকে বাড়িয়ে দেয় — লোকটার খসখসে থাবায় উষ্ণতার ছোঁয়া পায় বিম্‌।

অন্যেরা নীরবে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, ওকে সম্ভাষণ জানায়, তড়িঘড়ি এগিয়ে যায়। এখানে কেউ কখনও বিম্‌কে কষ্ট দেয় নি।

এখন বিম্‌ অল্প অল্প করে লোকজনকে বাছাই ক'রে নানা শ্রেণীতে ভাগ করতে শিখেছে। এই যেমন, পথে প্রায়ই ওর চোখে পড়ে থলথলে চেহারার মেয়েমানুষ — পায়ের আকার বোতলের মতো, সব সময় পরিতৃপ্ত, প্রফুল্ল, চেহারায় সুখী-সুখী ভাব; কিন্তু বিম্‌কে দেখামাত্র বেড়ালের মতো ফ্যাঁচ ক'রে উঠে ইয়া উঁচু বুকের সমান ওপরে কেনা খাদ্যসামগ্রীর থলি তুলে ধরে, প্রতিবারই তাকে বলতে শোনা যায় সেই এক কথা:

'ফুঃ, কী জঘন্য! যত রাজ্যের কুকুরের উৎপাত! এগুলোকে কি মেরে সাফ করা যায় না? এই যে দেখ না আবার কেমন বলা হচ্ছে: 'আমার মিলিশিয়া আমাকে রক্ষা করবে।' হুঃ, রক্ষা করবে না হাতী!.. রক্ষা করার নমুনা হল দিনে দুপুরে রাস্তার যে-কোন কুত্তা তোমার গায়ের পোশাক অনায়াসে টেনে খুলে নিতে পারে। আর মিলিশিয়া? মিলিশিয়ার কাছে আমরা হলাম গিয়ে কুকুরের আরেকটা বাড়তি পা।'

প্রায়ই সে এই একই কথা আওড়াত বলে বিম্‌ তার কুকুরসুলভ সরল মনে বিবেচনা করেছিল যে মেয়েমানুষটির নামই বুঝি বাড়তি পা। কিন্তু বিম্‌ এটা ঠিক জানত যে ওর কাছাকাছি যাওয়া ঠিক হবে না। তারই উল্লেখ করা ডাক নামটা ছাড়া মেয়েমানুষটির কোন কথাই বুঝতে না পারলে কী হয়, দেখার আর শোনার ক্ষমতা কিন্তু বিমের ছিল, তাই ও একটা নিয়ম অনুসরণ করে চলত! এরকম লোকজনের কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকা উচিত। পরে ও কী ভাবে যেন (ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে কি?) নির্ধারণ করতে শিখল কাকে এড়ানো উচিত, পরিহার করে চলা উচিত। ভালো লোকের সংখ্যা অনেক, তারা দলে ভারী; পাজীদের হাতে গোনা যায়; কিন্তু ভালোরা সবাই পাজীদের ভয়ে তটস্থ। বিম্‌ তেমন নয়, ওদের ভয় পায় না, কিন্তু ওদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ওরও নেই। মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধির পরিধি ও গভীরতা ওর বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর

সেই সঙ্গে কুকুরের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বিম্ আর এখন বাহ্য চাকচিক্য ও ভাসা-ভাসা জ্ঞানের অধিকারী কোন ভাববাদী নয় যে যে-কোন পথচারীকে দেখলেই লেজ নাড়বে। অল্পসময়ের মধ্যে বিম্ যেমন রোগা হয়ে গেছে তেমনি হয়ে উঠেছে চিন্তাশীল কুকুর, এখন ওর জীবনের লক্ষ্য আছে — খোঁজা, অপেক্ষা করা।

অবশেষে একদিন খুব ভোরে একটা ফুটপাতের গন্ধ পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। ও থমকে দাঁড়াল, নাক দিয়ে একটা আওয়াজ বার করল, তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো সামনের দিকে ছুটতে লাগল। যে কারও এটাই ধারণা হতে পারে যে ও বুঝি সামনের কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আসলে ও ছুটেছে টাটকা কোন চিহ্নকে অনুসরণ করে — এখান দিয়ে দাশা গেছে! এই কিছুক্ষণ আগেও সে এখানে ছিল।

চিহ্ন ধরে বিম্ এসে হাজির হল রেল স্টেশনে। স্টেশনের দালানে ঢোকা এক অসম্ভব ব্যাপার — কাতারে কাতারে লোক, লোকের আর শেষ নেই; এমন কি রাস্তার ওপরে কোন একটা জানলার সামনে লোকে একে অন্যকে ঠুসছে, চিৎকার-চেঁচামেচি, হাঁকপাঁক, হাইমাই করছে — দেখেশুনে মনে হয় বুঝি শিকারী কুকুরের দল খরগোসের নাগাল পেয়ে তাকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করছে—শিকারীর হাতের চাবুক বা বাঁশির সঙ্কেতের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। এমন পরিস্থিতিতে দাশার চিহ্ন ধরতে পারা অসম্ভব বলেই মনে হল — চিহ্ন হারিয়ে গেল। বিম্ তখন স্টেশন-দালান ছাড়িয়ে চারদিকে একটা চক্কর মেরে বেরিয়ে এলো প্ল্যাটফর্মে। এখানে লোকজন চাকা-লাগানো ছোট ছোট লম্বাটে কতকগুলি বাড়ির দরজার সামনে জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চিৎকার-চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি ত করছিলই না বরং কোলাকুলি করছিল, একে অন্যকে চুমো খাচ্ছিল, এমন কি এক জায়গায় ওরকম একটা বাড়ির দরজার সামনে লোকে নাচছিল পর্যন্ত। বিমের দিকে মন দেবার ফুরসৎ কারও ছিল না, তাই বিম্‌ও এর ওর পায়ের নীচ দিয়ে অনায়াসে মাকুর চালে এপাশ-ওপাশ ক'রে চলতে লাগল, চলতে চলতে গভীর মনোযোগ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের হালচাল বোঝার চেষ্টা করল।

এমন সময় একটা দরজার ভেতর থেকে দাশার গন্ধ পাওয়া গেল। বিম্ দরজার চৌকাটের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বুকে একটা বড় তক্‌মা

আঁটা এক মহিলা ওকে তাড়িয়ে দিল। বিম্ কিন্তু তাতেও দমল না: ও জানলার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে জানলা দিয়ে ভেতরটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করল। পরে লক্ষ করল সবার শেষে বাড়িটার ভেতরে ঢুকল সাদা স্মক-পরা দুই মহিলা। বিম্ ছুটে ওদের কাছে আসতে গেল, কিন্তু বাড়িগুলো ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। বিম্ ছুটে গেল জানলাগুলোর কাছে। ওর কুকুর-মনে যে সিদ্ধান্তের উদয় হল তাকে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলা গেলেও যেতে পারে: ওর মন বলল দাশা ওখানে, সাদা স্মক-পরা লোকজন ওখানে, তাহলে ইভান ইভানভিচও ওখানে থাকতে পারে। খুবই সম্ভব! সাদা স্মক-পরা লোকগুলো ওকে নিয়ে গেল না ত?

এদিকে বিম্, বেচারি বিম্, এখন ওকে হতভাগ্যই বলা যেতে পারে — প্রথমে জানলা দিয়ে ভেতরটা দেখতে দেখতে লঘু পায়ে বাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলতে লাগল। এমন সময় ও দেখতে পেল ওর দাশাকে।

দাশা চিৎকার করে বলল:

'বিম্! বি-ই-ম্! বিম্ রে! আমাকে বিদায় দিতে এসেছে! ওরে আমার বিম্ রে! বি-ই-ম্! বি-ই...'

দাশার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে গেল। বাড়িটা ছুটে বেড়িয়ে গেল। বিম্ কতই না চেষ্টা করল, সর্বশক্তি প্রয়োগ করল, কিন্তু ওটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারল না — ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল।

এর পর ও সব শেষের বাড়িটার পিছন পিছন কিছুক্ষণ ছুটল; দেখতে দেখতে ওটাও চোখের আড়াল হয়ে গেল। বিম্ এর পরেও ছুটতে লাগল ঐ একই পথ ধরে, কেননা রাস্তাটা কোথাও বাঁক নেয় নি। ছুটল অনেকক্ষণ। শেষকালে কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ করে পড়ে গেল রেললাইনের মাঝখানে, চারটে ঠ্যাঙ টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে, শুয়ে পড়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল, মৃদু কুঁউ কুঁউ আওয়াজ করতে লাগল। কোন আশাই আর রইল না। কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাছাড়া যাবার মতো ক্ষমতাও ওর ছিল না — কিছুই ইচ্ছে করছিল না, এমন কি বেঁচে থাকার ইচ্ছেও আর নেই।

কোন কুকুরের যখন আশাভঙ্গ হয় তখন সে স্বভাবতই মারা যায় — মারা যায় নিঃশব্দে, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না — তাদের কষ্ট পৃথিবীর কেউ জানতে পারে না। এই পৃথিবীতে আশা যদি একেবারেই না থাকত, বিন্দুমাত্র

না থাকত তবে সমস্ত মানুষও যে হতাশায় মারা যেত এ নিয়ে বিম্ মাথা ঘামায় না, তাছাড়া অত বড় কথা বোঝার মতো ক্ষমতাও ওর নেই। বিমের কাছে গোটা ব্যাপারটা খুবই সরল — মনের ভেতরটা বেদনায় ভরে উঠেছে, বন্ধু নেই — এর পরে আর কী থাকতে পারে? মরাল যেমন তার দয়িতাকে হারানোর পর ঊর্ধ্বে আকাশে উঠে সেখান থেকে ঢেলার মতো মাটিতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, চখা যেমন তার প্রিয়জনকে, একমাত্র আপনার জন চখীকে হারানোর পর মুখ থুবড়ে পড়ে, ডানা ছড়িয়ে দিয়ে ক্রমাগত ডাকতে থাকে, চাঁদের কাছে মৃত্যুর জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়, বিমেরও তখন সেই দশা: ও শুয়ে শুয়ে বিকারের ঘোরে দেখতে পাচ্ছিল ওর একমাত্র বন্ধুকে, অপরিহার্য সঙ্গীকে — আর তার জন্য ও সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত, এমন কি মনে মনে সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে না পারলেও। কিন্তু এখন ওর মুখে কোন শব্দ নেই। পৃথিবীতে এমন একটি লোকও নেই যে মৃত্যুপথযাত্রী কোন কুকুরের মুখে কাতরানি শুনেছে। কুকুর মরে মুখ বুজে, নিঃশব্দে।

আঃ, এখন বিম্ যদি কয়েক ঢোক জল পেত! সম্ভবত ও আর কখনই উঠে দাঁড়াতে পারত না যদি না...

কে একজন স্ত্রীলোক এগিয়ে এলো। তার পরনে তুলো ঠাসা কোট, ঐ রকমই তুলোঠাসা প্যান্ট, মাথায় রুমাল বাঁধা। আকারে বিশাল, দেহে শক্তি ধরে। প্রথমে বোধহয় সে ভেবেছিল বিম্ মরেই গেছে — হাঁটু মুড়ে বসে ওর ওপর ঝুঁকে কান পাতল — বিমের তখনও নিশ্বাস পড়ছে। বন্ধুকে বিদায় দেওয়ার পর থেকে ও এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে ট্রেনের পেছন পেছন এরকম ছোটা ওর একেবারেই উচিত হয় নি — এটা অবিবেচকের কাজ হয়েছে। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে কি আর বিবেচনা-অবিবেচনার কোন প্রশ্ন ওঠে? — এমন কি মানুষের কাছেও?

স্ত্রীলোকটি বিমের মাথার নীচে করতল রেখে ওকে সামান্য ওঠাল।

'কী হয়েছে রে তোর, বাছা কুকুর? কী হল তোর, ওরে কালো-কান? আহা বেচারি, কার পেছন পেছন দৌড়ুচ্ছিলি রে তুই?'

স্ত্রীলোকটি দেখতে একটু স্থূলে ধরনের হলে কী হবে, তার কণ্ঠস্বর শান্ত, দরদভরা। সে ঢালের নীচে নেমে গিয়ে তেরপলের দস্তানায় করে জল নিয়ে এলো, বিমের মাথাটা আবার তুলে ধরে দস্তানাটা মুখের কাছে এনে ওর নাক জলে ভিজিয়ে দিল। বিম্ জল চাটল। দুর্বল হয়ে পড়ায়

ওর মাথা কাঁপতে লাগল, এই অবস্থায় সামনের দিকে গলা বার করে দিয়ে ও আরও একবার জল চাটল, চুকচুক করে খেতে লাগল। স্ত্রীলোকটি ওর পিঠে হাত বুলাল। তার কিছু বুঝতে বাকি রইল না — ওর কোন প্রিয়জন চলে গেছে, চিরকালের জন্য চলে গেছে, এটা ভয়ঙ্কর, নিদারুণ বেদনার — চিরকালের জন্য বিদায় দেওয়া — এ ত জীবিতকে সমাধিস্থ করারই সামিল!

পরিতাপ করে সে বিম্‌কে বলল:

'আমারও তাই অবস্থা। ...যুদ্ধে বাপ গেল, স্বামী গেল -- ওদের দুজনকেই আমি স্টেশনে বিদায় জানাই। ...দেখছিস কালো-কান, বুড়ো হয়ে গেছি... কিন্তু এখনও ভুলতে পারি না।... আমিও ট্রেনের পিছন পিছন ছুটি... আমিও পড়ে গিয়েছিলাম... মনে মনে মরণ চাইছিলাম। ...খা রে, জল খা, আহা রে বেচারা...'

বিম্‌ ঐ দস্তানায় যতটা জল ছিল তার প্রায় সবটুকু খেয়ে ফেলল। এবারে ও স্ত্রীলোকেটির চোখের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে ওর বিশ্বাস হল মানুষটা ভালো। বিম্‌ তার খসখসে, ফাটা হাত সমানে চাটতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়া চোখের জলও। এই নিয়ে জীবনে দ্বিতীয় বার বিম্‌ মানুষের চোখের জলের স্বাদ জানতে পেল: প্রথম বার যখন প্রভুর চোখ থেকে ঝরে পড়েছিল এরকম মটরদানা; এখন এগুলো — স্বচ্ছ, সূর্যের আলোয় ঝলমলে, গভীর শোকে গাঢ় নোনতা।

স্ত্রীলোকটি ওকে কোলে করে রেললাইনের ওপর থেকে তুলে নিয়ে চালের নীচে শুইয়ে দিল।

'শুয়ে থাক কালো-কান। শুয়ে থাক। আমি আসছি,' এই বলে যেখানে রেললাইনের ওপর কিছু স্ত্রীলোক খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করছিল সেদিকে চলে গেল।

বিম্‌ ওর ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করল। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে শ্লথগতিতে টলতে টলতে তার পিছন পিছন চলল। স্ত্রীলোকটি পিছন ফিরে তাকিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করল ওর জন্য। বিম্‌ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তার সামনে শুয়ে পড়ল।

'প্রভু ছেড়ে চলে গেছে বুঝি?' সে জিজ্ঞেস করল।

বিম্‌ দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে সেও বুঝতে পারল।

কামিনের দলটা যেখানে কাজ করছিল ওরা সেদিকে এগিয়ে গেল। এখানে সকলেই স্ত্রীলোক, ভালোমানুষটির মতোই পোশাক সবার পরনে; এক পাশে আবার একটি পুরুষমানুষও দাঁড়িয়ে ছিল, মাথার গরম টুপিটা পিছনের দিকে সরানো, দাঁতের ফাঁকে পাইপ। লোকটা ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল:

'কুকুর নিয়ে মেতেছ, মাত্রিওনা? কাজটা কে করবে, শুনি? ওঃ মাত্রিওনা, মাত্রিওনা।...যত কথা কেবল এই মাত্রিওনাকে নিয়ে।' বলে সে তার দিকে আঙুল দেখাল।

বিম্ বুঝতে পারল ভালোমানুষটির নাম হল মাত্রিওনা। বিম্‌কে সে রাস্তার ধারে শুয়ে থাকতে বলে নিজে বিশাল একটা প্লাস নিয়ে তাই দিয়ে অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে রেললাইনের স্লীপার চেপে ধরল।

'এক-দুই, হেঁইও!' পুরুষমানুষটি গর্জন করে উঠল। 'ওঠাও আরও, হেঁইও! আরও একটু, হেঁইও!' কোমরে হাত দিয়ে অনেকটা যেন নিজের ঠাট দেখিয়েই তারস্বরে বলল।

প্রত্যেকবার লোকটা হাঁক পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা সবাই মিলে এমন হেঁচকা টান মারে যে তার ফলে কাঠের গুঁড়ি চারদিক থেকে সাঁড়াশীর চাপে যথাস্থানে এসে পড়ে। এই রকম একেকটা হেঁচকা টান মারার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চাপে মেয়েদের মুখ লাল টকটকে হয়ে ওঠে; ওদের মধ্যে একজন দুবলা চেহারার রুগ্‌ণ — তার বরং উলটে ফেকাসে, এমন কি নীল হয়ে যায় মুখের রঙ। মাত্রিওনা সেই মেয়েটাকে হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে যা বলল সে-কথা বিমের প্রভু কোন এক সময় ওকে বলেছিল তাড়াতে গিয়ে!

'সরে যা! বিশ্রাম কর্ গে, নইলে মারা পড়বি যে।' তারপর পুরুষমানুষটির দিকে ফিরে বলল, 'কী হল মুখপোড়া, চিল্লাও না কেন?'

'এক-দুই, হেঁইও!' গাঁক গাঁক করে বলল সে। তারপর মাথার টুপিটা ঠিক করে নিয়ে যেন অনেক কষ্টে সুর করে করে বলতে লাগল: 'সামাল তোরা, খুব সাবধান! মরদ গেল সেই কোন্ থান! হেঁইও, সামাল, তোর সে নাগর জোটায় ছুঁড়ি দিব্যি ডাগর! রোগ ছোঁয়াচে, খবর্দার! হেঁইও হো, থাম্ এইবার!... এইবার রাখো গো যন্তরটা!'

'ছোঁয়াচে' শব্দটা বিম্ এর আগেও শুনেছে খাঁদা-নাক লোকটার মুখে: শব্দটা ভালো নয়; বাকি শব্দগুলো ও বুঝতে পারল না।

মেয়েরা সাঁড়াশী একপাশে সরিয়ে রেখে ভারী ভারী লম্বা হাতুড়ি ঠুকে লোহার গজাল মারতে শুরু করল। মাত্রিওনা অবলীলাক্রমে, অনেকটা যেন খেলার ছলে দুমদাম তিনটে বাড়ি মেরে গোঁজ ঢুকিয়ে দিল, এদিকে রুগ্ণ চেহারার মেয়েটি এককেটা বাড়ি মারে আর কাতরায় 'ওঃ-আঃ!' ক'রে।

ছোঁয়াচে লোকটা পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে হাঁকডাক ছাড়ে: 'চালাও, চালাও! চটপট, চটপট আনিসিয়া!' মেয়েটার কাছাকাছি এসে বলল: 'টেনে মার, নিজের দিকে টেনে তারপর মার — তাহলে সহজে যাবে।'

আনিসিয়া হল সেই রুগ্ণ চেহারার মেয়েমানুষটি। একেকটি গজালের পেছনে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগছিল তার, তাই শেষ পর্যন্ত সে সকলের থেকে আলাদা হয়ে পড়ল। এই সময়ই যে ঘটনাটা ঘটল সেটা মেয়েদের সকলের কাছে দুর্বোধ্য মনে হল: বিম্ শ্লথ গতিতে আনিসিয়ার কাছে এগিয়ে এলো, মাত্রিওনার সঙ্গে যে রকম করেছিল এখানেও তেমনি আনিসিয়ার তিক্তস্বাদের তেরপলের দস্তানা চাটল। সবাই কাজ থামিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে তাকাল বিমের দিকে।

পরে ছোঁয়াচের আদেশে ওরা সকলে ঝোপের নীচে বসে দুপুরের খাবার খেতে লাগল, প্রত্যেকে যার যার পুঁটলি থেকে। বিম্‌কেও খাওয়াল ওরা। বিম্ খেল। এখন ও আর ভালোমানুষদের হাত থেকে খাবার নিতে দ্বিধা করল না। এতেই ও বেঁচে গেল।

সন্ধ্যার দিকে ও অস্থির হয়ে পড়ল: মাত্রিওনার দিকে এগোতে লাগল, বসল, নিস্তেজ ভাবে সামনের পাদুটো ঘসটাতে ঘসটাতে আবার এগোল, তার মুখের দিকে তাকাল, ফের পিছিয়ে গেল, শুয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আবার এগোতে লাগল, আবার দূরে সরে গেল।

মাত্রিওনা ওর মনের ভাব টের পেয়ে বলল:

'চলে যেতে চাস বুঝি কালো-কান? যেতে চাস যা, যা কালো-কান। কোথায় আমি তোকে রাখব বল্? রাখার কোন জায়গা নেই। যা।'

বিম্ বিদায় নিয়ে চলল ধীরে ধীরে, পায়ে-পায়ে। ভঙ্গিটা কুকুরের স্বভাবসুলভ নয়। রেললাইন বরাবর ফিরতি পথ ধরল। পথ পথই, পথ নির্দেশ করে কোথায় যেতে হবে — সঠিক দিক ধরে এগোলে পথভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেবল অসুবিধাটা এই যে ছাইরঙার কাছ থেকে গতকাল পিটুনি খাবার পর সর্বাঙ্গ ব্যথায় টনটন করছে, চলার সময় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কী আর করা যাবে? ভালো বলতে হবে

যে ভালোমানুষ মেয়েদের কল্যাণে মুখে দুটো খাবার দিতে পেরে ও কিছুটা চাঙ্গা বোধ করছে, তাছাড়া পাশের এই পায়ে-চলা-পথটাও বেশ সমান, মসৃণ। অল্প অল্প করে ধাতস্থ হওয়ার পর ও আস্তে আস্তে ছুটতেও লাগল। কুকুরদের জীবনীশক্তি দারুণ হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে তাদের তেমন দেরি হয় না।

অমনি কেউ দেখলে বলবে রেলের রাস্তা ধরে টুকটুক করে চলেছে একটা অসুস্থ কুকুর — এর চেয়ে বেশি কিছু নয়, এর মধ্যে বিশেষ কীই বা থাকতে পারে?

শহরের আরও কাছাকাছি আসতে দেখা গেল পথটা দুভাগ হয়ে গেছে: পাশাপাশি আরও একজোড়া রেলরাস্তা বরাবর বহুদূরে চলে গেছে। তারপর রাস্তা হল তিনটে। গুমটি থেকে খানিকটা দূরে হঠাৎ পালাক্রমে পিটপিট করতে লাগল দুটো লাল চোখ — একবার বাঁয়ের, আরেকবার ডাইনের — এদিক থেকে ওদিকে ছুটে চলেছে। কোন জন্তুরই লাল ভালো লাগে না; যেমন নেকড়ে — লাল নিশানের সারি যে লাফিয়ে পার হবে সে সাধ্যি পর্যন্ত তার নেই, আর খেঁকশিয়ালী চারধার থেকে লাল নিশানে ঘেরাও হয়ে পড়লে সেই বেষ্টনীর মধ্যে দু'-তিনদিন, এমন কি তারও বেশি সময় বসে থাকে। তাই বিম্ ঠিক করল বিশাল বিশাল লাল টকটকে জ্যান্ত চোখদুটোর পাশ কাটিয়ে যাবে। ও তৃতীয় লাইনে সরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভালো করে তাকিয়ে দেখল লাল দপদপে আলোর দিকে, তখনও মনে মনে বুঝতে পারছে না এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। এমন সময় পায়ের নীচে কট্ করে কিসের যেন একটা আওয়াজ হল।

বিম্ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, কিন্তু রেললাইনের ফাঁকের ভেতর থেকে কিছুতেই পা তুলতে পারল না: লাইন বদলের ফাঁকের মধ্যে ভয়ংকর চিপ্‌টে আটকে পড়েছে ওর পা। বিমের আর্তনাদের মধ্যে থেকেও একটি কথাই বোঝা যাচ্ছিল: 'ওঃ কী ব্যথা! বাঁ-চা-ও!'

ধারেকাছে কেউ কোথাও নেই। লোকের দোষ নেই। নেকড়ে কখনও কখনও ফাঁদে পড়ে নিজের পায়ের থাবা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু কুকুর সেটা পারে না, মানুষের সাহায্যের ওপর সে ভরসা করে।

কিন্তু সামনে এটা কী? দুটো বিরাট বিরাট জ্বলজ্বলে সাদা চোখ আলোকিত করে তুলল রেললাইন, সেই সঙ্গে বিম্‌কেও। কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে চোখদুটো ধীরগতিতে বিমের দিকে এগিয়ে আসছে, ওর চোখ ধাঁধিয়ে

দিচ্ছে। বেদনায়, ভয়ে বিম্ কুঁচকে গেল, গুটিসুটি পাকিয়ে গেল। আসন্ন বিপদের ভয়ে ওর মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না। কিন্তু ইয়া বড় বড় চোখ পাকিয়ে ঝিকঝিক আওয়াজ করে এগিয়ে আসতে আসতে জীবটা হঠাৎ দশ-পনেরো হাত দূরে থেমে গেল; যেটুকু জায়গা আলোকিত হয়ে উঠেছিল অন্ধকারের ভেতর থেকে একটি লোক লাফিয়ে তার মধ্যে নেমে পড়ে ছুটে গেল বিমের দিকে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব ঘটল আরও একটি লোকের।

'আহা কী করে তুই লাইনের ফাঁকে পড়ে গেলি রে, বেচারা?' প্রথমজন জিজ্ঞেস করল।

'কী করা যায় এখন?' দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করল প্রথমজনকে।

ওদের গা থেকে অনেকটা ড্রাইভার-ড্রাইভার গন্ধ আসছিল, দুজনের মাথায়ই বড় বড় তকমা আঁটা টুপি।

'আমরা স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছি ঠিকই, কিন্তু থামানোর জন্যে আজ কপালে একচোট আছে,' প্রথমজন বলল।

'এখন আর ও ভেবে কী হবে?' এই বলে দ্বিতীয়জন রেলগুমটির দিকে চলে গেল।

আমাদের বেচারা বিম্ লোকদুটোর কথাবার্তার ভঙ্গিতে (কথা যদিও সে বুঝতে পারল না) বুঝতে পারল ওরা ওর উদ্ধারকর্তা। ও শুনতে পেল রেলগুমটির ভেতরে কর্ণভেদী শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল, এক মিনিটের মধ্যে চাপ আলগা হয়ে পা ছেড়ে দিল। কিন্তু বিম নড়াচড়া করতে পারল না, ওর শরীর অসাড় হয়ে গেছে। তখন ওদের একজন বিম্‌কে রেললাইন থেকে তুলে নিয়ে রাস্তার একপাশে শুইয়ে দিল। সেখানে বিম্ লাট্টুর মতো একই জায়গায় পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের থেঁতলে যাওয়া আঙুলগুলো চাটতে লাগল। তা সত্ত্বেও কিন্তু (কুকুরদের পর্যবেক্ষণশক্তি সত্যিই দারুণ!) গাড়ির জানলা ও দরজা থেকে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ ওর কানে গেল। এখন আর আলো পড়ে ওর চোখ ধাঁধাচ্ছে না, অন্ধকারের মধ্য থেকে ও গাড়ির একপাশ দেখতে পাচ্ছে। নানা কণ্ঠে লোকজন বারবার আওড়াচ্ছে দুটি কথা: 'কুকুর' আর 'শিকারী' — দুটোই ওর খুব জানা।

এই দুই উদারস্বভাবের ভালোমানুষের প্রতি বিম্ কৃতজ্ঞ। ব্যাপারটা তাহলে এই: যে লাইনটার ওপর দিয়ে বিম্ পরম নিশ্চিন্তে চলছিল সেই

লাইনের কোন এক জায়গায় কে যেন পয়েণ্ট বদলে রেখেছে। কিন্তু এই পয়েণ্টবদলের ফলে কোথাকার কোন্ কুকুর পা চেপ্টে নেংচাতে থাকবে তা নিয়ে সেই 'কে-যেন'র এখন আর মাথা ঘামানোর কোন ফুরসৎ নেই। সে যাই হোক না কেন, এখন কিন্তু ও আর রেললাইন ধরে যাচ্ছে না — এটা ও বুঝতে পারল, যেমন অল্প বয়সেই বুঝতে পেরেছিল মোটরগাড়ি যেখান দিয়ে যাতায়াত করে সেখানে হাঁটা উচিত নয়।

যন্ত্রণাকাতর, বিকলাঙ্গ বিম্ তিন ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে চলতে লাগল। ওর আহত থাবাটার আঙুলগুলো ইতিমধ্যে ফুলে উঠেছে, অসাড় হয়ে গেছে। চলতে চলতে মাঝে মাঝে থেমে ও আঙুল চেটে নিচ্ছিল। রক্তপাত ধীরে ধীরে কমে আসছিল, কিন্তু ও ক্রমাগত চেটেই চলল; যতক্ষণ না প্রতিটি তোবড়ানো আঙুল রীতিমতো সাফ করতে পারল ততক্ষণ ক্ষান্ত হল না। এতে ওর খুবই ব্যথা লাগছিল, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কুকুরমাত্রেই জানে — ব্যথা লাগছে, সহ্য করে যাও; ব্যথা লাগছে ত ব্যথার জায়গাটা চাট, ব্যথা লাগলে চুপ করে থাকতে হয়।

...খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিম্ যখন ওদের বাড়ির দরজার সামনে এলো ততক্ষণে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। না, এবারেও ইভান ইভানভিচের কোন চিহ্ন নেই। বরাবরের অভ্যাসমতো এবারেও বিমের ইচ্ছে ছিল দেয়ালের গা আঁচড়ায়, কিন্তু দেখা গেল উপায় নেই: ক্ষতবিক্ষত পাটা নিয়ে পেছনের দুথাবার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো ত সম্ভবই নয়, এমন কি বসাও নয় — কেবল তিন ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে থাক নয়ত উপুড় হয়ে শুয়ে থাক। নিরুপায় হয়ে ও দরজার কোনায় নাক ঠেকিয়ে ভেতরকার গন্ধ পরীক্ষা করে দেখল — প্রভু নেই। তার মানে, একেবারে চলে গেছে। এই ভাবে অনেকটা যেন মাথা দিয়েই দুর্বল শরীরের ভারসাম্য রাখতে রাখতে ও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর স্তেপানভ্নার ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগিয়ে এসে মরিয়া হয়ে জোরে একটা সংক্ষিপ্ত ডাক ছাড়ল: 'ঘেউ!' (আমি এখানে।)

স্তেপানভ্না ওর ডাক শুনে দরজা খুলেই আর্তনাদ করে উঠল:

'ওঃ, হা ভগবান, তুই! কোথায়, কী করে তোর এই হাল হল?' ওকে সঙ্গে নিয়ে ইভান ইভানভিচের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বলল: 'ওরে আমার বেচারি, বেচারি কুকুরের দশাটা দেখ! তোকে নিয়ে এখন কী করি আমি? ইভান ইভানভিচই বা কী বলবেন?'

বিম্ ঠ্যাঙ ছড়িয়ে ঘরের মাঝখানে শুয়ে পড়তে যাবে, এমন সময়...

এ কী শুনছে ও! 'ইভান ইভানভিচ্'? বিম্ মাথা তুলল, অনেক চেষ্টা করে মাথা ঘুরিয়ে স্তেপানভ্নার দিকে তাকাল, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল — যেন জিজ্ঞেস করতে চাইল: 'ইভান ইভানভিচ? কোথায়?'

কুকুরের সঙ্গে কী ভাবে আচরণ করতে হয়, তাকে কী খাওয়াতে হয়, কী ভাবে তার সেবাযত্ন করতে হয় — এসব স্তেপানভ্নার জানা ছিল না, মমতা দেখানোর চেয়ে বেশি আর কিছু সে করতে পারত না। হয়ত মনের মধ্যে মায়া-মমতা ছিল বলেই এবারে সে বিম্‌কে বুঝতে পারল, অনুমান করতে পারল যে ইভান ইভানভিচের নাম শুনতে পেয়ে অসুস্থ কুকুরটা আশার আলোয় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে।

স্তেপানভ্না বলল:

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইভান ইভানভিচ। দাঁড়া দেখি, আমি এখুনি আসছি।'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো একখানা চিঠি হাতে করে, বিমের নাকের কাছে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরে বলল:

'এই যে দেখছিস? চিঠি লিখেছেন ইভান ইভানভিচ।'

বিম্, বেচারি বিম্! মরতে মরতে ওর পুনর্জন্ম হয়েছে, চাপা পড়েও বেঁচে গেছে, বিম্ অসুস্থ, বিন্দুমাত্র আশা নেই ওর মনে! বিম্ থরথর করে কাঁপতে লাগল। চিঠিটার গায়ে ও নাক ঠেকাল, তারপর নাসারন্ধ্র ঠেকিয়ে চিঠির চারধারে নাক বুলাল — হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই... এই ত ইভান ইভানভিচ বেশ জোরে খামটার এধার থেকে ওধারে আঙুল বুলিয়েছে। ...স্তেপানভ্না যখন মেঝে থেকে খামটা তুলে নিয়ে তার ভেতর থেকে চিঠি বার করল, তখন বিম্ অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে স্তেপানভ্নার দিকে শরীরটা বাড়িয়ে দিল। এবারে স্তেপানভ্না ঐ খামের ভেতর থেকেই সম্পূর্ণ সাদা একটা কাগজ বের করে বিমের সামনে রাখল। বিম্ আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল — এখানে ইভান ইভানভিচের আঙুলের গন্ধ লেখা আছে, হ্যাঁ তা-ই, ইভান ইভানভিচ ইচ্ছে করে কাগজের ওপর নিজের আঙুল ঘষেছে।

স্তেপানভ্না বলল:

'তোকে পাঠিয়েছেন রে। লিখেছেনও তাই: বিম্‌কে এই সাদা কাগজটা দেবেন।'

কাগজটার কাছাকাছি আঙুল নির্দেশ করে আবার বলল:

'ইভান ইভানভিচ... ইভান ইভানভিচ...'

বিম্ হঠাৎ অবসন্ন হয়ে সাদা পাতাটার ওপরে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। জীবনে এই প্রথম বিম্ কাঁদল। এই চোখের জল ছিল আশার, এ ছিল আনন্দাশ্রু — আমি আপনাদের বলব, পৃথিবীর সেরা অশ্রু — প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দে এবং অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের উদয়ে লোকে যে অশ্রু বিসর্জন করে এই অশ্রু তার চেয়ে কোন অংশে গৌণ নয়।

...ঈশ্বরের দোহাই, প্রিয় পাঠক! বিশ্বাস করুন আমার কথা: 'সেটার' কুকুর কিন্তু হাসতে পারে, কাঁদতেও পারে।

...স্তেপানভ্না কুকুরকে বুঝতে শুরু করেছে, কিন্তু সে এটাও বুঝতে পারল যে তার পক্ষে ওকে সামলানো সম্ভব হবে না, তার একার সাধ্যে কুলোবে না। অনেকক্ষণ সে বিমের পাশে বসে বসে ভাবতে লাগল নিজের জীবনের কথা। তার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল যেখানে তার জন্ম হয়েছে, যেখানে সে মানুষ হয়েছে, সেই গ্রামে যেতে। এখানে এই ইটের খাঁচাগুলোর ভেতরে মন কী হাঁপিয়েই না ওঠে! — লোকে এখানে বছরের পর বছর একই বাড়িতে থেকেও, এমন কি একই সদর দরজা দিয়ে নিত্য যাতায়াত করা সত্ত্বেও একে অন্যকে জানে না। এই সব ভাবনা চিন্তার মধ্যেও সে কিন্তু বিম্‌কে জল দিতে ভুল করল না।

ওঃ, জলের কী দরকারই না ছিল বিমের! ও কোন রকমে সামান্য উঠে মনের সাধ মিটিয়ে জল খেতে লাগল, ওর মুখ থেকে টপটপ করে ফোঁটায় ফোঁটায় জল মেঝের ওপর পড়তে লাগল। তারপর ফের শুয়ে পড়ল আগেকার ভঙ্গিতে। বিম্ চোখ বুজল, দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন কিসের একটা ঘোরে আচ্ছন্ন।

ভোরের আলো তখন ফোটে ফোটে। স্তেপানভ্না পা টিপে টিপে এত সন্তর্পণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো যে দেখে কারও মনে হতে পারে বুঝিবা তার আশঙ্কা পাছে গুরুতর অসুস্থ মানুষকে বিব্রত করে তোলে।

কিন্তু ঘরের মাঝখানে যে শুয়ে ছিল সে নিছক একটা সাথীহারা কুকুরমাত্র।

কয়েক ঘণ্টা হতে পারে, আবার পুরো একটা দিনরাতও হতে পারে — বিম্ জানে না ঠিক কতক্ষণ ও ঘুমিয়েছিল। পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। তখন দিন, কেননা সূর্য আলো দিচ্ছিল। অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও বিম্ পাতাটা শুঁকে দেখল। প্রভুর গন্ধ অনেকটা ক্ষীণ হয়ে গেছে,

দূরে চলে গেছে বটে, কিন্তু সেটা কোন কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে প্রভু আছে, কোথাও না কোথাও আছে, তাকে খুঁজতে হবে। বিম্ উঠে দাঁড়াল, বাটি থেকে আকণ্ঠ জল পান করে তিন ঠ্যাঙে পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে; ব্যথা লাগছিল, কিন্তু ও ঘরময় ঘুরঘুর করে বেড়াতে লাগল, ভেতর ঘর থেকে বাইরের ঘরে গেল, ফিরে এলো, ঘরের মধ্যে চক্কর মারল। সহজাত প্রবৃত্তি বশে ও জানত শরীরের একটা পাশ যদি ঝিম ধরে, যদি ব্যথা করে, তাহলে হাঁটা দরকার। শিগগিরই থেঁতলে যাওয়া থাবাটাকে কষ্ট না দিয়ে নড়াচড়া রপ্ত করে নিল: পাটাকে মেঝের ওপর না ছেঁচড়ে সামান্য ওপরে তুলতে হয় — তাহলে যন্ত্রণা কম লাগে। স্তেপানভ্না যখন খাবার নিয়ে এলো তখন বিম্ তাকে দেখে লেজ নাড়াল, সে খুশি হল। বিম্ তারপর খাবারও খেল। সত্যি বলতে গেলে কি যখন আশা দেখা দিয়েছে, যখন কুকুরের মাথায় 'খোঁজা' আর 'অপেক্ষা করা' — এই দুটো ঐন্দ্রজালিক শব্দের উদয় হয়েছে তখন সে খাবেই বা না কেন?

ও কত অনুনয়-বিনয়, কত আবদারই না করল — স্তেপানভ্না কিন্তু ওকে ছাড়ল না। (বাড়িতে বসে থাক্ তুই অসুস্থ।) কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার খেয়াল হল যে বিম্ একটা জীবন্ত প্রাণী, বিশেষ প্রয়োজনে ওকেও বাইরে যেতে হয়। একটা তথ্য স্তেপানভ্নার অবশ্যই জানা ছিল না: এমন ঘটনাও ঘটেছে যে তিন দিনেরও বেশি কুকুরকে বাইরে বার না করার ফলে কুকুর নাড়িভুঁড়ি ফেটে কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতার দরুন দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে। এরকম ঘটনা নেহাৎ বিরল নয়।

স্তেপানভ্নাকে জীবনে পথ দেখায় তার গভীর মানবিক করুণা ও মনের উদারতা। স্রেফ এই উপলব্ধি, আর তারই বশবর্তী হয়ে স্তেপানভ্না বিমের গলার কলারের সঙ্গে একটা বেল্ট আটকিয়ে ওকে নিয়ে বেরোল। বিম্ তার পাশে পাশে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল। উঠোনের দূরপ্রান্তে এক কোনায় গিয়ে দাঁড়াল দুজনে: এক প্রৌঢ়া পাকাচুল মহিলা আর খোঁড়া হাড্ডিসার এক কুকুর — এই রকম দেখতে হল দৃশ্যটা।

সদর দরজা দিয়ে তখন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসছিল ছেলের দল, স্কুলে যাবার তাড়া তাদের। কিন্তু ছেলেদের অনেকেই ছুটে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে:

'দিদিমা, ও দিদিমা, বিম্ তিন ঠ্যাঙে কেন?'

কেউবা বলে:

'বিম্, তোর ব্যথা লাগছে বুঝি?'

কিন্তু স্কুলে ছুটতে হয়: স্কুলে যাওয়া — এটা বড় রকমের দায়িত্ব, জীবনের পরম দায়িত্ব — পরিবারের সকলের কাছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধুবান্ধবের কাছে এই দায়িত্ব। এই জন্যই ওরা কালবিলম্ব না করে ছুটল। এই ব্যাপারটি স্তেপানভ্না এবং বিম্ দুজনের পক্ষেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল, যদিও এ সম্পর্কে তখনও তারা কোন ধারণাই করতে পারে নি; কেবল সময় হতে বাড়ি চলে গেল।

সদর দরজার সামনে দেখা হয়ে গেল পাভেল তিতিচের সঙ্গে। স্তেপানভ্নাকে দেখে সে বলল:

'আচ্ছা, এই ব্যাপার! এটা একটা কুকুরের মতো কুকুর, এটার যত্ন নেওয়া উচিত। মালিক যখন দেখাশোনার ভার দিয়েছে তোমার ওপর, তখন তোমাকে একটা উপদেশ দিই — শেকলে বেঁধে রাখ। অবশ্যই বেঁধে রাখবে কিন্তু। নইলে পালিয়ে যাবে। পাহারা দিয়ে ধরে রাখতে পারবে না। দরজা দিয়ে হুট করে বেরিয়ে যাবে — ব্যস্ আর দেখতে হবে না।'

'কিন্তু এমন বুদ্ধিমান কুকুরকে কি শেকলে বেঁধে রাখা ঠিক হবে?' মনে খুব একটা দৃঢ়বিশ্বাস না থাকলেও স্তেপানভ্না আপত্তি তুলে বলল।

'তোমাকেও আবার শিখিয়ে দিতে হবে নাকি? মনে রেখো, প্রভু যদি না থাকে আর শেকল যদি না থাকে, তাহলে কুকুর স্বাধীনতার গন্ধ পায়। ব্যস্, আর দেখতে হবে না।'

'কিন্তু শেকলে বেঁধে রাখলে ও ত ক্ষেপে যাবে।'

'আরে, তুমি ত আচ্ছা অজ্ঞ লোক দেখছি! ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর। খেপুক, কিন্তু বেঁচে ত যাবে। শেকলে বাঁধ, শেকলে বাঁধ — এই হল আমার উপদেশ। ভালো চাই বলেই বলছি — শেকলে বাঁধ!'

হাউসিং এস্টেটের সভাপতিকে না মেনে পারল না স্তেপানভ্না, তাই সে এক রুবল দশ কোপেক দাম দিয়ে একটা শেকল কিনল, এর পর থেকে উঠোনে বার করার সময় সেই শেকল ধরে বিম্‌কে নিয়ে আসত। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কলার থেকে শেকলটা খুলে এক কোনায় ছুঁড়ে ফেলে রেখে দিত। চালাক বটে স্তেপানভ্না দিদিমা — সাপও মরল, অথচ লাঠিও ভাঙল না। প্রসঙ্গত, বিম্‌কে নিয়ে স্তেপানভ্নাকে বেরোতেই হয়েছে মোটে দু'-তিন বার। বিমের নামকে কেন্দ্র করে যে-সমস্ত অসাধারণ ঘটনা ঘটতে থাকে এটাই তার কারণ।

নবম পরিচ্ছেদ

খুদে বন্ধু, মিথ্যা রটনা, বিমের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ এবং লেখকের প্রসঙ্গচ্যুতি

স্কুলে এসে নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করতে গিয়ে ছেলের দল পিরিয়ডের মাঝখানে প্রথম ফাঁক পেয়েই চাওড় করে দিল যে তাদের পাড়ায় একটা কুকুর আছে — কুকুরটা চার ঠ্যাঙে চলত, এখন চলে তিন ঠ্যাঙে; রোগা হাড্ডিসার, কিন্তু রোগা সে ছিল না, এক সময় গায়ের লোম ছিল মোলায়েম, পাট-করা, এখন আলুথালু। ছিল ফুর্তিবাজ, এখন একেবারে মনমরা, ওর নাম হল বিম্; ওর প্রভুকে অপারেশন করার জন্য মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখন ওকে নিয়ে ঘোরেন স্তেপানভ্না দিদিমা।

সংবাদটা একজন শিক্ষাতত্ত্ববিদ মাস্টারমশাইয়ের কানে গেল। পরের দিন শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিত পর্যায়ের আঞ্চলিক সভায় তিনি এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়ে ঘটনাটার ওপর আলোকপাত করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল অনেকটা এই রকম: নবীন প্রজন্মের অপূর্ব বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটছে। 'এই প্রজন্ম উদারতার মন্ত্রে দীক্ষিত — তার মধ্যে আছে মায়া-মমতা, ধরণীর সজীব সব কিছুর প্রতি গভীর মমতা।' কোন এক অজ্ঞাতপরিচয় কালো-কান কুকুরের প্রভু অপারেশনের জন্য বহুদিনের মতো হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলে কুকুরটার প্রতি একটা স্কুলের ছেলেদের যে গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করলেন।

একাদিক্রমে তিন দিন ধরে শহরের ঐ অঞ্চলের সমস্ত স্কুলে মাস্টারমশাইদের মুখে কেবল এক কথা — ছাত্রছাত্রীদের তাঁরা বলেন জীবজন্তুর প্রতি মায়া-মমতার কথা, আর সেই প্রসঙ্গে কোন এক কুকুরের প্রতি অমুক স্কুলের ছেলেমেয়েরা যে কী দরদ দেখায় তার বিবরণ দেন। মাস্টারমশাই বা দিদিমণিদের মধ্যে যাঁরা একটু বেশি সতর্ক তাঁরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে এরকম ক্ষেত্রে দেখতে হবে কুকুর যেন ক্ষ্যাপা না হয় — এ ব্যাপারে অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকতে হবে। তোলিয়া যে স্কুলে পড়ত সেখানকার দিদিমণিও ছেলেমেয়েদের কাছে এই ঘটনাটি বললেন, শুধু তা-ই নয়, রীতিমতো দরদ দিয়ে বললেন।

তিনি বললেন:

'দেখ দেখি ছেলেমেয়েরা, তোমরাই বল! কোন এক নিষ্ঠুর লোক কিনা কুকুরটার পা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে! (এই ভাবে মাস্টারমশাই আর দিদিমণিদের মধ্যেই ঘটনার রূপ খানিকটা পালটে গেছে: গুজব আর কাকে বলে!) যে-লোক এ কাজ করেছে সে সোভিয়েত মানুষ নামের অযোগ্য! বেচারি কালো-কান কুকুরটা কিনা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল!' দিদিমণি তাঁর খাতার যে পাতাটা দরকার সেটা খুঁজে বার করার পর বলে চললেন: 'এবারে ছেলেমেয়েরা, তোমরা শোনো, এখন আমরা একটা রচনা লিখব — ছোট্ট, কিন্তু দরদভরা, বাঁধাধরা বিষয়ের বাইরে — 'আমি জীবজন্তু ভালোবাসি'। লেখাটা স্বচ্ছন্দ হবে বটে, কিন্তু তোমরা যাতে কোন তালগোল পাকিয়ে না ফেল সেজন্য তোমাদের কয়েকটা সংকেতসূত্র দিচ্ছি।'

এই বলে হাতের খাতাটার দিকে তাকাতে তাকাতে তিনি খড়ি দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখলেন:

১। তোমার কুকুরের নাম কী?

২। কুকুরটা সাদা না কালো, নাকি অন্য কোন রঙের?

৩। ওর কান খাড়া না ঝোলা?

৪। লেজ আছে নাকি লেজ-কাটা?

৫। কোন্ জাতের, যদি সেটা বাড়িতে জানা থাকে?

৬। মিষ্টি স্বভাবের, নাকি রাগী?

৭। তুমি কি ওর সঙ্গে খেল, যদি খেল ত কী ভাবে?

৮। কামড়ায় কি? যদি কামড়ায় ত কাকে?

৯। তোমার মা বাবা ওকে ভালোবাসেন কি?

১০। কুকুর তুমি কেন ভালোবাস?

১১। অন্যান্য প্রাণীদের (মুরগী, হাঁস, ভেড়া, হরিণ, ইঁদুর ইত্যাদি) তুমি কী চোখে দেখ?

১২। তুমি কখনও এল্‌ক হরিণ দেখেছ কি?

১৩। লোকে গোরু কেন দোয়ায়, কিন্তু এল্‌ক-হরিণ দোয়ায় না (গৃহপালিত প্রাণী ও বন্য প্রাণী)?

১৪। জীবজন্তু ভালোবাসা উচিত কিনা?

তোলিয়া বসে বসে উসখুস করছিল, ও একটা ছত্রও লিখতে পারছিল না। শেষকালে আর ধৈর্যধারণ করতে না পেরে ক্লাসের নিস্তব্ধতা ভেঙে দুম করে প্রশ্ন করে বসল:

৪*

'আচ্ছা, আন্না পাভ্‌লভনা কালো-কান কুকুরটার নাম কি?'

দিদিমণি তাঁর খসড়া খাতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিলেন: 'বিম্‌।'

'বিম!' তোলিয়া চিৎকার করে বলল। ওর চিৎকারে গোটা ক্লাস চমকে উঠল, ক্লাসের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। 'আমাকে ছেড়ে দিন আন্না পাভ্‌লভনা! আপনার পায়ে পড়ি! আমি বিম্‌কে খুঁজতে যাব, আমি ওকে জানি। ও বড় ভালো কুকুর। দোহাই আপনার!' করুণস্বরে ও মিনতি জানাল, দেখে মনে হল কৃতজ্ঞতাবশত আন্না পাভ্‌লভনার হাতে চুমো খেতে প্রস্তুত।

'তোলিয়া!' আন্না পাভ্‌লভনা কঠিন স্বরে ওকে বললেন। 'তুমি অন্যদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ। মনে মনে ভাব, রচনাটা লেখ।'

তোলিয়া বসে পড়ল। খাতার সাদা পাতার দিকে তাকাতে ও বিম্‌কে দেখতে পেল। দেখে মনে হচ্ছিল অন্যদের সঙ্গে সেও বুঝি একাগ্রচিত্তে স্বচ্ছন্দ রচনার বিষয়ে ভাবছিল, কিন্তু ও লিখল শুধু রচনার শিরনামা: 'আমি জীবজন্তু ভালোবাসি'। ঘণ্টা পড়তে যখন অল্প সময় বাকি কেবল তখনই ও ঝটপট প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখতে শুরু করল। এমন কি ঘণ্টা পড়ার পরও তাকে কিছুক্ষণ থেকে যেতে হল। এরকম ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয় এবারেও আন্না পাভ্‌লভনা টেবিলের ধারে বসে বসে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে তোলিয়া মুখ কালো করে আন্না পাভ্‌লভনার সামনে তার রচনাটা রাখল। কী কারণে যে সে অপ্রসন্ন বোঝা গেল না।

তোলিয়া ওর কাজটা দিয়েছিল সবার শেষে, তাই বরাবরের মতো এবারেও আন্না পাভ্‌লভনা ওটা পড়লেন একেবারে প্রথমে (সবগুলোর ওপরে ছিল বলে)।

স্বচ্ছন্দ রচনার ওপর যে-সমস্ত প্রশ্ন ছিল তোলিয়া তাদের সবগুলোর সঠিক উত্তর ত দিয়েইছে, এমন কি তার চেয়েও বেশি কিছু লিখেছে। তার রচনায় কাব্যচর্চার পরিচয় পর্যন্ত ছিল, যদিও সেটা ছিল যে-কোন বাচ্চা ছেলেরই পরিচিত এক জনপ্রিয় গানের স্পষ্ট ভাব-চুরি। মোটের ওপর রচনাটা দেখতে হল এই রকম:

'আমি জীবজন্তু ভালোবাসি'

নাম তার বিম্। রঙ সাদা, কান কালো। দুটো কান ঝোলা। সত্যিকারের লেজ বলতে যা বোঝায় তার লেজ সেই রকম। শিকারী জাতের কুকুর, পাহারাদার কুকুর নয়। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। একবার ওর সঙ্গে খেলেছিলাম, কিন্তু কোথাকার কে এক খিটখিটে লোক এসে ওকে নিয়ে চলে গেল। বুড়োটা যে কত বিচ্ছিরি, কত বাজে তা বলে বোঝানো যায় না। ও কামড়ায় না। আমার মা-বাবা ওকে ভালো নাও বাসতে পারে, ও অন্যের কুকুর, ওর গলায় হলুদ রঙের ফলক ঝোলানো। কেন ভালোবাসি জানি না — অমনি, কোন কারণ ছাড়াই। কুকুর, হাঁস, ভেড়া, হরিণ, ইঁদুর — এদের ভালোবাসি, তবে ইঁদুরকে ডরাই। এল্‌ক-হরিণ এখনও দেখি নি, ওরা শহরে থাকে না। গোরু দোয়ানো হয় এইজন্য যাতে দোকানে দুধ পাওয়া যায়, পরিকল্পনা পূরণ হয় ('আরে, এর যে দেখছি মাথায় ছিট আছে!' আন্না পাভ্‌লভনা ভাবলেন)। লোকে এল্‌ক-হরিণ দোয়ায় না, কেননা দোকানে এল্‌ক-হরিণের দুধ বিক্রি হয় না, কারও দরকার নেই ওতে। জীবজন্তুদের ভালোবাসা উচিত, আর কুকুর হল গিয়ে মানুষের সেরা বন্ধু। আমি এখন একটা গান বেঁধেছি:

এল্‌ক-হরিণ ভালো,
এমনি হরিণ ভালো,
ইঁদুর — সেও ভালো
কিন্তু কুকুর সবার চেয়ে ভালো।

আমি গিনিপিগও পুষেছিলাম, কিন্তু মা বললেন ওরা ফ্ল্যাটবাড়িতে বড় গন্ধ ছড়ায়, নাক টিপে থাকতে হয়, তাই দিয়ে দিলেন একটা অচেনা-অজানা মেয়েকে। তবে যাই বলুন না কেন, বিম্‌কে আমি ঠিক খুঁজে বার করব, আপনি না ছাড়লে কী হবে। বার করবই, বলেছি যখন বার করব, বার করে ছাড়ব। তা আপনি আন্না পাভ্‌লভনা বাধা দিন আর যাই করুন।

আন্না পাভ্‌লভনার চোখ কপালে উঠল। মনে মনে বললেন: 'আরে, ও যে রচনার গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে! ও কী ভাবে কে জানে! ভেতরে ভেতরে দেখছি একটা... একটা আস্ত...' শেষের কথাগুলো তিনি আর শেষ পর্যন্ত ভাবতে পারলেন না — হাজার হোক একজন শিক্ষাব্রতিনী ত বটেন, তাই নিছক কর্তব্যজ্ঞানে খাতায় খারাপ নম্বর বসিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াল একবার ভেবে দেখা দরকার। আন্না পাভ্‌লভনাকে সবাই ভালো চোখে দেখে, ছেলেমেয়েরা ওঁকে ভালোবাসে, ওঁর কথা শোনে বলেও মনে হয় — অবশ্য কয়েক জন বাদে — তবে সে রকম এক-আধজন সব ক্লাসেই থাকে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। শিক্ষা জিনিসটি জটিল, অতি জটিল, একথা আমি না বলে পারছি না, সম্ভবত ঠিক এই কারণেই তোলিয়ার প্রথম রচনাগুলোর একটা এই রকম রূপ নিয়েছে: যে অবর্ণনীয় আঘাত তার মনে লেগেছে স্রেফ তা থেকে, আর বলাই বাহুল্য, এটা সে সজ্ঞানে করে নি, যদি আমরা মনে রাখি যে গিনিপিগ বা আন্না পাভ্‌লভনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হয়ত বয়সকালে ও নিজের ছেলেবেলার ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু আপাতত তা হৃদয়ঙ্গম করার মতো অবস্থা ওর নেই। পরের পিরিয়ডে ওকে ক্লাসে পর্যন্ত দেখা গেল না। কিন্তু সে আরেক কাহিনী — অসাধারণ ঘটনা।

তোলিয়ারা যেখানে থাকে, সেই নতুন এলাকা থেকে তোলিয়া গেল এক পুরনো এলাকায়, যেখানে আছে সেই অমুক স্কুলটি। স্কুলের ছেলেরা কখন বিম্‌কে দেখেছে, বিম্ কোথায় থাকে — এরকম এটা ওটা নানা প্রশ্ন করে ওদের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা ও জানার চেষ্টা করল। তোলিয়া এটাও জানতে পারল এবং জেনে খুশি হল যে বিমের পা মোটেই ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় নি, কেবল ঝুলে আছে — এই যা। ছেলেদের সঙ্গে ও চলল বিম্ যেখানে থাকে সেই বাড়িতে।

তোলিয়া কলিং বেল্‌-এর বোতাম টিপল। জবাবে ভেতর থেকে বিম্ প্রশ্ন করল: 'ঘেউ! (কে এখানে?)'

'আমি, তোলিয়া!' আগন্তুক চেঁচিয়ে বলল। তারপর শুনতে পেল দরজার ফাঁকে নাক ঠেকিয়ে বিম্ ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে আর জোরে জোরে হাওয়া টানছে। সে আবার বলল, 'বিম্ আমি, আমি — তোলিয়া।'

বিম্ চেঁচাল, ডাক ছাড়ল। চেঁচিয়ে ও যেন বলল: 'কেমন আছ তোলিয়া?'

ছেলেটাও ওকে বুঝতে পারল, এই প্রথম বুঝতে পারল কুকুরের মুখের ভাষা।

কুকুরের ডাক এবং কুকুরের সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে স্তেপানভ্‌না বেরিয়ে এলো।

'কী চাই খোকা?'

'আমি বিমের কাছে এসেছি।'

বোঝানোর জন্য কোন কষ্ট করতে হল না — সব পরিষ্কার। দরজা খুলে ওরা দুজনে ঘরে ঢুকল।

বিম্‌কে দেখে তোলিয়া চিনতে পারল না: শরীর শুকিয়ে গেছে, পেটের চামড়া পিঠে এসে ঠেকেছে, গায়ের লোম এলোমেলো, বাঁকা চলন, পাঁজরের হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে — না, এ বিম্‌ নয়। কিন্তু চোখজোড়া সেই — বুদ্ধিদীপ্ত স্নিগ্ধ, বলছে 'আমি, আমি — বিম।' তোলিয়া উটকো হয়ে বসল, বিম্‌কে ইচ্ছেমতো নড়াচড়ার সুযোগ দিল। বিম্‌ তোলিয়াকে ভালোমতো শুঁকে দেখল, তার কোর্তা, থুতনি ও হাত চাটল, শেষকালে যেন শান্ত হয়ে তোলিয়ার জুতোজোড়ার ডগার ওপর মুখ রাখল। মনে হল ও যেন সান্ত্বনা পেয়েছে।

তোলিয়া একটা অচেনা ছেলে হলেও স্তেপানভ্‌না ওকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলল, বিম্‌ আর ইভান ইভানভিচ সম্পর্কে যা যা তার জানা ছিল সবই বলল; কিন্তু কে কোথায় ওর পায়ের থাবা থেঁতলে দিল এটা সে বলতে পারল না।

এই প্রসঙ্গে সে শুধু বলল:

'ভাগ্য। কুকুর মাত্রেই যে যার ভাগ্য নিয়ে চলে।'

ছেলেটার সঙ্গে সে কথা বলল শান্তকণ্ঠে, যদিও তার কথাবার্তার মধ্যে মনের জ্বালাযন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে নিজের বয়স বেশি বলে কোন দেমাক বা জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তার কোন আত্মসচেতনতা কথাবার্তার মধ্যে ধরা পড়ল না। তোলিয়ার সঙ্গে কথা হল যেন সমানে সমানে।

সেই লেখা ফলকটা গেল কোথায়?' তোলিয়া জিজ্ঞেস করল। 'একটা ফলক ছিল যে ওর গলায়। আমি পড়েছি।'

'ছিল। তোর নাম কী বললি না ত?'

'তোলিয়া? — বেশ, বেশ। ...হ্যাঁ, ছিল। দেখা যাচ্ছে কেউ খুলে নিয়েছে আর কি।'

তোলিয়ার চট করে মনে হল: 'এ সেই লোকটার কাজ—ছাইরঙার... ছাইরঙাই ওটা খুলে নিয়েছে।' কিন্তু কথাগুলো সে মুখে উচ্চারণ করল না, কেননা এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নয়।

বিমের দিকে দৃষ্টিপাত করে স্তেপানভ্‌না বলল:

'হা ভগবান, ওকে নিয়ে যে আমি কী করি! দেখলে কষ্টও হয়, কিন্তু কী করা যায় — জানি না। ওকে ভিট্‌নার-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'ভেটেনারি,' তোলিয়া কথাটা শুধরে দিল, তবে তার বলার মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার কোন উপলব্ধি প্রকাশ পেল না। 'কী করা যায়' প্রশ্নের উত্তরে সে বলল:

'আমি রোজ স্কুলের পরে আসব, ওকে নিয়ে বাইরে ঘুরব। ঘুরতে পারি ত?'

এই ভাবে বিমের এক নতুন খুদে বন্ধু জুটল। সে রোজ দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর গোটা শহর পেরিয়ে বিমের কাছে আসে, ওকে নিয়ে বাড়ির উঠোনে, রাস্তায়, পার্কে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেরা সকলে মজা পায় যখন সে জাঁক করে বলে:

'কুকুর হল মানুষের সেরা বন্ধু।'

তোলিয়া রাগ করে যে রচনাটা লিখেছিল সেখানেও এই কথাগুলো ছিল, কিন্তু এখানে তার অর্থ সম্পূর্ণ অন্য রকম।

কিন্তু তোলিয়া মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল ঐ ছাইরঙা লোকটাকে খুঁজে বার করতেই হবে, তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। তোলিয়া ওদের নিজেদের সেই নতুন এলাকায় লোকটাকে ধরার জন্য তক্কে তক্কে থাকল। শেষকালে একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

তোলিয়া ওর মাথার টুপির কানাতটা সামান্য ওপরে তুলে হাতদুটো পিছনে জড় করে জিজ্ঞেস করল:

'এই যে শুনছেন, বিমের গলায় ঝোলানো ফলকটা আপনি খুলতে গেলেন কেন?'

'কী সব আজেবাজে বকছ খোকা? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?' প্রশ্নের উত্তরে লোকটাও প্রশ্ন করল।

'আপনিই ত ওকে নিয়ে গেলেন — ওর গলায় তখন ফলক ঝুলছিল। আমি একা দেখেছি এমন নয়।'

'যখন ছেড়ে দিই তখনও ফলক ছিল। ও যে আমাকে কামড়েছিল! নেকড়ের মতো যদি কামড়ায় তাহলে না ছেড়ে দিয়ে উপায় আছে!'

'আপনি কিন্তু মিথ্যে কথা বলছেন। বিম্ মিষ্টি স্বভাবের কুকুর।'

'আমি? আমি মিথ্যে কথা বলছি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

...কোথায় তোর মা-বাবা? তোর মা-বাবা কোথায়? বল্!' লোকটা আঠার মতো লেগে রইল।

ছাইরঙার কথাটা অবশ্য অংশত সত্যি। হ্যাঁ, অংশতই — বিম্ যে ওকে কামড়েছিল এটা সত্যি — এদিক থেকে মিথ্যে সে বলে নি, রাগে জ্বলে ওঠার সম্পূর্ণ অধিকারও তার ছিল। কিন্তু সে যে কলার থেকে ফলকটা খুলে নেয় নি এই কথাটা মিথ্যে। যে ঘটনাটা ঘটেছিল ফলক খুলে নেওয়াকে তার মুখ্য কারণ হিশেবে গণ্য না করে সে গণ্য করেছিল বিমের কামড়। আর কারণ ও পরিণামের স্থান বদল সর্বদাই সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখানোর একটা পরম সুবিধাজনক উপায়। লোকটার নিজের এ ব্যাপারে গভীর প্রত্যয় ছিল যে সে সত্যি কথা বলছে, কিন্তু সে যে পুরো সত্যি বলছে না — এ নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়। তাছাড়া কেই বা জানে কোথায় কারণ, কোথায়ই বা পরিণাম — কুকুর প্রথমে কামড়ায়, না ফলক প্রথমে খোলা হয়েছিল? এটা অমনিতেই গোপন থেকে যাবে সবার কাছ থেকে। কিন্তু তোলিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস বিম্ ছাইরঙাকে কামড়াতে পারে না, কেননা ছাইরঙা কোন খরগোস নয়, খেঁকশিয়ালীও নয় — সে মানুষ। তাই তোলিয়া আবার বলল:

'আপনি কিন্তু আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন। আপনার লজ্জা করে না?'

'র-র্-র!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। তারপর শরীরের পেছন দিকটা একপাশে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে (দেখে মনে হল বিম্ তার ওপর বেশ এক চোট নিয়েছে) ওখান থেকে চলে গেল।

আশ্চর্য এই যে যখন একজন আধাসত্য বলে আর অন্যজন সত্যের অপরার্ধ জানে না, তখন উভয়পক্ষকেই ঠিক মনে হয়।

ছাইরঙা যেতে যেতে ভাবতে লাগল: 'ঐ সব শিকনিঝড়া ছেলেপুলেদের নিয়ে দঙ্গল বেঁধে থানায় যাবে, রিপোর্ট করবে, তারপর এসে আমার সংগ্রহটি দেখতে পাবে, তাহলেই হয়েছে... না, ওটা দিয়ে আমার সংগ্রহের জুবিলী পূর্ণ হল, পাঁচ শ' পূর্ণ হল; দেব না, কিছুতেই দেব না। ওটার জন্য যে-কোন ধরনের বিশটি ব্যাজ দিয়ে দেওয়া যায়।' তাই সে মনে মনে ঠিক করল: 'আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় — আক্রমণ।'

বাড়িতে এসে সে একটা আবেদন লিখে ফেলল, তারপর সেটা নিয়ে গেল পশুচিকিৎসাকেন্দ্রে। আবেদনে লেখা ছিল:

'...একটা কুকুর (বংশপরিচয়হীন 'সেটার', একটা কান কালো) রাস্তা দিয়ে

ছুটতে ছুটতে এসে আচমকা আমাকে কামড় দেয়, আমার শরীরের বিশেষ জায়গা থেকে একখন্ড মাংস খাবলে নিয়ে পালিয়ে যায়। ...লেজ এবং মাথা দুইই নীচু করে মাটির দিকে নামিয়ে ওটা পাগলা কুকুরের মতো ছুটতে থাকে। দু' চোখে রক্তের উচ্ছ্বাস। ...ওটাকে ধরে মেরে ফেলার জন্য ছাড়া-কুকুর ধরার দলকে হুকুম দেওয়া হোক, নয়ত আমি আপনাদের আমলতান্ত্রিক মনোভাব ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য ওপরওয়ালার কাছে অভিযোগ করব...' ইত্যাদি।

পশুরোগের ডাক্তার আবেদনটা পড়েই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন:

'কোন্ জায়গায় কামড়েছে? কবে? কোথায়? কোন্ পরিস্থিতিতে?'

ছাইরঙা নিখুঁত গল্পকারের মতো মিথ্যা বানিয়ে বলল, তবে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কল্পনার আশ্রয় তাকে নিতে হল না। কুকুরদষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব বিবরণ থেকে ডাক্তারের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না — সবচেয়ে বড় কথা হল লোকটাকে একটা ছাড়া-কুকুর রাস্তায় কামড়েছে! ডাক্তার টেলিফোনের রিসিভার তুলে পাস্তুর কেন্দ্রের ডিউটিরত ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন।

শিগগিরই, আক্ষরিক অর্থে কয়েক মিনিট বাদেই, গাড়ি করে এসে হাজির হলেন এক মহিলা ডাক্তার। ছাইরঙার প্যান্ট টেনে নামিয়ে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'কত দিন হল?'

'দিন দশেক,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হল রোগীকে।

'চার দিন পরেই জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হবেন,' ডাক্তার স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন। কিন্তু রোগী এরকম রায়দানে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না দেখে ডাক্তারের কীরকম যেন সন্দেহের উদ্রেক হল বলেই বোধহয় তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

'কয় মাস চান করেন নি?'

'কামড়ানোর তিন সপ্তাহ আগের শনিবার থেকে। ভয় হচ্ছিল পাছে নোংরা লাগে, গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়। জায়গাটা সেদিক থেকে সিরিয়স ধরনের কিনা।'

এবারে পশুরোগের ডাক্তার ওদের কথার মাঝখানে বললেন:

'জায়গাটা আপনার সত্যি সত্যিই সিরিয়স ধরনের। টেলিভিশনের মতন।' (সুশ্রী চেহারার এই পশুরোগ ডাক্তারটি ছিলেন মজার লোক)।

মহিলা ডাক্তার আরও একবার ক্ষতস্থান ভালো করে দেখে নিয়ে আঁতকে উঠে বললেন:

'কী কান্ড করেছেন আপনি! মেডিক্যাল সেণ্টারে, মেডিক্যাল সেণ্টারে,

মেডিক্যাল সেণ্টারে! এক্ষ্ুনি ইঞ্জেকশন দিতে হবে... জলাতঙ্ক রোগের... পেটে... ছয় মাস চলবে।'

ছাইরঙা গর্জে উঠল:

'এসব কী বলছেন? আপনারা ক্ষেপে গেলেন নাকি!'

তার কথায় বাধা দিয়ে পশ্ুরোগের ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বললেন:

'মোটেই ক্ষেপি নি আমরা। ভালোয় ভালোয় যদি না শোনেন ত জোর খাটাব আমরা, মিলিশিয়ার সাহায্য নেব, বাড়িতে গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে, নেহাৎই যদি এমন অজ্ঞ-অশিক্ষিত লোক হন আপনি।'

'আমি? আমাকে অজ্ঞ-অশিক্ষিত বলছেন!' ছাইরঙা চেঁচিয়ে বলল। 'আপনারা জানেন এক কালে আমি কোথায় কাজ করতাম?'

'ও নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের কাজ নয়,' ডাক্তার জবাব দিলেন। 'মেডিক্যাল সেণ্টারে!' এবারে আগের চেয়েও কড়া গলায় তিনি যোগ করলেন।

এখন ইনফরমারকে কিনা নিয়মিতভাবে বিশেষ বিশেষ দিনে বাঁধা সময়ে ইঞ্জেকশন নেবার জন্য মেডিক্যাল সেণ্টারে যেতে হবে! গতিক তেমন স্ুবিধের নয়। নিজেই কিনা নিজের বিপদ ডেকে আনল: পাছায় কুত্তার কামড়, পেটে ডাক্তারদের খোঁচা।

এর পর যা ঘটল সেটা এই রকম:

সেই যে সেই বয়স্থা স্ত্রীলোকটি — তার সঙ্গে এই ছাইরঙা যে কী ভাবে মিলল আমাদের জানা নেই, কিন্তু যে ভাবেই হোক, মিলল। এমনও হতে পারে যে ওরা বহ্ুকাল হল পরস্পরকে চেনে (সম্ভবত তা-ই হবে), কিন্তু ঐ দিন রাস্তায় ওদের দ্ুজনের মধ্যে দেখা হয়ে গেল। রতন যেমন রতনকে চেনে, মাতাল যেমন চেনে শ্ুঁড়িকে, তেমনি নিন্দ্ুকেও নিন্দ্ুককে ঠিক চিনতে পারে। দেখা হতেই কথাবার্তা। কথায় কথায় জানা গেল একটা কালো-কান কুকুর ছাইরঙাকে কামড়ায়, তারই ফলে তাকে এখন কোমর বাঁকিয়ে চলতে হচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি ঘোঁৎ করে বলে উঠল:

'আরে, ওটাকে যে আমি জানি! ভগবানের দিব্যি, জানি! আমাকেও কামড়েছিল।'

ছাইরঙা কিন্তু ব্ুঝতে পারল যে কথাটা মিথ্যে, তা সত্ত্বেও সে বলল:

'আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা পিটিশন লিখে জানিয়েছি ওটাকে যেন ধরে মেরে ফেলা হয়। বিবেক আমাকে এই রকমই নির্দেশ দিচ্ছে।'

'ঠিক নির্দেশই দিচ্ছে!' সোৎসাহে সমর্থন জানিয়ে বয়স্থা স্ত্রীলোকটি বলল।

'আপনিও লিখুন না কেন... অবশ্য আপনি যদি সৎলোক হয়ে থাকেন।'

'আমি? আমি পেছপা হচ্ছি না!'

সেই দিনই বয়স্থা স্ত্রীলোকটি আবেদন লিখে নিয়ে গেল ঐ পশুচিকিৎসাকেন্দ্রেই। ছাইরঙা কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল থেকে কামনা করল (মনে মনে ভাবল): 'মিছে কথা যখন বলেইছ তখন ঠেলা সামলাওগে এখন — সুঁই ফোটাক এখন ডাক্তাররা তোমার পেটে।' লোকে যখন ওকে মিথ্যে বলত সেটা ওর মনঃপুত হত না, আর সেজন্য তার গর্বও ছিল। যাই হোক বয়স্থা স্ত্রীলোকটিও নিজের বিপদ ডেকে আনল: চিৎকার-চেঁচামেচি, গালাগাল, প্রয়োজন বোধে মিথ্যা কথা, বিশেষত মিথ্যে করে এই কথা বলল যে চোটটা ছিল ছোটখাটো, ঘা ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। এই বলে আঙুল দিয়ে হাতের ওপরকার একটা পুরনো কাটা দাগ দেখিয়ে দিল। তার ওপর এই বলে চিৎকারও করল যে সে একজন সৎ সোভিয়েত নারী হিশেবে ভালোর জন্য লিখতে গেল, আর এর জন্য তাকে কিনা পেটে সুঁই চালিয়ে শাস্তিবিধান!

অদ্ভুত বটে, কিন্তু কেন জানি না ওরা তাকে কেবল বাড়ির ঠিকানা লিখে রেখে ছেড়ে দিল, বলল ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার জন্য আগামীকাল ওরা ওর বাড়িতে যাবে।

সে যাই হোক না কেন, বিমের প্রতি একটা নিদারুণ ঘৃণায়, বিদ্বেষে এই বয়স্থা স্ত্রীলোকটির গা রি-রি করতে লাগল, ছাইরঙা সম্পর্কেও অনেকটা তাই — তবে তুলনায় খানিকটা কম, যদিও লোকটার জন্য তাকে কম নাকানি-চুবানি খেতে হয় নি।

এরকম দু' দুটো আবেদনের ফলে দুদিন পরে জেলার সংবাদপত্রে এই মর্মে একটা ঘোষণা প্রকাশিত হল:

'কালো-কান, বংশপরিচয়হীন কোন এক 'সেটার' কুকুর যে পথচারীদের দংশন করে এমন অনুমান করার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। উক্ত কুকুরের অবস্থানস্থল সম্পর্কে যদি কেউ অবহিত থাকেন, অথবা উক্ত কুকুর যদি কাউকে দংশন করে থাকে তবে সেই ব্যক্তিকে অনুরোধ করা যাচ্ছে উক্ত প্রাণীটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যাপারে এবং সম্ভাব্য পরিণতি

দূরীকরণে সহায়তার জন্য যেন ...ঠিকানায় জানান। নাগরিকবৃন্দ! নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করুন, অপরের স্বাস্থ্য রক্ষা করুন। মুখ বুজে থাকবেন না' ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর ঠিক পর পরই, কয়েক দিন ধরে কাগজের অফিসে পাঠকদের কাছ থেকে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল। একটা চিঠিতে জানানো হয়:

'...(বর্তমান বছরের অমুক মাসের অমুক তারিখে)... স্টেশনের দিকে একটা কুকুরকে (বংশপরিচয়হীন 'সেটার', কান কালো) ছুটতে দেখা গেছে। কুকুরটা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সোজা পথে ছুটছিল। সুস্থসবল মনোভাবের কোন কুকুর এই ভাবে কোন চত্বরের ওপর দিয়ে সোজাসুজি কিংবা তেরছাভাবে ছোটে না — সচরাচর সে তার যাত্রাপথের সামনে উপস্থিত বাধা কিংবা অন্যান্য বস্তুর পাশ কাটিয়ে যায়। এই কুকুরটা চলছিল লেজ গুটিয়ে আর মুখ তার সত্যি সত্যি ছিল নীচে নামানো। উপরি-উক্ত কুকুরটি (বংশপরিচয়হীন 'সেটার', কান কালো) রীতিমতো বিপজ্জনক, সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোন নাগরিককে, এমন কি বিদেশী পর্যটককেও দংশন করতে পারে; তাই আপনাদের মর্যাদাসম্পন্ন কাগজের ঘোষণাটিতে গবেষণাকর্মের যে উল্লেখ আছে, আমাদের মতে, সেরকম কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কুকুরটাকে ধরে মেরে ফেলাই উচিত।'

পিটিশনটার নীচে বারোটা সই।

এছাড়া আরও চিঠি ছিল (সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়)। এই যেমন: '... হুবহু এই রকমই একটা কুকুর, তবে তার কানটা কালো নয় — সেটাও ছুটছিল সোজা পথে...' কিংবা: 'শহর কুকুরে ঠাসা, সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টা পাগলা, কোন মতেই বোঝা সম্ভব নয়।' অথবা এই মর্মে: 'ঐ কুকুরটা মোটেই পাগলা ছিল না, আপনারা, ভিটিনাররাই পাগল।' অথবা: 'জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি যদি বছরে পরিকল্পিত উপায়ে নির্দিষ্টসংখ্যক কুকুরনিধনের চালাও কর্ম সংগঠন করে তুলতে না পারেন, তাহলে সম্পাদক মহাশয় আপনিই বলুন কোথায় আমরা চলেছি? কোথায় আমাদের পরিকল্পনা? কোথায় গঠনমূলক সমালোচনা? আপনারা তাতে কর্ণপাতই বা করেন না কেন? রুটি আমরা সেঁকতে পারি, কিন্তু মেহনতী নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষা — এটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। আমি একজন সৎলোক, তাই সামনাসামনি সত্য বলতে আমার কখনও বাধে না। কাউকে আমি ভয়ও পাই না। যে কথাগুলো আমি বললাম, একবার ভেবে

দেখুন। আমার এখন আর তেমন শক্তি নেই যে ধৈর্য ধরে থাকি: লিখে লিখে হদ্দ হয়ে গেলাম, পরিণামে লবডঙ্কা।'

মোটকথা চিঠির সংখ্যা এত বেশি ছিল যে রীতিমতো তর্কবিতর্কের সূচনা হল, আর তারই ফলে লেখা হল 'ফ্ল্যাটবাড়িতে টম' শিরনামায় একটি সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়তে টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের জনৈক রীডার-এর চিঠি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ছিল। রীডার ভদ্রলোকটি নিঃসন্দেহে কুকুরবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি কেন যে কুকুরবিদ্বেষী, বলা কঠিন, তবে শিশু ও কিশোর সম্প্রদায়ের পক্ষে তাঁর মন্তব্যের শিক্ষামূলক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম: শিশু ও কিশোর সম্প্রদায় তাঁর মন্তব্যগুলো সঠিক অনুধাবন করতে পারলে মেহনতীদের স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে অতি অল্প বয়স থেকে কুকুরদের গলা টিপে মারতে শুরু করবে; আর যারা বাড়িতে কুকুর পোষে তাদের উদ্দেশে রাস্তায় সমবেতভাবে, সমস্বরে 'নিষ্কর্মা!' (রীডার ভদ্রলোকটি কুকুরপ্রেমীদের এই আখ্যা দেন), 'নোংরা!' (এটাও ঐ রীডারেরই দেওয়া আখ্যা) — এই সব আওয়াজ তুলবে।

আমরা আগেই বলেছি, সমস্ত চিঠি গুনে শেষ করা সম্ভব নয়; তবে শেষের একটা চিঠির উল্লেখ না করে পারা যায় না। চিঠিটা ছিল দু' ছত্রের। পাঠক কেবল প্রশ্ন করেছেন: 'আর দুটো কান যদি কালো হয়, তাহলে কি মারতে হবে?' এই পাঠকটি বাস্তববাদী — দুনিয়ার কোন কিছুকে অ্যাবস্ট্রাক্ট অর্থে গ্রহণ করতে তিনি একেবারেই রাজী নন। তবু, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ত নয়ই, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তাঁর চিঠির আদৌ কোন স্থান হল না — এমন কি কোন উত্তর পর্যন্ত মিলল না। বোঝ কাণ্ড! একজন লোক সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো, আর তার প্রশ্নের প্রতি কিনা এমন অশ্রদ্ধা!

আছে, সাড়া দেওয়ার মতো পাঠক আছে, ভগবানের কৃপায় এখনও শেষ হয়ে যায় নি। এ ধরনের পাঠক নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার এবং কোন কিছুকে বিশেষ কোন নামে চিহ্নিত করার সুযোগ ছাড়বে না। আমাদের এই ঘটনার ক্ষেত্রেও তা-ই দেখা গেল: শহরময় বিমের খোঁজ শুরু হয়ে গেল, একটা ভালো কুকুরের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটে গেল। কেন? কী কারণে? আচ্ছা, না হয় ও কামড়েইছে, মেনে নিলাম — এটা সত্যি। কিন্তু পরিস্থিতি? যে-পরিস্থিতিতে ও কামড়েছে বলা হচ্ছে এবং পাগলা কুকুর বলে ওর নামে যে অভিযোগ আনা হয়েছে — এটা ডাহা মিথ্যে। যত্নশীল

পাঠক এ সমস্ত একসঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেলেছেন, অবশ্য তাঁর নিজের দোষে নয়: এর মধ্যে যে মিথ্যা রটনা কিছু থাকতে পারে সে সন্দেহ তাঁর মনে উদয় হয় নি। আর মিথ্যার দৌড় বেশি দূর না হলেও লোকের মনে ধরার মতো শক্তি কিন্তু তার আছে।

কিন্তু যথাসময়ে সম্পাদকমশাইয়ের টনক নড়ল, তিনি লক্ষ করলেন যে এই বাদ-প্রতিবাদ স্বতঃস্ফূর্ত, সম্ভবত কুকুরদষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উদ্রিক্ত, মোটেই সংগঠিত নয়, আপন ধারায় চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা বুদ্ধিমানের কাজ করলেন — ননপারেইল টাইপে (যে হরফ স্থিতধী পাঠকের নজর কখনই এড়াতে পারে না) কাগজে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপলেন: 'শামলা কানের কুকুরটা ধরা পড়েছে। এই বিষয়ের ওপর সম্পাদকমণ্ডলী আর কোন বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশ করছেন না। পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না।'

সম্পাদকমশাই রসিক লোক ছিলেন; 'সংগ্রামী পাঠকের' পক্ষে অবশ্য এই রসিকতা অসহ্য।

কিন্তু সম্পাদকের কথাটা সত্যি নয় — বিম্‌কে কেউ ধরে নি। দৈবক্রমে তোলিয়া স্কুলে বিজ্ঞপ্তিটার কথা জানতে পারে; জানতে পেরে সন্ধ্যার আগে আগে পশুরোগ চিকিৎসকের ফ্ল্যাট খুঁজে বার করল, দরজার কলিং বেল টিপল। দরজা খোলা হতে তোলিয়া বলল:

'আমি এসেছি শামলা কানের হয়ে, বিমের হয়ে কথা বলতে।'

অনতিবিলম্বে গোটা ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হল। পরদিন তোলিয়া বিমের কাছে গেল, তিন-ঠ্যাঙে বিম্‌কে নিয়ে এলো পশুচিকিৎসাকেন্দ্রের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার পরীক্ষা করলেন।

'যত রাজ্যের আজেবাজে আলোচনা! কুকুর মোটেই পাগলা নয়, অসুস্থ। ওকে মারধর করা হয়েছে, জখম হয়েছে ও। এঃ কী সব লোকজন!' এই বলে কেন কে জানে ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এছাড়া, ক্ষতবিক্ষত থাবাটা তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, কান পেতে শরীরের ভেতরের অবস্থাটাও খুঁটিয়ে দেখলেন, পায়ের জন্য মালিশের প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, শরীর ভালো হওয়ার জন্য মিক্‌শ্চার দিলেন, তারপর দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসে বাচ্চা ছেলে আর কুকুর — দুই বন্ধুকে বিদায় জানানোর সময় জিজ্ঞেস করলেন:

'ওহে বীরপুরুষ, তোমার নামটা কী বললে না ত!'

'তোলিয়া।'

'তুমি বড় ভালো লোক তোলিয়া। সাবাস! এই ত চাই!'

যাবার সময় বিম্‌ও কৃতজ্ঞতা জানাল ডাক্তারকে। ডাক্তারের গা থেকে ওষুধের গন্ধ বেরোচ্ছিল, কিন্তু উনি মোটেই অসুস্থ লোক নন, বরং তার উলটো — এক দীর্ঘকায়, পরম সাহসী মানুষ, প্রসন্ন তাঁর চোখদুটি।

বিম্‌ লেজ নাড়িয়ে, চোখের দৃষ্টিতে জানাতে চাইল 'ভালো লোক — বড় ভালো লোক আপনি!'

* * *

হে পাঠক বন্ধু! না, সেই পাঠকের প্রতি আমার এই নিবেদন নয়, যার ধারণা তার কুৎসামূলক চিঠি ব্যতিরেকে কুকুরের দল দেশের সমস্ত নারীপুরুষকে খেয়ে ফেলবে। না, তার কাছে আমার এই নিবেদন নয়। আমি বলছি অন্য পাঠকের উদ্দেশে — আমার পাঠকের উদ্দেশে। আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি কুকুর সম্পর্কে লেখা লিরিকধর্মী আশাবাদী কাহিনীর মধ্যে আমি দু' একটি বিদ্রূপাত্মক দৃশ্য জুড়ে দিই। শিল্পদৃষ্টির নিয়মভঙ্গের জন্য আমার ওপর দোষারোপ করবেন না, কেননা প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব 'নিয়ম' আছে। হে প্রিয় পাঠক, রচনার সংরূপে মিশ্রণ ঘটে থাকলেও আমার অপরাধ নেবেন না, কেননা জীবনটাই নানা রূপের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ — ভালো ও মন্দ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, হাসি ও অশ্রু, সত্য ও মিথ্যা পাশাপাশি অবস্থান করে, তারা পরস্পরের এতই ঘনিষ্ঠ যে কখন কখন তাদের মধ্যে ইতর-বিশেষ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আমার পক্ষে আরও বেকায়দার হত যদি হঠাৎ আমার অর্ধসত্য আপনার নজরে পড়ে যেত। অর্ধসত্য জিনিসটা অর্ধশূন্য কলসীর মতো। আর অর্ধশূন্য ও অর্ধপূর্ণ কলসীর মধ্যে প্রভেদ প্রমাণ করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

বড় কথা এই যে আমি বরাবর একই জিনিসের কথা না বলে আমার লেখায় সব কিছুর স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী। প্রথমোক্ত ব্যাপারটি ক্ষতিকারক। ভেবে দেখুন! কেবল যদি ভালোর কথা লিখি ত মন্দর পক্ষে তা হবে বরস্বরূপ, তাতে মন্দরই জমক বাড়বে; যদি আমি কেবল সুখের কথাই লিখি, তাহলে লোকে আর অসুখীদের দেখতে পাবে না, শেষ পর্যন্ত তাদের নজরেই আনবে না; যদি কেবল সিরিয়স ও সুন্দরের কথা লিখি, তাহলে, লোকে আর কদাকার কোন কিছু নিয়ে হাসাহাসি করবে না।

একথাও বলতে হয় যে আমি লিখতে বসেছি শুধু একটা কুকুরকে নিয়ে। এর প্রমাণ পাবেন পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে। সেখানে আমাদের বড় ভালো কুকুর বিমের জীবনের কৌতূহলজনক অনেক ঘটনার পরিচয় পাবেন বটে, কিন্তু প্রসঙ্গত এও বলে রাখি, সে-সমস্ত ঘটনা যে সর্বদা আনন্দের এমন নয়।

দশম পরিচ্ছেদ

টাকার বিনিময়ে

তোলিয়া ও স্তেপানভ্‌নার সেবাশুশ্রূষার কল্যাণে বিম্ সেরে উঠতে লাগল। সপ্তাহ দুয়েক বাদে থাবার ঘা শুকিয়ে আসতে লাগল, যদিও অন্য থাবাগুলোর তুলনায় সেটা চেপটা ও চওড়া হয়েই থাকল। বিম্ এখন চেষ্টা করে ঐ পায়ে হাঁটতে, কিন্তু আপাতত অমনি, সামান্য — চেষ্টামাত্র। তোলিয়া বিমের গায়ের লোম ভালো করে আঁচড়ে দেয় বলে বিম্‌কে এখন বেশ ভালোই দেখায়। কিন্তু মাথার ব্যথাটা সর্বক্ষণ আছে; ছাইরঙা ওকে যে প্রহার করেছিল তার ফলে মাথার ভেতরে কোথায় কী যেন নড়বড় হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিমের মাথা ঘোরে; মাথা যখন ঘোরে তখন ও অপেক্ষা করতে থাকে আর অবাক হয়ে ভাবে কী ঘটতে পারে ওর; কিন্তু ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে ধাক্কাটা কেটে যায়, তারপর আবার দেখা দেয় কোন এক সময়। যেমন হয় অন্যায়-অবিচার পেয়ে আহত, হতবুদ্ধি মানুষের বেলায় — ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বা তৎক্ষণাৎ নয়, কিছু সময় বাদে হঠাৎ কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শুরু হয়, মাথা ঘুরতে থাকে, হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে কোথায় বেরিয়ে আসতে চায় — লোকটা তখন টাল সামলাতে সামলাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, অপেক্ষা করে, শোকে দুঃখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ভাবে কী ঘটতে পারে তার; তারপর একসময় বাস্তবিকই ধাক্কাটা কেটে যায়, এমন কি কোন কোন সময় দ্বিতীয়বার আর আসে না। জীবনে কত কিছুই না ঘটে, সবই কেটে যায়। মানুষও প্রাণী, কেবল বেশি অনুভূতিপ্রবণ এই যা।

...কেবল শরতের শেষ দিকে, যখন হিমের ভাবটা মোটামুটি স্থায়ী হতে শুরু করেছে, সেই সময় বিম্ চার পায়ে চলতে শুরু করল। তবে সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই ওকে চলতে হত — ঠ্যাঙটা কেন যেন একটু ছোট হয়ে গেছে। বিম্ খোঁড়া হয়ে গেল, তবে মাথার ব্যাপারটা যেন ঠিক হয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক — জীবনে কত কিছুই না ঘটে, এক সময় সব কেটে যায়।

এতেও হয়ত তেমন একটা কিছু মনে হত না, কিন্তু প্রভু নেই যে — নেই ত নেই-ই। তাছাড়া চিঠির সেই কাগজটা থেকেও অনেকদিন হল কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, নেহাৎ অদরকারী একটা সাধারণ কাগজের মতো পড়ে আছে ঘরের এক কোনায়। বিম্ এখন পারলে ফের বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু তোলিয়া ওকে নিয়ে বেড়ানোর সময় বাঁধন কখনও ছাড়ে না। খবরের কাগজের সেই বিজ্ঞপ্তি আর ছাইরঙা লোকটার কথা ভেবে তোলিয়াকে তখনও ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। তাছাড়া পথ-চলতি লোকজন অনেক সময় জিজ্ঞেস করে: 'আচ্ছা, এটা সেই শামলা কানওয়ালা ক্ষ্যাপা কুকুরটা নয়ত?' তোলিয়া কোন জবাব না দিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে যায়। ও কিন্তু ইচ্ছে করলেই বলতে পারে: 'না, এটা সেই কুকুর নয়' — তাহলেই ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু মিথ্যে বলতে তার বাধে। ভীতি, আশঙ্কা, সন্দেহ — মনের ইত্যাদি উপলব্ধি সে লুকিয়ে ত রাখতেই পারে না, বরঞ্চ সেগুলো খোলাখুলি ও সরাসরি প্রকাশ করে ফেলে — মিথ্যাকে সে মিথ্যা বলে, সত্যকে সত্য বলে। শুধু তা-ই নয়, তার মধ্যে উদ্রিক্ত হয়ে উঠতে লাগল রসবোধ — খাঁটি রসিকতা — ন্যায়বুদ্ধি প্রকাশের এ যেন এমন একটা ভঙ্গিমা, যেখানে মুখে হাসির রেখামাত্র না ফুটিয়ে বক্তা হাসির কথা বলে, যদিও তার মনের গহনে থাকতে পারে রুদ্ধ কান্নার ভাব। এই উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ ঘটে সেই রচনা লেখার সময়, যদিও তোলিয়া নিজে তখনও তার মর্ম বুঝতে পারে নি। তখন সে যেমন বোঝা উচিত তেমনি বুঝে উঠতে পারে নি, ভাসা ভাসা কিছু একটা অনুমান করতে পারছিল মাত্র।

এই ভাবে রোজই ছেলেটি শরৎকালের খেলাধুলোর প্যান্ট আর হলুদ রঙের বুটজুতো পরে, হালকা খয়েরি রঙের কোর্তা আর শরৎকালের উপযোগী রোঁয়া-রোঁয়া টুপি চাপিয়ে সন্ধ্যার আগে খোঁড়া কুকুর সঙ্গে নিয়ে একই পথ ধরে হাঁটে। সব সময় সে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ফিটফাট,

যে পথে তাকে দেখে কেউ মনে মনে না বলে পারবে না: 'দেখেই মনে হয় কোন মার্জিত ঘরের ছেলে।' তার বেড়ানোর পথের ধারেকাছে যে-সমস্ত বাসিন্দা থাকে কুকুরসঙ্গী ছেলেটি দেখতে দেখতে তাদের অভ্যস্ত দৃশ্য হয়ে উঠতে লাগল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে: 'এত সুন্দর শান্তশিষ্ট এই ছেলেটি কাদের বাড়ির?'

স্তেপানভ্‌নার নাতনি ল্যুসিয়া। শান্তস্বভাবের, সাদাসিধে, ধবধবে ফরসা রঙের এই মেয়েটি তোলিয়ার সমবয়সী। ওর সঙ্গে তোলিয়ার খুব ভাব হয়ে গেল, যদিও তোলিয়া কেন জানি বেড়ানোর সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লজ্জা পায়। তবে ইভান ইভানভিচের ফ্ল্যাটে ওরা বিম্‌কে নিয়ে খুব মজা করে, আর বিম্‌ও অখন্ড মনোযোগ ও গভীর অনুরাগ দিয়ে ওদের ঋণ শোধে। স্তেপানভ্‌নাও ওখানে বসে বসে উল বোনে আর ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে তৃপ্তি অনুভব করে।

একদিন ওরা বিমের পায়ের লোমের জট আর লেজের গোড়ার লোমের গোছা ছাড়িয়ে পাট করছিল, এমন সময় ল্যুসিয়া তোলিয়াকে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার বাবা কি এই শহরেই থাকেন?'

'হ্যাঁ, এই শহরেই। তবে ভোরে গাড়ি এসে ওঁকে কাজে নিয়ে যায়, আর ফিরিয়ে দিয়ে যায় সন্ধ্যাবেলায়, অনেক দেরিতে। বেজায় ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন বাবা। বলেন, 'আর পারি না, নার্ভের ওপর বড় বেশি চাপ।'

'আর মা?'

'মা'র কোন ফুরসৎ নেই। কখনই ফুরসৎ পান না। এই ধোবা আসছে, এই মেঝে পালিশ করার লোকজন আসছে, এই ড্রেসমেকার আসছে, আবার ওদিকে টেলিফোন বাজারও কামাই নেই — কখনও এতটুকু স্বস্তি নেই ওঁর। এমন কি স্কুলে গার্জিয়ানদের মিটিং-এ যে হাজির হবেন সে উপায়ও নেই।'

ল্যুসিয়ার চোখে বিষণ্ণতার ভাব ফুটে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সরলমনে সমবেদনা জানিয়ে ল্যুসিয়া বলল:

'কঠিন!'

তোলিয়াকে সে যে প্রশ্নটা করেছিল তার একমাত্র কারণ এই যে সে সব সময় নিজের মা-বাপের কথা ভাবত। তাই জানাল:

'আমার মা-বাবা অনেক দূরে। এরোপ্লেনে করে চলে গেছেন। আমি আর আমার দিদিমা — আমরা দুজনে এখানে থাকি...'

বলতে বলতে পরক্ষণেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে যোগ করল:

'আমরা দিনে দুই রুবল করে খরচ করি — কম নাকি?'

স্তেপানভ্‌না সায় দিয়ে বলল:

'ভগবানের আশীর্বাদে দিব্যি চলে যায়। দশ-দশটা সাদা রুটি কেনা যায়। আর কত চাই! হ্যাঁ, একটা সময় গেছে বটে, অনেককাল আগের হলে কী হবে — মনে থাকবে। ...সে যা দিন গেছে! ওঃ মনে করতেও ভয় হয়! সোয়ামীর বুটজোড়া, তোর দাদুর বুটজোড়া রে ল্যুসিয়া, এক টুকরো রুটির বদলে দিয়ে দিয়েছি।'

'কবেকার কথা এটা?' তোলিয়া আশ্চর্য হয়ে ভ্রূভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল।

'গৃহযুদ্ধের সময়কার কথা বলছি। অনেক কাল হয়ে গেল। তোমাদের তখনও জন্মই হয় নি। ভগবান না করুন, তোমাদের যেন ওরকম দেখতে না হয়।'

তোলিয়া অবাক হয়ে ল্যুসিয়া ও স্তেপানভ্‌নার দিকে তাকাল: মা-বাবা ছেলেপুলেদের সঙ্গে থাকেন না, আর কোন এক সময় লোকে বুটজুতো দিয়ে রুটি কিনত — এ ঘটনা তার কাছে একেবারেই বোধগম্য নয়।

ওর চোখ দেখে মনের ভাব আঁচ করতে পেরে স্তেপানভ্‌না বলল:

'তাছাড়া আমরা যে চলে যাব সে উপায়ও নেই — ফ্ল্যাটটা ত আগলে রাখা দরকার... নইলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। ...এখন আবার এই একেও আগলাতে হয়, ইভান ইভানভিচ যতদিন না আসছেন। কী আর করা! এখানে আর বলার কী আছে? আমরা যে ইভান ইভানভিচের পড়শী!'

বিম্‌ স্তেপানভ্‌নাকে খুঁটিয়ে দেখল, আন্দাজে বুঝতে পারল ইভান ইভানভিচ আছে। কিন্তু কোথায়? খুঁজে দেখা দরকার, খুঁজে দেখা দরকার। ও তাই অনুনয় বিনয় করতে লাগল যেন ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। বিম্‌ দোরগোড়ায় শুয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দেখে মনে হল কোন লোকজনের উপস্থিতি ওর কাম্য নয়। অপেক্ষা করতে হবে! — এটাই ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। খুঁজতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে।

তোলিয়া লক্ষ করল স্তেপানভ্‌না দিদিমা ভুল উচ্চারণ করছেন —

বলছেন 'পড়োশী', কিন্তু এবার ও প্রথমবারের সাক্ষাৎকারের মতো ভুল শুধরালো না, চুপ করে রইল, কেননা এখন বৃদ্ধার প্রতি ওর শ্রদ্ধা জন্মেছে, যদিও ওকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে 'কেন' তার সদুত্তর ও দিতে পারবে না। শ্রদ্ধা করে অমনি — ল্যুসিয়ার ভালোমানুষ দিদিমা বলে। এই যে বিম্, সেও যে ভালোবাসে স্তেপানভ্‌নাকে। তোলিয়া তাই জিজ্ঞেস করল:

'বিম্, তুই ভালোবাসিস স্তেপানভ্‌না দিদিমাকে?'

বিম্ সবাইকে কেবল যে নামেই জানত এমন নয়, নামছাড়া যে কোন প্রাণী হয় না, এমন কি অতি নগণ্য নোংরা কোন কুকুরও নয় — কেবল এটাই ও জানত এমন নয়, ছেলেমেয়েরা যখন ওকে নির্দেশ দিত কার চটি এনে দিতে হবে ও ঠিক আজ্ঞা পালন করত। এবারেও সে তোলিয়া ও স্তেপানভ্‌নার চাউনি দেখে, স্তেপানভ্‌নার মুখের হাসি দেখে বুঝতে পারল কথাটা স্তেপানভ্‌নাকে নিয়েই হচ্ছে, তাই কাছে এগিয়ে এসে ও তার কোলে মাথা রাখল।

আগে কুকুরের প্রতি স্তেপানভ্‌না ছিল উদাসীন (মনে মনে ভাবত, ওঃ কুকুর! ঝামেলা কম নাকি!), কিন্তু বিম্‌কে ভালো না বেসে তার কোন উপায় ছিল না — বিম্ ওর উদার স্বভাব, বিশ্বাসপ্রবণতা আর মানুষ-বন্ধুর প্রতি প্রবল অনুরাগ দিয়ে অর্জন করেছে স্তেপানভ্‌নার ভালোবাসা।

অন্যের ফ্ল্যাটে এই চারটি প্রাণী — তিনটি মানুষ ও একটি কুকুর বড় দরদী, বড় মধুর। স্তেপানভ্‌নার মনটাও ভরে উঠছিল দরদে, প্রশান্তিতে। বার্ধক্যে এর চেয়ে বেশি আর কী চাই!

পরে, অনেক অনেক বছর পরে তোলিয়া স্মরণ করবে সন্ধ্যার প্রাক্কালের এই মুহূর্তগুলো, জানলার গায়ে হালকা বেগনী আলোর ঝলক। স্মরণ করবে। অবশ্যই স্মরণ করবে, যদি মানুষের জন্য তার হৃদয়ের দুয়ার খোলা থাকে, যদি অবিশ্বাস হৃদয়ে এসে বাসা না বাঁধে। ...কিন্তু সেদিন হঠাৎ তোলিয়ার টনক নড়তে ও বলে উঠল:

'ন'টার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় শুতে যাই আমি। ল্যুসিয়া, কাল আমি তোমার জন্যে ড্রইংখাতা আর চেকোস্লোভাকিয়ার রং-পেন্সিল নিয়ে আসব — কোন টাকা দিয়ে, বা জুতো দিয়ে কোন দোকানে কিনতে পাবে না। বিদেশী জিনিস!'

'সত্যি!' উল্লসিত হয়ে বলল ল্যুসিয়া।

'আচ্ছা, তুমি কোথায় যাও বাবাকে বলেছ?' স্তেপানভ্‌না জিজ্ঞেস করল।

'ন্-না। কেন? কী হয়েছে?'

'বলা উচিত। না বললে কী করে হয় তোলিয়া? অবশ্যই বলা উচিত।'

'কিন্তু বাবা ত জিজ্ঞেস করেন না। মাও না। আর আমি রোজই বাড়িতে হাজির ন'টার মধ্যে।'

তোলিয়া যখন চলে যাচ্ছে সেই সময় বিম্ অতি কাতর দৃষ্টিতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাল, কিন্তু ওর কাকুতি-মিনতিতে কোন ফল হল না। অন্যদের ও ভালোবাসলেও বন্ধুর অভাবে যে ও কষ্ট পাচ্ছে, ওর প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে সে কথা বিবেচনা না ক'রে ওরা ওকে করুণা ক'রে আগলে রাখতে লাগল।

পরের দিন তোলিয়া এলো না। সেই যে ড্রইং খাতা আর পেন্সিল, যা দোকানে পাওয়া যায় না, টাকা দিয়ে কেনা যায় না, তাই নিয়ে তোলিয়া আসবে বলে ওর জন্য কত অপেক্ষাই না ক'রে ছিল ল্যুসিয়া! কত অপেক্ষাই না ক'রে ছিল! ল্যুসিয়া বিম্‌কেও কয়েকবার বলল:

'তোলিয়া নেই। তোলিয়া আসছে না।'

বিম্ ওর উদ্বেগের কারণ ঠিকই বুঝল — ঠিকই ত তোলিয়ার আসার সময় পার হয়ে গেছে! তাই ল্যুসিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিম্‌ও জানলা দিয়ে বারবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল, অধৈর্য হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু তোলিয়ার দেখা নেই।

স্তেপানভ্‌না মনে মনে ভাবল 'বাবাকে বলেছে,' কিন্তু মুখে শুধু বলল:

'এখন ঠেলা সামলাও কুকুর নিয়ে। ...তোলিয়াকে ছাড়া আমরা মুশকিলে পড়ে যাব। বিম্‌কে কে বেড়াতে নিয়ে যাবে?'

ল্যুসিয়ার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল, মনের মধ্যে কেমন যেন একটা খারাপ সম্ভাবনা উঁকি মারল।

'মুশকিলই হবে,' কাঁপা কাঁপা গলায় সায় দিয়ে সে বলল।

বিম্ ওর কাছে এগিয়ে এলো, ওকে দুহাতে মুখ ঢাকতে দেখে চাপা স্বরে কিঁউ কিঁউ করল (অর্থাৎ, অমন করে না, ল্যুসিয়া, অমন করে না)। ওর মনে পড়ল টেবিলের ওপর দুই কনুই ভর দিয়ে বসে থেকে ইভান ইভানভিচও অনেক সময় এই ভাবে হাত দিয়ে মুখ ঢাকত। বিম্ জানত এটা খারাপ লক্ষণ। এরকম ক্ষেত্রে বিম্ সব সময় তার কাছে এগিয়ে আসত, প্রভু তখন ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলত: 'তোকে ধন্যবাদ জানাতে

হয় বিম্, তোকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।' এখন ল্যুসিয়াও মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বিমের মাথায় হাত বুলোল।

দিদিমা ল্যুসিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল:

'হয়েছে, হয়েছে রে ল্যুসিয়া, আর নয়। কাঁদার কী আছে! তোলিয়া আসবে। আসবে, ব্যস্ত হোস নে বাছা। তোলিয়া আসবে।'

বিম্ খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোরগোড়ায় এগিয়ে গেল, যেন বলতে চাইল: 'তোলিয়া আসবে। চল আমরা ওকে খুঁজে দেখি।'

'বাইরে যাওয়ার দরকার পড়েছে ওর,' স্তেপানভ্না বলল। 'আমি এখন ওকে বুঝতে শুরু করেছি। বাইরে বের না করেও উপায় নেই — হাজার হোক একটা প্রাণী ত।'

ল্যুসিয়া বিমের গলার বাঁধনটা ধরে সামান্য টান দিল, অস্বাভাবিক দৃঢ়স্বরে বলল:

'আমি নিজেই নিয়ে যাব।'

স্তেপানভ্না হঠাৎ লক্ষ করল মেয়েটি যেন দেখতে দেখতে, চোখের ওপর সাবালিকা হয়ে উঠছে। তোলিয়া যে এলো না এজন্য তার নিজেরও খারাপ লাগতে শুরু করল।

... মেয়েটি কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। এমন সময় মুখোমুখি তিনটি ছেলে।

ছেলেদের মধ্যে একজন — চুল কটা, মুখে দাগ — তড়বড়িয়ে বলে উঠল:

'খুকী, ও খুকী, তোমার এই কুকুরটা মদ্দা না মাদী?'

'বুদ্ধু!' ল্যুসিয়া সংক্ষেপে জবাব দিল।

ওরা তিনজনে সঙ্গে সঙ্গে ল্যুসিয়াকে ও বিম্‌কে ঘিরে ফেলল। ইতরামির সঙ্গে ল্যুসিয়ার জীবনে এই প্রথম পরিচয় — তার তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। কিন্তু যখন দেখতে পেল বিমের দুই কাঁধের উঁচু ফলকের ওপরকার লোম খাড়া হয়ে উঠেছে এবং ও মাথাটা সামান্য বাঁকিয়েছে, তখন হঠাৎ সাহস পেয়ে তীব্রস্বরে চিৎকার করে বলল:

'ভাগ বলছি!'

বিম্ ডাক ছেড়ে এমন তেড়ে গেল যে ওরা তিনজনেই এদিক-ওদিক ছিটকে গেল। কিন্তু বেজায় ভয় পেয়ে যাবার ফলে আঁতে ঘা লাগায় মুখে দাগওয়ালা ছেলেটা ছুটে কিছুটা সরে গিয়ে মিহি সুরে পিঁ পিঁ করে চেঁচিয়ে বলল:

'ছি-ছি! একটা মেয়ে কিনা কুত্তা নিয়ে চলেছে! ছিঃ! লজ্জাও করে না! ছি-ছি!'

ল্যুসিয়া প্রাণপণে চোঁচা দৌড় মারল বাড়ির দিকে। বলাই বাহুল্য, বিম্‌ও তার পেছন পেছন। জীবনে এই প্রথম দেখতে পেল মুখে দাগওয়ালা ছেলেটির মতো খারাপ স্বভাবের একটা ছোট ছেলেকে।

এই ঘটনার পর ওরা বিম্‌কে আবার আগের মতো একা ছাড়তে লাগল। প্রথম প্রথম ল্যুসিয়া ওর পেছন পেছন বেরোত, রাস্তার এক কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেদের মতন করে শিস দিত, যাতে বিম্ দূরে চলে না যায়। পরে স্তেপানভ্‌না একদিন খুব ভোরে ওকে একা ছাড়ল। তখন থেকে ও একেবারে একা বেড়াতে শুরু করল, সন্ধ্যায়, ফিরে এসে তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেত।

কিন্তু একদিন যা ঘটল ধারণায় আনা যায় না! চৌরাস্তার মোড়ে, ট্রামলাইন পার হতে গিয়ে বিম্ শুনতে পেল কে যেন ওকে ডাকল:

'বিম্!'

ডাক শুনে বিম্ ফিরে তাকাল। ট্রামের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ওর চেনা ট্রাম ড্রাইভার বলল:

'কী খবর রে বিম্?'

বিম্ ছুটে এসে থাবা বাড়িয়ে দিল। এ হল সেই ভালোমানুষ মেয়ে-ড্রাইভারটি, যে শিকারের সময় বিম্‌কে আর তার প্রভুকে বাস-স্টপ পর্যন্ত ট্রামে করে নিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ সে-ই!

'প্রভুকে অনেক দিন দেখা যাচ্ছে না ত? ইভান ইভানভিচের কি অসুখ করল নাকি?'

বিম্ চমকে উঠল — মহিলা জানে! প্রভুর কাছেই যাচ্ছে কিনা কে জানে?

গাড়ি যেই চলতে শুরু করল অমনি বিম্ পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠে তাতে চেপে বসল। এক মহিলা যাত্রী বিকট হাউমাউ চিৎকার জুড়ে দিল, একজন পুরুষ হেঁড়ে গলায় চিৎকার করল ('ভা-গ!'), কেউ কেউ বিমের প্রতি সমবেদনা দেখিয়ে হাসল। ড্রাইভার ট্রামগাড়ি থামিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে যাত্রীদের শান্ত করল (বিম্ এটা স্পষ্টই লক্ষ করল) তারপর বিম্‌কে বলল:

'চলে যা, বিম্ চলে যা। অমন করে না, না।' ওকে আলতো করে ঠেলা দিয়ে যোগ করল: 'প্রভুকে ছাড়া যেতে নেই। ইভান ইভানভিচকে ছাড়া — না, না।'

কী আর করা যাবে — না যখন বলছে তখন না-ই। বিম্ গাড়ি থেকে নেমে এসে নীচে বসল, একটুক্ষণ বসে থাকার পর দুলকি চালে ছুটল ট্রাম যেদিকে গেছে সেই দিকে। এই পথে ও প্রভুর সঙ্গে গিয়েছিল — এই পথেই যে তাতে কোন সন্দেহ নেই — এই ত মিনারের পাশের সেই মোড়টা, এই সেই মিলিশিয়া পোস্টটা — মিলিশিয়াকর্মী খাড়া আছে!

বিম্ ট্রামলাইন ধরে চলল, লাইন যেখানে বাঁক নিয়েছে এমন কি সেখানেও ও লাইন পার হল না। মিলিশিয়াকর্মী হুইস্‌ল বাজাল। বিম্ হাঁটতে হাঁটতে ফিরে তাকাল, আপন মনে নিজের পথ ধরে ছুটল। মিলিশিয়াকর্মীদের ওপর ওর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল: এরকম লোকেরা ওর মনে কখনও দুঃখ দেয় নি, একবারও নয়। প্রথম যখন ওকে মিলিশিয়া-ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হল ওর মনে পড়ল সেই ঘটনা। বুদ্ধিমান কুকুর ও, সব মনে আছে ওর। ওখান থেকে দাশার সঙ্গে ও গেল বাড়িতে — সব বেশ ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। শুধু তাই নয়, একাধিকবার ও এক মিলিশিয়াকর্মীকে কুকুর সঙ্গে করে ঘুরতে দেখেছে — কুকুরটা কালো কুচকুচে, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন বড় বেশি রাশভারী; কোন এক সময় ফুটপাতেই কুকুরটার সঙ্গে বিমের আলাপ হয়: ইভান ইভানভিচ ও মিলিশিয়াকর্মী দুজনেই তাদের কুকুরকে পরস্পরের কাছে ছাড়ে, ওদের প্রাণ ভরে কথাবার্তা বলার সুযোগ করে দেয়।

'ওর গা থেকে জংলা গন্ধ বেরোচ্ছে,' মিলিশিয়াকর্মীর দিকে তাকিয়ে কালো কুকুরটা বলল।

ইভান ইভানভিচ যেন ওর অনুমানের সমর্থনেই বলল:

'গতকাল আমরা শিকারে গিয়েছিলাম।'

গন্ধ শোঁকার নিয়মিত প্রক্রিয়া শেষ করার পর বিম্ কালো কুকুরকে বলল:

'কী সাফসুতর তুই!'

'না হয়ে উপায় কী! এমনই কাজ...' লেজের ডগা নাড়াতে নাড়াতে বলল কালো কুকুর।

বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে তারা সেইদিন একই গাছের গায়ে, নীচের দিকে নিজেদের স্বাক্ষর আঁকল।

না, মিলিশিয়াকর্মী লোকটা ভালো, কুকুর সে ভালোবাসে। এ ব্যাপারে বিম্‌কে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না, ঠকাতেও পারবে না।

ও আপন মনে অল্প অল্প করে ট্রামলাইন বরাবর ছুটতে লাগল, তবে

কেবল একপাশ ধরে, কেননা ওর মনে পড়ল লোহার লাইনের ওপর পা ফেলা উচিত নয় — পা চিপটে যাবে।

ট্রামলাইন যেখানে শেষ হয়ে গোল হয়ে ঘুরে গেছে সেখানে আসার পর ও ট্রামচলার পথ বরাবর একটা পাক দিয়ে স্টপের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ বসল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল — সর্বত্র লোকজন, সবাই ভালো। বেশ। এটা ভালোই বলতে হবে। এখান থেকে ইভান ইভানভিচের সঙ্গে ও রাস্তা পার হয়, ওরা গিয়েছিল ঐ যে ঐ জায়গাটায় যেখানে থামের ওপর একটা তক্তা পাতা আছে। বিম্ ধীরেসুস্থে ওখানে গেল। বাসের জন্য অপেক্ষমাণ লোকজনের একটা ছোটখাটো লাইন ছিল, বিম্ তার এক পাশে এসে বসল। নজর করে দেখল — না, এবারে খারাপ লোকজন চোখে পড়ল না।

বাস চলে আসতে লাইনটা সুরসুর করে দরজা দিয়ে ভেতরে গলে গেল, বিম্ সবার শেষে পা বাড়াল, যে কোন বিনয়ী কুকুরের এটাই রীতি।

'এ কী, তুই কোথায় চললি রে?' ড্রাইভার হাঁক ছাড়ল। তারপর হঠাৎ বিমের দিকে আরেকবার নজর পড়তে সুর পাল্টে বলল: 'আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া। তুই যে আমার চেনা দেখছি।'

বিম্ ঠিক বুঝতে পারল এ হল সেই বন্ধুটি যে প্রভুর হাত থেকে কাগজ নিয়েছিল। বিম্ লেজ নাড়াতে লাগল।

'হুঁ হুঁ, কুত্তা বলে কথা — ঠিক মনে করে রেখেছে!' ড্রাইভার আশ্চর্য হয়ে বলল। তারপর কী যেন ভেবে 'এদিকে আয়' বলে বিম্‌কে ডেকে নিল নিজের পাশে।

বিম্ ওখানে গিয়ে বসল, ড্রাইভারের যাতে কাজের ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য বসল দেয়াল ঘেঁষে। এই ড্রাইভারটিই যে কোন এক সময় ওদের বন পর্যন্ত, শিকারের জায়গায় পেঁৗছে দিয়েছিল একথা ভেবে বিম্ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

বাসটা গর্জাচ্ছে ত গর্জাচ্ছেই, চলছে ত চলছেই। শেষকালে স্তব্ধ হল সেই স্টপে এসে যেখানে ইভান ইভানভিচের সঙ্গে সব সময় নেমে ওরা বনে গিয়ে ঢুকত। এখানে এসেই বিম্ অস্থির হয়ে উঠল! ও বাস-এর দরজার গা আঁচড়াতে লাগল, কিঁউ কিঁউ ডাক ছেড়ে সজল চোখে অনুনয় জানাল: 'ছেড়ে দাও, এখানেই আমার দরকার।'

'বসে থাক্!' কড়া ধমক দিল ড্রাইভার।

বিম্‌ মেনে নিল। বাস ফের গরগর আওয়াজ তুলল। একজন যাত্রী ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে এসে আঙুল দিয়ে বিম্‌কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার কুকুর?'

'আমার,' ড্রাইভার জবাব দিল।

'তালিম পাওয়া?'

'খুব একটা না। ...তবে বুদ্ধিমান। দেখতে পাচ্ছ না? এই দেখ: শুয়ে পড়্‌!'

বিম্‌ শুয়ে পড়ল।

'বিক্রি করলে বল। আমারটা মরে গেছে, এদিকে আমাকে ভেড়ার পাল চরাতে হয়।'

'বিক্রি করব।'

'কত দাম?'

'পঁচিশ।'

'বটে!' এই কথা বলে যাত্রীটি সরে গেল, সরে যাবার সময় আগে থাকতেই আদর দেখিয়ে বিমের কানের পেছনে মৃদু চাপড় মেরে বলল: 'ভালো কুকুর, ভালো।'

এই মিষ্টি কথাগুলো বিমের খুবই পরিচিত, প্রভুর কথা। তাই কথাগুলো শুনে বিম্‌ অচেনা লোকটির উদ্দেশেও লেজ নাড়াল।

বিম্‌ এবারে মোটেই বুঝতে পারছে না কোথায় চলেছে। কিন্তু ড্রাইভারের কেবিন থেকে উইন্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও পথ লক্ষ করে রাখতে লাগল। যে-কোন কুকুর প্রথমবার কোন নতুন জায়গা দিয়ে যাবার সময় ঠিক এই রকমই করে থাকে: ফিরতি পথ কখনও না ভোলা — এটাই কুকুরদের রীতি। মানুষের ক্ষেত্রে এই সহজপ্রবৃত্তি বহু যুগ হল ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছে, অথবা বলা যেতে পারে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এতে ভালো কিছু হয় নি। ফিরতি পথ না ভোলা — এটা খুবই কাজের কথা।

সেই যে ভালোমানুষটি, যার গা থেকে ঘাসপাতার গন্ধ বেরোচ্ছিল, একটা স্টপে এসে সে বাস থেকে নামল। বিম্‌কে ভেতরে রেখে ড্রাইভারও বেরিয়ে এলো। বিম্‌ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। ঐ ত ড্রাইভার বিমের দিকে দেখাল, ঐ যে সে ভালোমানুষটির কাঁধে হাত দিল, এবারে ভালোমানুষটির মুখে হাসি ফুটল, পকেট থেকে কাগজ বার করে ড্রাইভারকে দিল, তারপর র‍্যাকস্যাক কাঁধে ফেলে ড্রাইভারের

কামরায় ঢুকল, কোমরের বেলট খুলে বিমের গলার কলারের সঙ্গে আটকাল, বলল:

'আচ্ছা, এবারে চল্ রে।' বাস থেকে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'ওর নামটা কী?'

ড্রাইভার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিমের দিকে তাকাল, তারপর ক্রেতার দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল:

'কালো-কান।'

'যাই বল, কুকুরটা কিন্তু তোমার নয়। ঠিক বলি নি?'

'আমার, আমার। কালো-কান, ঠিকই বলেছি।' এই বলে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

এই ভাবে বিম্ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল।

বিম্ বুঝতে পারল কী যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটতে চলেছে। তবে ঘাসপাতার গন্ধওয়ালা এই লোকটি যে ভালোমানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই মন খারাপ হলেও বিষণ্ণমুখে বিম্ লোকটার সঙ্গে, তার পাশে পাশে চলল।

ওরা দুজনে চুপচাপ চলছে ত চলছেই। হঠাৎ লোকটা সরাসরি বিম্‌কে সম্বোধন করেই বলল:

'না, তোর নাম কালো-কান নয় — অমন নামে কোন কুকুরকে কেউ ডাকে না। হ্যাঁ, তোর প্রভুকে যদি খুঁজে পাওয়া যায় — আমায় পনেরোটা রুবল দিয়ে দিলেই হবে। এ আর কী এমন কথা?'

বিম্ মাথাটা একদিকে কাত করে তার দিকে তাকাল -- যেন বলতে চাইল — না গো মানুষ, তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

'আর তোকে ভাই দেখেই বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধিমান কুকুর, ভালো কুকুর।'

এই যে এবারেও লোকটা বলল সেই একই কথা যা প্রভু প্রায়ই আওড়াত। এবারে বিম্ সোহাগের উত্তরে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ লেজ নাড়াল।

'আচ্ছা, এমনই যখন ব্যাপার, তখন আমার সঙ্গেই থেকে যা,' লোকটি শেষকালে বলল।

ওরা আরও এগিয়ে চলল। পথে বিম্ বার দুয়েক নিজের জিদ দেখানোরও চেষ্টা করল, বেল্‌টে টান দিতে দিতে চোখের দৃষ্টিতে পেছন দিকে ইঙ্গিত করল (ভাবটা এই যে আমাকে ছেড়ে দাও — ঠিক পথে যাচ্ছি না)।

লোকটা থমকে দাঁড়াল, কুকুরের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল:

'এটা কোন কাজের কথা নয়... এটা কোন কাজের কথা নয়।'

এখানে একটা কাজ সহজেই করা যেত — ব্যাপারটা নেহাৎই তুচ্ছ: বেল্টটা জুত করে ধরে একটা--দুটো কামড় বসিয়ে দিতে পারলেই আর দেখতে হত না — বেল্ট দু' আধখানা। কিন্তু বিম্ জানত লাগাম থাকার মানেই হল ওটা ধরে ধরে কেউ চালিয়ে নিয়ে যাবে, যাতে কুকুর যতটা উচিত, তার চেয়ে দূরে দূরে না চলে আবার কাছে কাছেও না চলে। তাই বিম্ অনুনয়-বিনয় করা থেকে ক্ষান্ত হল।

প্রথমে ওরা চলল বনের ভেতর দিয়ে। গাছপালা এখানে ধ্যানমগ্ন, মৌন — নগ্ন, শীতল, তুহিনের স্পর্শে শান্ত সংযত। বনের ভেতরে ঘাসপাতা নিস্তেজ, এলোমেলো, এ ওর গায়ে জড়িয়ে আছে, বিবর্ণ, বিরস। বিমের মনটা তাতে কেবল খারাপই হয়ে গেল।

তারপর মাঠ জুড়ে রবিশস্য, গালিচার মতো জমি ঢেকে রেখেছে — নরম, মন জুড়ানো। এখানে বিমের মন খানিকটা হালকা হয়ে এলো — বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আকাশের অবিশ্বাস্য রকমের প্রাচুর্য। ফুর্তিতে শিস দিতে দিতে পাশে পাশে চলেছে একটি মানুষ — ইভান ইভানভিচ যখন ছিল তখন এসব জিনিস সব সময়ই ভালো লাগত। কিন্তু পথ যখন শরৎকালীন চাষের জমির ওপর দিয়ে গেল তখন ফের সেই আগের মতন — ফুর্তি জাগানোর মতো বিশেষ কিছু এখানে নেই — জমি ছাই-ছাই কালো রঙের, সঙ্গে দানা দানা খড়িমাটি। ডেলামাটি বলতে ওপরে কিছু নেই। দেখে মনে হয় বুঝি মৃত, জায়গায় জায়গায় অর্ধমৃত — গুঁড়ো ঝুরঝুরে, জরাজীর্ণ জমি।

লোকটা পথ থেকে নেমে গিয়ে চাষের জমির ওপর জুতোর গোড়ালি ঠুকল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিম্‌কে বলল:

'গতিক খারাপ রে ভাই। আরও দু'তিন দফা কালো ঝড় এর ওপর দিয়ে গেলে আর দেখতে হচ্ছে না — জমির দফা রফা। গতিক খারাপ রে ভাই...'

'খারাপ, ভাই' — এই শব্দগুলো বিমের খুবই পরিচিত, ইভান ইভানভিচের কাছ থেকে। ও জানত যে এর অর্থ হল নৈরাশ্য, বিষাদ অথবা 'গোলমেলে একটা কিছু', আর 'কালো ঝড়' কথাটা ও গ্রহণ করল 'কালো-কান'-এর মতো — এর কোন ব্যাখ্যা ওর জানা নেই। কিন্তু কথাটা যে জমি সম্পর্কে এটা বিমের পক্ষে বোঝা মোটে সম্ভব নয়। লোকটা বোধহয় ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে বলল:

'অবিশ্যি তুই হলি গিয়ে কুকুর, তুই কিছু বুঝিস নে। কিন্তু কাকেই বা বলব? তাই তোর কাছেই আমি আমার মনের দুঃখু জানাই রে শামলা-কান। ...আচ্ছা রোস দেখি। ...এই বলে তাকিয়ে বিম্‌কে দেখে নিয়ে যোগ করল: 'তোর নাম না হয় শামলা-কানই থাক। শামলা-কান -- বেশ কুকুর-কুকুর শোনায় কিন্তু। আপনা আপনি যখন মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন তা-ই থাক।'

হলই না হয় তাই — তাতে কী আছে? গাঁয়ে পৌঁছুনোর আগেই বিম্ জানতে পারল ও এখন শামলা-কান: লোকটা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আদর করে আউড়েছে:

'শামলা-কান — এটা ভালোই,' কিংবা 'সাবাস শামলা-কান, ভালোই পথ চলছিস' বা ঐরকম কিছু, কিন্তু তার প্রত্যেক কথার সঙ্গে 'শামলা-কান' অবশ্যই থাকত।

এই ভাবে লোকে টাকার বিনিময়ে বিমের ভালো নামটা বেচে দিল। একটা জিনিস অন্তত ভালো বলতে হবে যে বিম্ এটা জানত না, যেমন ও এটাও জানত না যে কোন কোন লোক টাকার বিনিময়ে সম্মান, আনুগত্য ও হৃদয় বিকিয়ে দিতে পারে। এই অজ্ঞতা কুকুরের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ!

কিন্তু বিম্‌কে এখন ভুলে যেতে হবে তার নিজের নাম — না ভুলে উপায় নেই। কিছু করার নেই — এটাই ভবিতব্য। তবে ও ভুলবে না ওর বন্ধু ইভান ইভানভিচকে। যদিও ওর জীবন চলছে এখন অন্য ধারায়, আগেকার জীবনের সঙ্গে এ জীবনের যদিও বিন্দুমাত্র মিল নেই, তবু বন্ধুকে ও ভুলতে পারে নি, তাকে ভোলা যায় না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের জীবন

বিম্‌কে যে গাঁয়ে নিয়ে আসা হল সেটা দেখে ও বড় আশ্চর্য হয়ে গেল। এখানেও লোকজন বাস করে, কিন্তু বিম্ যেখানে জন্মেছে, বড় হয়ে উঠেছে এখানকার সমস্ত কিছুই সেই জগৎ থেকে ভিন্ন। বাড়িঘরগুলো ছোট ছোট — মাটির ঠিক ওপরে, সিঁড়ির চত্বর বা ওঠানামার সিঁড়ি বলে এখানে

কিছু নেই, অসংখ্য দরজার চৌকাঠ নেই, দরজা বন্ধ হলে খুট করে কুলুপ লাগার আওয়াজও এখানে হয় না। রাতে অবশ্য দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করা হয়। সমস্ত বাড়িঘর এবড়োখেবড়ো ছাইছাই-সাদা রঙের পাতে ঢাকা। সকালবেলায় একই সময় প্রত্যেক বাড়ি থেকে ধোঁয়া ওঠে, কিন্তু তাই বলে বাড়িগুলো কোথাও যে চলে যায় বা উড়ে যায় এমন নয় — সমান সারি বেঁধে আপন মনে দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি চুপচাপ, শান্তিতে ধোঁয়া তোলে; ঘরঘর খটখট কোন আওয়াজই ওঠে না সেখান থেকে।

কিন্তু বিমের (এখন ওর নাম শামলা-কান) সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে মানুষের সঙ্গে এখানে গোরু ভেড়া শুয়োর, হাঁস মুরগী ইত্যাদি নানা ধরনের পশুপাখিও বাস করে। এদের সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় হতে অবশ্য কিছুটা সময় লাগল। প্রত্যেক লোকের বাড়ির পেছনে জীবজন্তুদের জন্য আলাদা ছোট ছোট বাড়ি আছে। বাড়িগুলোর কোনটা খড়ে ছাওয়া, কোনটা বা নলখাগড়ায়। সেগুলোর চারধার একটির সঙ্গে আরেকটি লাঠি ও ডালপালা গেঁথে নীচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। পাতলা দেয়ালের আড়াল থেকে সবই দেখা যায়। কেউ কারও কোন ক্ষতি করে না— মানুষ যেমন পশুপাখিদের ক্ষতি করে না, পশুপাখিরাও তেমনি মানুষের ক্ষতি করে না। কেউ কারও ওপর গুলি ছোঁড়ে না।

প্রথম দিন বারবারান্দার এক কোনে শুকনো ঘাসবিচালি দিয়ে বিমের জন্য বিছানা পাতা হল। লোকটা ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল, ভালোমতো খাইয়ে দাইয়ে বর্ষাতি গায়ে দিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। দিনের বাকি সময়টা বিম্‌কে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে চুপচাপ কাটাতে হল। সন্ধ্যার আগে আগে ও শুনতে পেল মাটির ওপর ভেড়ার পালের খুরের আওয়াজ, ভেতরের উঠোনে ওদের ঢোকার শব্দ এবং চালাঘরের ভেতরে গোরুর হাম্বারবও (গোরুটা কী যেন চাইছিল) ওর কানে গেল। দেখতে দেখতে এসে হাজির হল সেই লোকটাও, তবে এবার তার সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে। ছেলেটার গায়ে বর্ষাতি, পায়ে বুট জুতো, মাথায় টুপি, হাতে একটা লম্বা লাঠি। তার মুখটা ছিল ভালোমানুষটির মতোই বাদামী। ছেলেটির গা থেকে ভেড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

বয়স্ক লোকটি বাচ্চা ছেলেটিকে বলল:

'এই যে আলিওশা তোর নতুন সাথীটিকে দ্যাখ।'

ওরা সোজা বিমের কাছে চলে এলো।

'বাবা, কামড়াবে না ত?'

'না, আলিওশা, এ ধরনের কুকুর কামড়ায় না।' ...তারপর বিমের শরীরের একপাশে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে বলল: 'উঃ শামলা... শামলা-কান বড় ভালো কুকুর।'

বিম্ শুয়ে শুয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে ছেলেটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ছেলেটিও ওর গায়ে হাত বুলোল।

'শামলা রে... শামলা...' তারপর বয়স্ক লোকটার দিকে ফিরে বলল: 'আচ্ছা বাবা, বাঁধন খুলে দিলে কি পালিয়ে যাবে?'

'দাঁড়া আরও কিছু দিন দেখা যাক।' এই বলে বাপ বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

বিম্ উঠে বসল, ছেলেটার দিকে থাবা বাড়িয়ে দিল — এই ভাবেই ও বলল: 'কী খবর? — ভালো ত? তুমি বড় ভালো ছেলে।'

ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল:

'বাবা বাবা, এদিকে একটিবার এসেই দেখ না।'

বাপ ফিরে এলো।

'কী খবর শামলা?' এই বলে ছেলেটা নিজের হাত বাড়িয়ে দিল।

বিম্ আরও একবার সম্ভাষণ জানাল। দুটি মানুষই ওর এই ভদ্র ব্যবহার স্পষ্টত অনুমোদন করল। আলাপের প্রথম এই কয়টি মুহূর্ত বিমের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল — ও জানতে পারল, যে-লোকটি ওকে এখানে নিয়ে এসেছে তার নাম বাবা আর ছেলেটার নাম আলিওশা। অতি সাধারণ, তুচ্ছ একটা রাস্তার কুকুরও যেখানে চটপট মানুষের নাম জেনে ফেলে সেখানে বিম্... বিমের ব্যাপারে ত কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না! ও যে কী কুকুর তা এখন আর আমাদের জানতে বাকি নেই।

তারপর গোধূলি যখন নেমে এলো সেই সময় এক মহিলারও আগমন ঘটল। মহিলার বেশবাস আজব রকমের: মাথাটা তার দুটো চাদরে জড়ানো, গায়ের তুলোভরা জ্যাকেটটা চারপাশে জড়িয়ে থেকে একটা ঢোলের মতো দেখাচ্ছে। তার পরনের প্যান্ট ছিল রেল রাস্তার ওপর যে ভালোমানুষ মেয়েটি গজাল পুঁতছিল তার প্যান্টের মতো। কিন্তু এই মহিলার গা থেকে বেরোচ্ছে মাটি আর বীটের গন্ধ (এমন মিষ্টি শেকড়! কখন কখন বিম্ পর্যন্ত চুষতে আপত্তি করে না)। ঘরে ঢুকে সেখানে পুরুষমানুষদের সঙ্গে

কী সব বিষয়ে কথাবার্তা বলল, পরক্ষণেই বালতি হাতে তাড়িঘাড়ি বারবারান্দা দিয়ে উঠোনে চলে গেল। এবারে বিম্ নিজের জায়গায় বসে বসেই লক্ষ করল বারবারান্দা থেকে একটা দরজা চলে গেছে রাস্তায়, আরেকটা জীবজন্তুদের ঘরের দিকে, অন্যটা বাড়ির ভেতরে। কিন্তু ওগুলোর কোনটারই কাছাকাছি যাবার উপায় নেই ওর — দড়ির বাঁধন আছে। আপাতত এইটুকুই জানতে পারল বিম্।

ও আবার শুয়ে পড়ল।

উঠোন থেকে ভেড়ার গন্ধ আসছে, উগ্র গন্ধ। ভেড়া যে কী জিনিস বিম্ বহুকাল আগে থেকে জানে। আগেই ওর একথাও মনে হয়েছে যে ভেড়ারা দল বেঁধে থাকে, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, কোন কাজকম্ম করে না, কেবল খায় আর ম্যা-ম্যা ডাক ছাড়ে। তাছাড়া তাদের আশেপাশে সব সময় একটা লোক মোতায়েন থাকে, যার গায়ে তেরপলের বর্ষাতি, হাতে একটা লম্বা লাঠি, লাঠির আগায় একটা আঙটা লাগানো। একবার ইভান ইভানভিচ ও বিম্ যখন খড়ের গাদার কাছে বিশ্রাম করছিল এমন সময় এই রকম একটা লোক ওদের কাছে এগিয়ে এসে প্রভুর সঙ্গে করমর্দন করল। লোকটার সঙ্গে একটা বিশাল ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরও ছিল। বিম্‌কে দেখে কুকুরটা রণংদেহি মূর্তি ধারণ করল। কুকুরটা গোড়ায় ধাঁ করে ওর দিকে তেড়ে এসেছিল, ভয়ংকর তর্জন গর্জন শুরু করেছিল। কিন্তু বিম্ চার পা ঊর্ধ্বে তুলে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর প্রশ্নটা এই যে: 'ব্যাপার কী? আমি কি কোন অপরাধ করে ফেলেছি?'

বলাই বাহুল্য, অশিষ্টতার ওপর শিষ্টাচারের জয় হল — ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরটা বিমের আপাদমস্তক ভালো করে শোঁকার পর ওর পেট চাটল, তারপর খানিকটা পিছনে সরে গিয়ে পাথরের গায়ে নিজের স্বাক্ষর এঁকে দিল। বিম্‌ও ঐ একই কাজ করল। মোটের ওপর এর অর্থ হল দুনিয়ায় শান্তি হোক। এদিকে বিমের প্রভু আর ঝাঁকড়া লোমওয়ালার মালিক যতক্ষণ কথাবার্তা বলতে লাগল ততক্ষণ ওরা দুজনে একে অন্যকে ধরার ও পাশ কাটিয়ে ছোটার খেলা খেলতে লাগল। খেলার সময় দেখা গেল বিম্ এত চটপটে আর পাশ কাটাতে এতই ওস্তাদ যে ওর নবপরিচিতটি পর্যন্ত বিমের প্রতি শ্রদ্ধার ডাক দমন করতে পারল না। বিদায় নেওয়ার সময় (প্রভুদের অনুসরণ ত করতেই হয়) ওরা পাথরের গন্ধ শুঁকে এমনভাবে মুখ চাওয়াচাউয়ি করল যার অর্থ হল:

'ফের কোন এক সময় এখানে আসিস,' এই বলে বিম্ লাফাতে লাফাতে দূরে চলে গেল।

'ওঃ, অনেক কাজ...' এই বলে ঝাঁকড়া লোমওয়ালা মাথা হেঁট করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ভেড়ার পালের কাছে।

অনেক কাল আগেকার ঘটনা এটা। এখনও আবার সেই ভেড়ার গন্ধ। এই গন্ধ বিমের স্মৃতিকে আলোড়িত করে তোলে, ওর মনে পড়ে যায় ইভান ইভানভিচের কথা। এখন এক অচেনা বাড়ির বারবারান্দায়, এক অচেনা বাড়িতে, গোধূলির আবছায়ার মধ্যে, নির্জন পরিবেশে একা-একা বিমের মন দুঃখে বেদনায় ভরে গেল।

তারপর বিম্ শুনতে পেল একটা লোহার কিসের ওপর কিসের যেন একটা ক্ষীণ ধারা পড়ায় আওয়াজ হচ্ছে সমান তালে: চর্-র চর্! চর্-র চর্! বিম্ জানত না কিসের এই চর্-র চর্ আওয়াজ। অচেনা আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠোন থেকে ঐ বালতিটাই হাতে করে আসতে দেখা গেল সেই মহিলাটিকে। বালতি থেকে আসছিল দুধের গন্ধ। চমৎকার গন্ধ! শহরে দুধের এত ভালো গন্ধ বিম্ কখনও পায় নি, এ গন্ধটা অন্যরকম, কিন্তু তাহলেও দুধ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শহরের দুধে মানুষের হাতের এবং নানা রকম চমৎকার ঘাসপাতার গন্ধ পাওয়া যায় না, গোরুর গন্ধ ত একেবারেই থাকে না — এ বড় আশ্চর্যের কথা! কিন্তু এখানে সব মিলেমিশে কেমন যেন গোলাপ-গোলাপ এমন এক অপূর্ব সুবাসের সৃষ্টি হয়েছে যা মনকে মুগ্ধ করে, মাতোয়ারা ক'রে তোলে। এ নিয়ে আমরা তর্ক তুলতে যাব না: মানুষই যদি কখন-কখন এক দুধের চেয়ে আরেক দুধের তফাত ধরতে পারে, তাহলে অতি সূক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তির অধিকারী বিম্ কেনই বা ফুল আর ঘাসপাতার সঙ্গে মানুষের হাতের ছোঁয়া মেশানো গন্ধ পাবে না, সেই গন্ধ পেয়ে আশ্চর্য হবে না? এই কারণেই ও চট করে লাফিয়ে উঠে মহিলার উদ্দেশে লেজ নাড়াল। কিন্তু বিমের এই পুলকের কারণ বোঝার ক্ষমতা তার ছিল না।

দুর্ভাগ্যবশত, গোরু কী ভাবে দোয়া হয়, বিম্ তার দীর্ঘ চার বছরের জীবনের মধ্যে একবারও দেখে নি। অথচ দুধে কেমন একটা গোরু-গোরু গন্ধ পাওয়া যায়। বিমের কাছে ব্যাপারটা তাই কেমন যেন রহস্যময়ই থেকে যায় — এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যা ওর অজানা। তবে এমন অনেক জিনিসই ত আছে যা কোন কুকুরের সাধ্য কি যে জানে! এতে লজ্জার

কিছু নেই। কিন্তু কোন কুকুর যদি বলে যে সে সব জানে আর তার যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে কী ভাবে কী করতে হয়, কোথায় ছুটতে হয়, পালাতে হয় — এসব সে শেখাতে পারে তাহলে একটা মুরগী পর্যন্ত সে কথা বিশ্বাস করবে না: হোক না তার শক্তি মুরগীর চেয়ে বেশি — কখনই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনাদের বলে রাখি, এরকম হামবড়া কুকুরও হয়। যেমন ধরুন স্কচ টেরিয়র, তার কথাই ধরুন না কেন — স্কচ টেরিয়র এমন ভাব দেখায় যে তার ইট-মাথা নানা রকম আইডিয়ায় ঠাসা (দাড়ি! ইয়া লম্বা গোঁফ আর ভুরু! — এই থাকলেই যেন দার্শনিক হয়ে যায়!), কিন্তু আসলে সে হল আকাট মূর্খ, নিত্যই প্রভুর ওপর হুকুম চালায়, বিকারগ্রস্তের মতো প্রভুকে বকাঝকা করে, অনবরত উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ডকারখানা বাধায়। কিন্তু তাতে লাভ কী? লাভ বিন্দুমাত্র না। বাইরের চেহারাই সার। ভেতরে হয় ভুষোমাল, নয়ত বিলকুল ফাঁকা।

না, বিমের কথা আলাদা — ও কোন কিছু গোপন করে না, ওর মনটা সোজা, সরল। যদি কোন জিনিস না জানে ত সঙ্গে সঙ্গে হাবভাবে প্রকাশ করে ফেলে — যা আমি জানি না তা জানি না — এতে রাখা ঢাকার কী আছে? কাউকে পছন্দ না হলে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেবে: 'তুমি লোকটা ভালো নও। চলে যাও এখান থেকে! ঘেউ!' আর কখন-কখন এমন গর্জন করে যে কী বলব!

তবে হ্যাঁ, যে মহিলা কোথা থেকে কে জানে অমন স্বর্গীয় দুধ যোগাড় করে আনে তাকে ও শ্রদ্ধা না করে পারল না। এই কারণেই মহিলা যে-দরজা দিয়ে বালতি হাতে ভেতরে চলে গেল বিম্ বারবার সে দিকে ফিরে তাকাতে লাগল।

এমন সময় রাস্তার দিক থেকে কে যেন এসে কোন রকম ইতস্তত না করে সদর দরজা হাঁ করে খুলে ফেলল।

বিমের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

'কে? ঘেউ!'

নবাগত লোকটি ঝট করে বারবারান্দা থেকে পেছনে সরে গেল। সাড়া পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে বাবা ছুটে এলো, বারবারান্দায় আলো জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কে? কে ওখানে?'

'আমি, সর্দার-কর্মী,' অচেনা লোকটি জবাব দিল।

তারপর ও বারবারান্দায় এসে ঢুকল, ওরা দুজনে করমর্দন করল (তার মানে ওরা বন্ধু — ঘেউ ঘেউ করার দরকার নেই), পরে দুজনেই বিমের কাছে এলো।

বাবা উবু হয়ে বসে পড়ে বিমের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল:

'তোকে সাবাস বলতে হবে রে, শামলা। সাবাস! কাজ কাকে বলে জানিস। ভালো কুকুর।' এই বলে ওর বাঁধন খুলে দিয়ে ঘরের ভেতরে ছেড়ে দিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল এই যে ঘরে একটা খোঁড়া মুরগীও ছিল। বিম্ মুরগীটাকে লক্ষ্য করে সামনের এক পায়ের থাবা তুলে অনড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এবারে ওকে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল, যার অর্থ হল এই যে উপস্থিত লোকজনকে ও বলছে: 'এটা আবার কী পাখি? এমন ত কখনও জানি না...'

বাবা উৎফুল্ল হয়ে বলল:

'দেখ দেখ, সর্দার! এই শামলাটা একটা দারুণ কুকুর কিন্তু! সব কাজে ওস্তাদ!'

কিন্তু মুরগীটা বিমের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দেওয়াতে বিম্ বসে পড়ল। বসে বসেও কিন্তু আড়চোখে তার দিকে বারবার তাকাতে লাগল — কুকুরের ভাষায় এর অর্থ সংক্ষিপ্ত ও বহু ব্যঞ্জনাময়: 'আচ্ছা আচ্ছা... তুমিও। ...ভেবেছ কী, অ্যাঁ!' এর পর ও দৃষ্টি মেলে তাকাল উপস্থিত লোকজনের দিকে।

'মুরগী পর্যন্ত ধরে না!' আলিওশা মহা খুশী।

বিম্ আলিওশার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

আলিওশা উৎফুল্ল হয়ে বলল:

'আর চোখ! মা চোখদুটো দেখই না! ঠিক যেন মানুষের চোখ।...'

তারপর বিম্‌কে ডাকল:

'ওরে শামলা, এদিকে আয় দেখি, এদিকে আয়!'

কেউ যদি তাকে অন্তর থেকে ডাকে, বিম্ কি সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে? সে আলিওশার পাশে গিয়ে বসল।

টেবিল চেয়ারে বসে খাওয়াদাওয়ার সময় কথাবার্তা শুরু হল। বাবা একটা বোতল খুলল, মা খাবার পরিবেশন করল। সর্দার-কর্মী তার গেলাস খালি করল, বাবাও করল, মাও। আলিওশা কেন জানি পান করল না, তবে

কিছুটা হ্যাম আর রুটি খেল। সে একটুকরো রুটি মেঝের মাঝখানে ছুঁড়ে দিল, কিন্তু বিম্ ওর জায়গা থেকে নড়ল না (ওকে যে বলা হয় নি 'নে!')

সর্দার-কর্মীর চেহারা ইতিমধ্যে লাল হয়ে উঠেছে। বিমের আচরণ লক্ষ করে সে বলল:

'শরিফ কুকুর দেখছি — রুটি খাবে না।'

বিম্‌কে যে টুকরোটা দেওয়া হয়েছিল মুরগীটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে পালাল। সবাই হেসে উঠল। এদিকে বিম্ আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আলিওশাকে: এমন কি বন্ধুত্বের পরিবেশেও যদি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া না থাকে, তাহলে হাসি চলে না।

'দাঁড়া দেখি আলিওশা,' এই বলে বাবা রুটির টুকরোটা মেঝের ওপর রাখল, মুরগীটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: 'নে রে শামলা, নে!'

বিমের পেট ভরা ছিল, তবু সুস্বাদু রুটির টুকরোটা ও তৃপ্তিসহকারে খেয়ে ফেলল।

এবারে সর্দার-কর্মী মেঝের ওপর একটুকরো হ্যাম রাখল।

'ধরে না!' সতর্ক করে দিল সর্দার-কর্মী।

বিম্ বসে থাকল। মুরগীটা কিন্তু খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশে পাশে পা ফেলে ধীরগতিতে এগিয়ে আসছিল হ্যামের টুকরোটা নিতে, কিন্তু যেই নিতে যাবে অমনি বিম্ নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে তার দিকে তেড়ে গেল, নাক দিয়ে ঠেলাও মারতে গেল তাকে। মুরগীটা চটপট খাটের নীচে গিয়ে সেঁধোল। এককথায়, দস্তুরমতো একটা প্রহসন!

'শামলা, নে!' সর্দার-কর্মী অনুমতি দিল।

বিম্ এই টুকরোটাও ভদ্রভাবে নিয়ে খেয়ে ফেলল।

'বাঃ! আর কী চাই!' বাবা উল্লসিত হয়ে বলল। সে জোরে কথাগুলো বলল। তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছে, মনটা হয়ে উঠেছে আরও প্রসন্ন। 'প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি এই শামলাটা,' এই বলে সে এবার বিম্‌কে জড়িয়েই ধরল।

'লোকগুলো ভালো,' বিম্ মনে মনে ভাবল। বিমের আরও যেটা ভালো লাগল তা হল বাবার গোঁফজোড়া — নরম, পশম-পশম ভাব — বাবা যখন ওকে জড়িয়ে আদর করল তখন বিম্ এটা টের পেল।

এর পর যে কথাবার্তা চলল তার মধ্যে বিম্ বুঝতে পারল কেবল একটি কথা — 'ভেড়া', তবে এটা ও ঠিকই বুঝতে পারল যে পুরুষ দুজনের মধ্যে গোড়ায় তর্কাতর্কি চলছিল।

'আচ্ছা, খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ, কাজের কথায় আসা যাক।' সর্দার-কর্মী বাবার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ভেড়ারা চরে খেতে চায় কিনা তুমিই বল?'

বাবা উত্তর দিল:

'তা ত চায়ই। তবে আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে — আমার মেয়াদ ছিল সেণ্ট মেরীর পরবের দিন পর্যন্ত, সে সময় পার হয়ে গেছে।'

'এখানকার সব ভেড়া যৌথখামারের সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। সদস্যরা ত আমার কানের পোকা বার করে ছাড়ল। তাদের কথা হল: বরফ এখনও পড়ে নি, মাঠে ঘুরলেই খাবার, তাই যতদিন বরফ না পড়ছে ততদিন ভেড়াগুলোকে চরতে দেওয়া উচিত। কথাটা ওরা মিথ্যে বলে নি।'

'যতদিন বরফ না পড়ছে ততদিন...' আমাকে সবাই ভেবেছে কী? আর আলিওশা? — আমরা কি লোহা দিয়ে গড়া নাকি?'

'যতদিন বরফ না পড়ছে, খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ,' সর্দার-কর্মী আবার বলল। 'দুনো মজুরী পাবে। বুঝেছ?'

'না, পারব না,' বাবা দৃঢ়স্বরে বলল। 'আমার বৌটা বীটের পেছনে খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেল — ওকে সাহায্য করা দরকার, আর তোমার সেই এক কথা — 'যতদিন বরফ না পড়ছে'।'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ওরা বেশ বন্ধুভাবেই সজোরে হাত মেলালো, 'যতদিন বরফ না পড়ছে' ইত্যাদি কথাও ওরা বন্ধ করে দিল। এর পর ওরা তিনজনে মিলে বাইরে দেউড়িতে এসে সর্দার-কর্মীকে বিদায় জানাল। বিমের কথা ওরা ভুলে গেল।

বিম্‌ও কিন্তু দেউড়িতে বেরিয়ে এলো, উঠোনের চারধারে এর পাক ছুটল, বেড়ার ধারে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে প্রাণভরে টেনে নিল ভেড়ার গন্ধ, যে গন্ধের সঙ্গে ওর একমাত্র ভালোবাসার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত। তারপর কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে বসে পড়ল।

তখন রাত। গ্রামের নিশুতি আঁধার, শরৎকালের নিঃশব্দ রাত, শীতের সঙ্গে মিলনের জন্য যেমন তৎপর তেমনি আবার আশঙ্কিতও বটে। বিমের কাছে এই রাতের সবটাই কেমন যেন রহস্যময়। কুকুরেরা রাত-বিরেতে

ঘোরাঘুরি করা মোটে পছন্দ করে না (অবশ্য যারা লোকজনকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, যারা মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে, সেই সমস্ত ভবঘুরে কুকুর ছাড়া), আর বিম্... বিম্ সম্পর্কে ত কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না! আপাতত বিমের সন্দেহ হল। তাছাড়া আলিওশা — অমন একটা ভালো খুদে মানুষ।

ওর সন্দেহে বাধা পড়ল আলিওশার গলার আওয়াজে। আলিওশা উৎকণ্ঠিত হয়ে গলা চড়িয়ে ডাকল:

'শা-মলা-আ-আ!'

বিম্ ছুটে এলো, আলিওশার পিছন পিছন বারবারান্দায় এসে উঠল। আলিওশা ওকে ওর জায়গায় শুইয়ে দিয়ে ওর চারধারে কিছু শুকনো ঘাসবিচালি গুঁজে দিল, ওকে আদর করল, তারপর নিজেও শুতে চলে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ। না ট্রামের আওয়াজ, না ট্রলিবাসের আওয়াজ, না কোন ভেঁপু — যে-সমস্ত আওয়াজে বিম্ অভ্যস্ত তার কোনটাই সে শুনতে পেল না।

শুরু হল এক নতুন জীবন।

আজ বিম্ জানতে পারল যে বাবা নামে লোকটা খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচও বটে, আবার তাকে কর্তা বলেও ডাকা হয়, আর মা হল পেত্রোভ্না; কিন্তু আলিওশা — আলিওশাই। এছাড়া মুরগীটার ওপর ওর মনে যেমন কোন অবজ্ঞার ভাব জাগে নি, তেমনি শ্রদ্ধার ভাবও জাগে নি। কুকুরের জ্ঞানবুদ্ধিমতে পাখিকে অবশ্যই উড়তে জানতে হবে, অথচ এটা কেবল হেঁটে বেড়ায়, তাই ভক্তিশ্রদ্ধার যোগ্য নয় — পাখা থাকাও যা না থাকাও তাই, তায় আবার শরীরে খুঁতও আছে। কিন্তু ভেড়া: ভেড়াদের কথাই আলাদা — ওদের দেখলে মনে পড়ে যায় ইভান ইভানভিচের কথা। আলিওশার গায়েও আছে ভেড়ার গন্ধ। ...পেত্রোভনার গায়ে মাটি আর বাঁটের গন্ধ। ...আর মাটির এমন গন্ধ সব সময় বিম্‌কে চঞ্চল করে তোলে। হয়ত বা কোনদিন এখানে ইভান ইভানভিচের আবির্ভাব ঘটতে পারে!...

মধুর গন্ধবহ শুকনো ঘাসবিচালির মধ্যে উষ্ণতার আরাম পেয়ে বিম্ ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সুবাস আপনা আপনিই মানুষের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে তোলে, মানুষ পর্যন্ত এরকম শুকনো ঘাসবিচালির শয্যার মধ্যে অচিরাৎ নিদ্রায় ঢলে পড়ে, টাটকা ঘাসবিচালির গন্ধে তন্দ্রার আগের মুহূর্তে তার চোখের সামনে দেখা দেয় নীলিমার ঘোর। বিমের ঘ্রাণশক্তি ছিল

মানুষের তুলনায় অনেক তীব্র, তাই এই সুবাসের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেশ ওর মনের তীব্র আকুলতার তৃপ্তি ঘটাতে লাগল, প্রশমন ঘটাতে লাগল।

বিমের ঘুম ভাঙল মোরগের ডাকে। এক কালে একাধিকবার ও মোরগের ডাক শুনেছে, কিন্তু এত কাছে থেকে কখনও শোনে নি। এ আওয়াজটা যেন সোজাসুজি দেয়ালের ওপাশ থেকে আসছে — জোর গলায়, গর্বভরে, টানাটানা সুরে মোরগটা ডেকে উঠল: 'ক'কর-ও-কোঁ-ও!' গাঁয়ের সবগুলো মোরগ তার ডাকে সাড়া দিয়ে উঠল (কিছুকাল পরে বিম্ জানতে পারে যে এই মোরগটা হল মুল গায়েন, আর এই ধরনের মোরগরা স্বভাবত রাগী হয়)। বিম্ বসে বসে এই আশ্চর্য সঙ্গীত শুনতে লাগল; এর পর গাঁয়ের ভেতর দিয়ে তরঙ্গের মতো গড়াতে গড়াতে চলল সে সঙ্গীত — কখনও কাছে কখনও বা দূরে — সেটা নির্ভর করছে কখন কার পালা আসছে তার ওপর। আর সবার শেষে একা একা ক'কর-ও-কোঁ-ও ডাক ছাড়ল একটা দুর্বল মোরগ — তার গলার আওয়াজটা এমন ভাঙা ভাঙা, সংক্ষিপ্ত যে তাতে কারও মনে কোন শ্রদ্ধা জাগতে পারে না। পরে, সময়ে বিম্ বুঝতে পারবে ঠিক এই ধরনের মোরগগুলোই হয় কাপুরুষ, এমন কি তাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে বাইরের কোন মোরগ এসে পড়লে তাকে দেখেও ছুটে পালায়; যদিও মুরগী সমাজে প্রচলিত সমস্ত নিয়ম মানতে গেলে এই কাপুরুষটার অবশ্য কর্তব্য ছিল তার অধিকারক্ষেত্রে যে-সমস্ত মুরগী বাস করে তাদের শান্তি রক্ষা করা। অথচ এই পরম ভক্তির পাত্রটি পিটটান দেয়। কিন্তু ঠিক এই ধরনের মোরগরাই অন্য মোরগছানাদের প্রতি নিষ্করুণ — তাদের ঠোকরায় — এমনই হীন চরিত্রের! যে কোন মোরগ, যার বিন্দুমাত্র সম্মান বোধ আছে, সে কিন্তু কখনই কোন মোরগছানাকে ঠোকরাতে যাবে না, তা সে মোরগছানা যেখান থেকেই আসুক না কেন। হ্যাঁ, শেষ ডাক যে মোরগটা দিল সেটা ছিল ঠিক এই স্বভাবেরই। ডাক সে ছাড়ল একমাত্র তখনই যখন স্থিরনিশ্চিত হল যে সময়ের ব্যাপারে তার কোন ভুল হয় নি। মানুষ হলে একে বলত সময়ের মন যুগিয়ে চলা, কিন্তু বিমের কাছে এটা ছিল নেহাৎই হাসির। প্রসঙ্গত, অভিজ্ঞতার অভাববশত বিম্ আদৌ ধারণা করতে পারত না যে এরকম নিস্তেজ, আধা-মোরগজাতের মোরগকে দিয়ে কোন মানুষ কখনও সময় মেলায় না।

বিম্ শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে ঝিমোতে লাগল। হঠাৎ আবার গাঁয়ের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে খেলে গেল সুরলহরী। বিম্ ফের উঠে বসল, এবারেও

শ্নতে লাগল, বেশ লাগল শ্নতে। এর পর আবার — তৃতীয়বার, আরও জোরে, আরও তারস্বরে, আর সত্যিই কী চড়া পর্দায়! ওঃ, দিব্যি গায় কিন্তু! হ্যাঁ, এইবারে খাসা বলতে হবে! আর দ্রে কোন এক জায়গায় ওরা যে কী শ্র্ করেছে তা কল্পনাতীত! বিম্ এখনও জানে না যে যৌথখামারের পোলট্রিবিভাগে রাশি রাশি সাদা ফেনার মতো স্ন্দর স্ন্দর যে-সমস্ত মোরগ আছে তারাই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে, লিখিত কোন স্বরলিপির সাহায্য ছাড়াই এই স্বতঃস্ফূর্ত সমবেত সঙ্গীত ধরেছে। ঐ সময় ও যদি বারবারান্দায় বন্ধ না থাকত, তাহলে এমন পরমাশ্চর্য দেখার জন্য, শোনার জন্য ও নির্ঘাত ছ্টে যেত। কিন্তু বারবারান্দাই ছিল ওর পিঁজরা।

দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প করে ভেতরে ঢুকতে লাগল শরতের অর্ণোদয়ের ধ্সর ক্ষীণ আভা। বিম্ উঠে দাঁড়াল, বারবারান্দাটা নিরীক্ষণ করে দেখল: একটা শস্যভরা টব আছে, এক কোনায় একটা গামলার ভেতরে ভুট্টাদানা, আরেক কোনায় কিছ্ বাঁধাকপি। এর বেশি আর কিছ্ নেই।

বালতি হাতে বেরিয়ে এলো পেত্রোভ্না। বিম্ তাকে প্রীতিসম্ভাষণ জানাল। মহিলা উঠোনে চলে গেল, বিম্ও তার পেছন পেছন উঠোনে গিয়ে হাজির। পেত্রোভ্না গোর্র পায়ের কাছে বসে পড়ল, বিম্ বসল খানিকটা দ্রে। বালতির ভেতরে ফিনকি দিয়ে দ্ধ পড়ার চুন-চান্ আওয়াজ হতে লাগল। বিম্ আশ্চর্য হয়ে সামনের দ্' পায়ের দ্ই থাবা ওপর-নীচ নাড়িয়ে চলল। দ্ধ! গোর্টা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে জাবর কেটে চলেছে। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন দ্ধের একটা চমৎকার জ্যান্ত চৌবাচ্চা, আর সেই চৌবাচ্চার খোলা নল দিয়ে চোঁ চোঁ আর কলকল শব্দে দ্ধ ঝরে পড়ছে।

দোয়ানো শেষ করে পেত্রোভ্না বিম্কে ডাকল ('শামলা' নামে), একটা বাটিতে করে ওকে সামান্য দ্ধ ঢেলে দিয়ে বলল: না, ধরে না,' পরে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল: 'নে!' তারপর প্রসন্ন হাসি হেসে দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

'ওঃ, ভগবান, সে কী দ্ধ! ঈষদ্ষ্ণ, কী স্গন্ধ! এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ঘাস আর ফুলের গন্ধ, মাঠের গন্ধ — এক সঙ্গে সমস্ত কিছ্র গন্ধ, সেই সঙ্গে আরও, হ্যাঁ, আরও একটা কিছ্র (না, এবারে আর কোন সন্দেহ নেই) — পেত্রোভ্নার নিজের হাতের গন্ধ। গতকাল দ্র থেকে পেত্রোভ্নার হাতের এই গন্ধটাই সাধারণভাবে মান্ষের হাতের গন্ধ বলে বিমের মনে হয়েছিল।

বিম্ বেশ তারিয়ে তারিয়ে সবটুকু দুধ চেটে খেয়ে ফেলল, সকালের নিত্যকর্ম সারল, তারপর একবার দ্রুত উঠোনটাকে ভালো করে নজর বুলিয়ে দেখে নিল। গোরুটা ওকে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করল, এমন কি ওর মাথাও চেটে দিল। এর উত্তরে বিম্ তার দুধ-দুধ গন্ধমাখা খসখসে নাক নিজের জিভ দিয়ে ছুঁলো। বেড়ার ওপাশ থেকে বিম্‌কে লক্ষ করে অনেকটা যেন ওকে শাসানোর জন্যই ভেড়াগুলো মাটিতে খুর ঠুকতে লাগল, কিন্তু আক্রমণ করার মতো কোন কুমতলব যে বিমের নেই এটা স্পষ্ট বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ওরা শান্ত হয়ে এলো। এক শুয়োর আর তার দুই ছানা প্রথমে বিমের দিকে কোন নজরই দেয় নি, ওরা নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গভরে কেবল ঘোঁতঘোঁত করল। বিমের দিকে মাথা করে একটা জালের ধারে শুয়ে থাকলে কী হবে নড়াচড়া পর্যন্ত করল না। এই ভাবে ওকে স্বাগত জানাল চারপেয়েরা। কিন্তু এই যে মুরগীগুলো — এদের ধরন ধারণই আলাদা! আসলে বলতে গেলে কী ঠিক মুরগীদের নয় — লাল মোরগটার। ওটা একটা দাঁড় থেকে নীচে উড়ে এসেই ডানা ঝটপট করতে করতে রাগে গরগর করে ডাক ছাড়ল: কঁকর-ও-কোঁ-ও! সঙ্গে সঙ্গে চিলের মতো ছোঁ মারার ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিমের ওপর। লাল ঝুঁটিওয়ালা মোরগটা তার বুক আর নখ দিয়ে কুকুরটাকে ঘা মারল (এরকম মোরগও হয়!)। উত্তরে বিম্ তার উদ্দেশে গর্জন করে উঠল, থাবা দিয়ে সপাটে একটা ঘা মারল তাকে। তৎক্ষণাৎ, সেই মুহূর্তে মোরগটা পাখা গুটিয়ে কুঁজো হয়ে ছুটে গেল উঠোনের কোনায়। সেখানে মুরগীরা ঝাঁক বেঁধে জমায়েত হয়ে ছিল, সহানুভূতিশীল দর্শকদের মতো জটলা পাকাচ্ছিল। মোরগটা যার পর নাই অপমানিত হয়ে বিমের কাছ থেকে পালাল, কিন্তু ছুটে যখন মুরগীদের জটলার কাছে এসে হাজির হল তখন ভাবটা দেখাল যেন সে একজন বীরপুরুষ। শুধুই কি তাই? গলা ফুলিয়ে চেঁচালও: 'ওঃ, কেমন দিলাম ওটাকে! ওঃ, যা দিয়েছি না!' মুরগীদেরও হাবভাব দেখে মনে হল তারা সকলে সমস্বরে, তাদের যথাশক্তি প্রয়োগ করে মোরগটাকে প্রশংসা করতে লাগল। এর পর আপনাদের কী মনে হয়? বিম্ একরকম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই অপলক চেয়ে রইল মোরগটার দিকে। যাই বলুন না কেন, কোন পাখি এত সাহস দেখিয়ে একটা কুকুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এমন কাণ্ড বিম্ আর কখনও দেখে নি। এ একটা ঘটনা বটে!

'এখানে কিসের এত হুলস্থুল?' বারবারান্দা থেকে উঠোনে বেরিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ। তারপর মুরগীগুলোর

দিকে ফিরে বলল: 'হুস্! কুকুর দেখে এত ডর! আহাম্মকের দল।' তারপর বিমের কলার ধরে ওকে মুরগীগুলোর কাছে নিয়ে গেল, এই ভাবে ওকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দিল।

বিম্ সরে গেল, মুখ ঘুরিয়ে নিল, ভাব দেখাল মরুক গে ওরা! এর পর থেকে না মোরগটা না মুরগীগুলো কেউই কুকুরের ধারেকাছে ঘেঁসে না, তবে ওকে তেমন একটা ভয়ও অবশ্য করে না, কেবল ওকে কাছাকাছি আসতে দেখে ওদের মধ্যে থেকে কেউ হয়ত ক'ক্-ক'ক্ করে ওঠে — সঙ্গে সঙ্গে পথ ছেড়ে পাশে সরে যায় — এর বেশি কিছু নয়। ওই বা ওদের কী পরোয়া করে? মুরগীগুলো ঘোরাঘুরি করে, ওড়ে না, সাঁতারও কাটে না; তাছাড়া ওদের ওপর কেউ গুলিও ছোঁড়ে না — তার মানে পক্ষী পদবাচ্য নয়। ঐ আর কি — এক ধরনের হাস্যকর প্রাণীমাত্র। তবে হ্যাঁ, মোরগ — তার কথা আলাদা। উড়ে গিয়ে ছাদের ওপর চড়ে, বসতে পারে, কোন অপরিচিত লোক ধারেকাছে এলে তার আগমন সম্পর্কে আগে থেকে, এমন কি বিমের চেয়েও বুঝিবা আগেভাগে অন্যদের সতর্ক করে দিতে পারে। পরিবারকেও সে দিব্যি চালায় — কোন পোকামাকড় পেলে নিজে খায় না, সকলকে ডাকে, কখন-কখন ভাগবাঁটোয়ারা পর্যন্ত করে দেয়। অতএব মোরগ তার নামের সম্পূর্ণ যোগ্য বটে।

বিম্‌কে আপাতত এক সপ্তাহ পর্যন্ত উঠোনের বাইরে ছাড়া হচ্ছিল না। এই কারণে অনেকটা যেন আপনা আপনিই বিম্ হয়ে উঠল এই এলাকার সর্বেসর্বা। উঠোনের মাঝখানে শুয়ে থাকে, এদিক-ওদিক নজর করে দেখে। চারদিনের দিনই আলাদা আলাদা করে সবগুলো মুরগীর সঙ্গে ওর মুখচেনা হয়ে গেল। কোন অচেনা মুরগী বেড়ার ওপর দিয়ে উড়ে এধারে চলে এলে বিম্ তাকে এমন তাড়া দিত, এত জোর তাড়া দিত যে মুরগীটা আরও অনেকক্ষণ ধরে ক'ক্-ক'ক্ করতে করতে কখনও ছুটে কোথাও পালিয়ে যেত, কখনও বা ফিরে আসত, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে উসখুস করতে করতে ভয়মিশ্রিত কৌতুহল নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাত। সে এক মজার কাণ্ড!

এক শুয়োরছানা কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিমের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। শুয়োরছানাটা বিমের কাছে এগিয়ে এসে ঘোঁতঘোঁত করল, ভিজে নাক দিয়ে বিমের ঘাড়ে মৃদু ঠেলা মেরে সাদা ভুরুওয়ালা বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। বিম্ শুয়োরছানার নাক চেটে দিল। এতে শুয়োরছানাটার এত ভালো লাগল যে খুশিতে সে

লাফিয়ে উঠল, নিজের পায়ের নীচের জমি খ‍ুঁটতে লাগল, বিমের কাছাকাছি জমিতে কী যেন ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। বিম্ কৃপা করে অন্য জায়গায় সরে গেল, কিন্তু ঘোঁতঘোঁতনটা ফের ওর পিছ‍ু পিছ‍ু চলে এলো আর দ‍ুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল (দ‍ুজন বিদেশী যেমন একে অন্যের ভাষা ব‍ুঝতে পারে না, তেমনি শ‍ুয়োর আর কুকুরও ব‍ুঝতে পারে না পরস্পরকে)। এর পর সে বিমের গরম গরম লোমশ পিঠ ঘেঁসে শ‍ুয়ে পড়ল। একদিন বেশ ঠান্ডা পড়েছিল। বিমের খারাপ লাগতে থাকায় (বারবারান্দার দরজা দিনের বেলায় বন্ধ থাকত) ও উঠে গিয়ে নরম ঘাসের বিছানার ওপর দ‍ুপাশে শ‍ুয়োরের বাচ্চাদের নিয়ে মাঝখানে শ‍ুয়ে ঘ‍ুম দিল। ওকে এই ভাবে ঘ‍ুমোতে দেখে কিন্তু কেউ আশ্চর্য হল না। শ‍ুয়োরছানাদের মা পর্যন্ত এই বন্ধ‍ুত্বে আপত্তি ত করলই না বরং বিম্ যখনই তাদের বাসস্থানে এসে ঢোকে তখনই সে জোরে জোরে কাতরোক্তি করতে থাকে — তবে সেটা আদৌ কোন ব্যথা-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নয়, সৌহার্দের উচ্ছ্বাসবশত। প্রসঙ্গত শ‍ুয়োর-ভাষার এই বিশেষত্ব বিম্ চটপট ধরে ফেলল, তবে ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি অগ্রগতি ওর পক্ষে এর পরেও সম্ভব হয় নি। অবশ্য ভাষা জানাটা সম্ভবত তত গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ নয়। কুকুর আর শ‍ুয়োর সব দিক থেকেই ভিন্নধর্মী, কিন্তু তাতে শান্তিতে ও আপসে তাদের বসবাস করার পথে কোন বাধা হয় না।

বিম্ বেশ ভালো খাবারদাবার পায়। শ‍ুয়োরছানারা যদিও ইতিমধ্যে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, আকারে এখন তারা বিমের অর্ধেক, তব‍ু বিম্ যদি ওদের জাবনা থেকে কখন-সখন একটু-আধটু খাবার চাখে তাতে তারা আপত্তি করে না। বিম্ রোজ সকালে এক লিটার করে দ‍ুধ পায় — এখানে এই পরিমাণ দ‍ুধ কোন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। প্রশ্ন হতে পারে এর চেয়ে বেশি আর কী চাই? কিন্তু উঠোন উঠোনই, চারপাশ বেড়ায় ঘেরা, যেন একটা জেলখানা — ফটক সব সময় বন্ধ। শ‍ুয়ে শ‍ুয়ে ম‍ুরগী পাহারা দেওয়া আর শ‍ুয়োরছানাদের তদারকি করা — এটা শিকারী কুকুরের উপয‍ুক্ত কাজ নয় — না, কোনমতেই নয়, বিশেষত অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির অধিকারী কোন কুকুরের উপয‍ুক্ত ত নয়ই; আর বিমের ঘ্রাণশক্তি যে কী অসাধারণ তা কি আবার নতুন করে বলে দিতে হবে?

দেখতে দেখতে এই আঙিনায়, এখানকার নানা বাসিন্দাতে বিম্ অভ্যস্ত হয়ে উঠল, এখানকার জীবনে যে প্রাচুর্য তাও আর এখন ওকে আশ্চর্য করে

না। কিন্তু যখন তৃণভূমি থেকে বায়ু বইতে থাকে তখন বিম্ অস্থির হয়ে হে'টে বেড়ায়, এক বেড়া থেকে আরেক বেড়ার গা পর্যন্ত পায়চারী করে বেড়ায়, কখনও বা পেছনের দু' পায়ের থাবার ওপর ভর দিয়ে বেড়ার সামনে উঠেও দাঁড়ায় — যেন সমুচ্চ দেশের যৎকিঞ্চিৎ সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা। ঐভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে, যেখানে স্বাধীন, মুক্ত পায়রার দল স্বচ্ছন্দগতিতে উড়ে বেড়ায়। ভেতরটা যেন কেমন একটা মোচড় দিয়ে ওঠে, বিম্ অস্পষ্টভাবে আন্দাজ করতে পারে যে এমন প্রাচুর্য আর ভালো ব্যবহারের মধ্যেও মুখ্য কোন একটা বস্তুর অভাব আছে।

... ওঃ পায়রার দল, অবাধগতিতে উড়ে চলেছ তোমরা! একটা আহারপুষ্ট অথচ বন্দী কুকুরের ব্যথা তোমরা কতটুকুই বা জান!

বিম্ এটাও উপলব্ধি করল যে ওকে যখন ছাড়া হয় না তার মানে ওর ওপর বাড়ির লোকজনের বিশ্বাসও নেই। রোজ সকালে খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ ও আলিওশা উঠোন থেকে তাদের ভেড়াগুলোকে খেদিয়ে বার করে নিয়ে যায়, বর্ষাতি গায়ে দিয়ে, লাঠি হাতে করে ভেড়ার পাল নিয়ে সারা দিনের মতো চলে যায়। বিম্ কতই না অনুনয়-বিনয় করে, কিন্তু ওকে ওরা সঙ্গে নেয় না।

একদিন বিম্ বেড়ার গায়ে নাক ঠেকিয়ে শুয়ে ছিল, এমন সময় বাতাস ওর কাছে বারতা নিয়ে এলো — কাছাকাছি কোথাও এক চারণভূমি আছে, এক বনভূমিও আছে। অদূরেই মুক্তি! বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল একটা কুকুর পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তখনই বিমের কাছে ওর নিজের অবস্থা দুর্বিষহ ঠেকল। বিম্ ওর পায়ের থাবা দিয়ে বেড়ার নীচের খানিকটা মাটি আঁচড়ে সরাল, তারপর আরও খানিকটা, এই ভাবে সর্বশক্তি দিয়ে ও কাজে লেগে গেল। সামনের দু' পায়ের থাবা দিয়ে মাটি খোঁড়ে আর পেছনের দু' পা দিয়ে মাটি দূরে সরিয়ে দেয়। খোঁড়া পায়ের ছড়ানো থাবাটার পূর্ণ সামর্থ্য না থাকলেও সেটাও কাজ করে চলল।

অতঃপর কী ঘটত বলা যায় না, কিন্তু বিমের খোঁড়া যখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে এমন সময় প্রাঙ্গণে ভেড়ার পাল এসে ঢুকল। বেড়ার নীচ থেকে রাশি রাশি মাটি উড়ে এসে পড়ছে দেখে তারা হুড়মুড় করে গেটের দিকে ফিরে চলে গেল। মাঠ থেকে ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল আলিওশা। সে তখন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেড়াগুলো হুটোপাটি করে আলিওশাকে ধাক্কা দিয়ে গেট পার হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তা বরাবর ছুটতে শুরু করে

দিল। আলিওশ্যা ওদের পিছন পিছন ছুটল, কিন্তু বিম্ কোন দিকে নজর না দিয়ে একমনে মাটি খুঁড়ে চলল।

কিন্তু এর পর আবির্ভাব ঘটল খিসান আন্দ্রেয়েভিচের। সে এসে পেছন থেকে বিমের লেজ ধরল। বিমের শরীরটা তখন ওর নিজের খোঁড়া গর্তের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'মন খারাপ লাগছে বুঝি রে শামলা?' বিম্ যাতে বাইরে চলে আসে তার জন্য ওর লেজটা আস্তে করে নাড়াতে নাড়াতে খিসান আন্দ্রেয়েভিচ ওকে জিজ্ঞেস করল। বিম্ বেরিয়ে পড়ল। লেজ ধরে টানাটানি করলে বেরিয়ে না পড়ে আর উপায়ই বা কী!

'কী হল রে তোর, শামলা?' জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে খিসান আন্দ্রেয়েভিচ হকচকিয়ে গিয়ে ঝট করে পিছু হটে গেল। 'প্যাগলা হয়ে যাস নি ত রে?'

বিমের দুই চোখে রক্তের উচ্ছ্বাস, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ও নিজের নাক এপাশে-ওপাশে নাড়িয়ে চলেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে, দেখে মনে হয় যেন সবে কোন কঠিন শিকারপর্ব সমাধা করে এসেছে। বিম্ অস্থির হয়ে উঠোনে ছুটোছুটি করতে লাগল, শেষকালে খিসান আন্দ্রেয়েভিচের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে গেটের গা আঁচড়াতে শুরু করে দিল।

খিসান আন্দ্রেয়েভিচ প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বিম্ তার কাছে এগিয়ে এসে বসল এবং দুচোখ মেলে যেভাবে তার দিকে তাকাল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল বিম্ বলতে চায়: 'আমি ওখানে যেতে চাই, যেতে চাই খোলা মাঠে। আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে!' বিম্ মিনতি করার ভঙ্গিতে সাষ্টাঙ্গ উপুড় হয়ে এত মৃদু ও করুণস্বরে কিঁউ কিঁউ করতে লাগল যে খিসান আন্দ্রেয়েভিচ নীচু হয়ে ওকে আদর করতে করতে বলল:

'ইস্, শামলা, শামলা রে! কুকুর পর্যন্ত স্বাধীনতা চায়। হ্যাঁ, তা ত চাই-ই!' তারপর বিম্‌কে বারবারান্দায় ডেকে নিয়ে এসে শুকনো ঘাসবিচালির বিছানায় শুইয়ে দিল, একটা দড়ির সঙ্গে বাঁধল। পরে একবাটি মাংসও নিয়ে এলো বিমের জন্য।

ব্যস্, হয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্বাধীনতাহীন আহারপুষ্ট এই জীবন বিমের কাছে অসহ্য ঠেকতে লাগল।

বাটির মাংস ও ছুঁল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্ত প্রান্তরে। এক অসাধারণ শিকারপর্ব। পলায়ন

রোজকার মতো সেদিনও সকালে খিস্রসান আন্দ্রেয়েভিচের বাড়ির দিনচর্যা নিয়মিত ধারায় চলল: তৃতীয় দফায় মোরগদের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কাজের দিনের চাকা চলতে শুরু করে দিল। তারপর গাভীর হাম্বারব, পেত্রোভ্না গোরু দুইয়ে উনুনে আঁচ দিল। বিম্ এখন আলিওশার প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলিওশা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার শামলাকে আদর করল। বাবা গোরুটাকে ও শুয়োরগুলোকে জাব দিল, মুরগীগুলোর সামনে ছড়িয়ে দিল খুদকুঁড়ো। এর পর সবাই টেবিলের ধারে সকালের খাবার খেতে বসল। সেদিন সকালে আলিওশার শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও এমন সুগন্ধী দুধ পর্যন্ত বিম্ ছুঁল না। পরে, আলিওশার মা-বাবা যখন গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল সেই সময় আলিওশা জল নিয়ে এলো, গোয়ালঘর ধোয়াপাকলা করল এবং আরও একবার বিম্‌কে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করল। আলিওশা খাবারের বাটিটা ওর নাকের কাছে ঠেকাল, কিন্তু হায়, শামলা যেন রাতারাতি এক অচেনা প্রাণী বনে গেছে! খিস্রসান আন্দ্রেয়েভিচ একটা বিশাল চাকু শানিয়ে ধারাল করে সেটা দরজার ওপর রাখল — এই ভাবে সমাপ্ত হল তার কাজের আয়োজন পর্ব।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পেত্রোভ্না তার মোটা পোশাক-পরিচ্ছদ ও শাল গায়ে জড়িয়ে একটা থলি আর বাবার শান দেওয়া সেই ছুরিটা তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। তার পেছন পেছন বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো আলিওশা। তারা ভেড়ার পাল রাস্তায় বার করল — রাস্তা থেকে ভেসে আসতে লাগল ভেড়ার ডাক।

তাহলে কি ওরা বিম্‌কে একা রেখে চলে গেল? শুধু তা-ই নয়, রেখে গেল কিনা বাঁধা অবস্থায় এই আধা-অন্ধকার বারবারান্দায়? এটা অসহ্য! বিম্ তাই তিক্ত করুণ স্বরে আর্তনাদ শুরু করে দিল।

এবারে রাস্তার দিককার দরজা খুলে গেল, এসে প্রবেশ করল খিস্রসান আন্দ্রেয়েভিচ। বিমের বাঁধন খুলে দিয়ে সে ওকে দড়ি ধরে টেনে বার করে আনল দেউড়িতে। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওকে নিয়ে চলল ভেড়ার পালের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল আলিওশা। আলিওশার

হাতে দড়িটা দিয়ে সে নিজে চলে গেল ভেড়ার পালের আগে, হাঁক পাড়ল:

'এই চল্, চল্!'

তার পেছন পেছন রাস্তা ধরে ভেড়ার পাল যাত্রা শুরু করল। রাস্তার প্রতিটি বাড়ির হাতা থেকে পাঁচটা-দশটা করে ভেড়া তাদের ভেড়ার পালের সঙ্গে সামিল হতে লাগল। ওরা যখন গ্রামের শেষপ্রান্তে পেীছুল ততক্ষণে একটা বেশ বড়সড় ভেড়ার পাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও আগের মতো সামনে চলেছে খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ আর পেছনে কুকুর নিয়ে আলিওশা।

দিনটা হিমেল, শুকনো, পায়ের নীচের মাটি অনেকটা শহরের বাঁধানো রাস্তার মতোই শক্ত, তবে তুলনায় একটু বেশি এবড়োখেবড়ো এই যা। সূর্য অমনিতেই উত্তাপহীন, তার ওপর আবার ক্ষণে ক্ষণে ঘন হয়ে হিমকণা ঝরে পড়াতে সেই সূর্যও কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছে; তবে হিমকণার ঝাপটা সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষান্ত হয়ে আসছে। শরৎকাল শেষ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু শীত তখনও শুরু হয় নি। এটা ছিল দুয়ের অন্তর্বর্তী এমন এক চিন্তাকুল ক্ষণ যখন শুভ্রবরণ শীত যে-কোন মুহূর্তে তার আগমন বার্তা ঘোষণা করতে পারে, সকলেই তার পথ চেয়ে বসে থাকে, অথচ তার আসাটা সব সময়ই যেন হয়ে থাকে অপ্রত্যাশিত।

ভেড়াগুলো টানাটানা ব্যা-ব্যা স্বরে মেষ-ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে খুরের খটখট আওয়াজ তুলে খোশমেজাজে চলেছে। ওদের সেই ভাষার অর্থোদ্ধার করা নিতান্তই অসম্ভব। বিম্ ভালোমতো লক্ষ করে দেখল পালের আগে আগে, খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচের ঠিক পায়ে পায়ে চলেছে পাকানো শিঙওয়ালা এক ভেড়া, আর সবার পেছনে, আলিওশার ঠিক সামনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে একটা ছোট্ট খোঁড়ামতন ভেড়া। ভেড়াটা যাতে পিছিয়ে পড়ে না থাকে সেজন্য আলিওশা থেকে থেকে ছড়ির আগা দিয়ে আলতো করে তাকে সামনে ঠেলছিল আর চিৎকার করে বলছিল:

'বাবা, একটু আস্তে চল! খোঁড়া সবার সমান জোরে চলতে পারে না!'

আলিওশার বাবা পিছনে মাথা না ঘুরিয়েই পদক্ষেপ মন্থর করে দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভেড়ার পালেরও চলার গতি মন্থর হয়ে আসে।

বিম্ দড়ি বাঁধা অবস্থায়ই চলতে লাগল। ও লক্ষ করল বাবা গুরুগম্ভীর চালে ভেড়ার পালের আগে আগে চলেছে, ভেড়ারা তার সামান্যতম গতিবিধি অনুসরণ করে তাকে মেনে চলছে, আলিওশা বেশ দক্ষতার সঙ্গে, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পেছন থেকে ও পাশ থেকে ভেড়াগুলোর ওপর নজর রাখছে।

একটা ভেড়া দলছুট হয়ে গিয়ে একপাশে সরে এসে হলদেটে ঘাস খেতে শুরু করেছে দেখে আলিওশা বিম্‌কে সঙ্গে নিয়ে সেটার পিছনে ছুটে এসে হাঁক দিল:

'এই কোথায় চল্‌লি?' বলেই আঙটাওয়ালা ছড়িটা ছুঁড়ে দিল ভেড়াটার সামনে।

ভেড়াটা পালে এসে ভিড়ল। বাঁ পাশ থেকে এক সঙ্গে তিনটে ভেড়া নিজেদের স্বতন্ত্রতা দেখানোর মতলব করল — তারা খুশিমতো ঘুরতে ঘুরতে একটা সবজেটে চাপড়ার দিকে চলল, কিন্তু আলিওশা এবারেও ছুটে গেল, এবারেও তাদের ফিরিয়ে আনল যথাস্থানে। বিম্‌ খুব চটপট বুঝে ফেলল যে একটা ভেড়ারেও দলছুট হওয়ার অনুমতি নেই। তাই এর পরের বার আলিওশার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলাভঙ্গকারী ভেড়ার পিছনে তাড়া করার সময় ও ঘেউ-ঘেউ শুরু করে দিল। 'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ!' আলিওশার মতোই সেও কোন রকম রাগের ভাব না দেখিয়ে আইনভঙ্গকারীকে সতর্ক করে দিল, অর্থাৎ বলল: 'কোথায় চল্‌লি?'

'বাবা, শুনলে?' আলিওশা চেঁচিয়ে বলল।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুমোদনের সুরে চেঁচিয়ে বলল:

'সাবাস শামলা!'

একটা ঢালের ওপর এসে সে মাথার ওপর ছড়িটা উঁচিয়ে আগের মতোই জোরে আরেও একবার হাঁক ছেঁড়ে বলল:

'এবারে ছেড়ে দে!' এর পর সে নিজের পায়ের গতি মন্থর করে দিয়ে ভেড়াগুলোর চলার পথের আড়াআড়ি হাঁটতে শুরু করল।

আলিওশা সেই একই পন্থা ধরল, বাবার মতোই সেও আড়াআড়ি চলতে লাগল। কিন্তু আলিওশা পেছনে থাকায় তাকে দ্রুত পা ফেলতে হচ্ছিল, কখন-কখন ছুটতেও হচ্ছিল, কেননা তার কাজ ছিল ভেড়াগুলোকে খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচের দিকে ঠেলে দেওয়া। ধীরে ধীরে গোটা ভেড়ার পালটা উত্তরোত্তর চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, শেষ কালে দেখা গেল মাঠ থেকে ঘাস খেতে খেতেই ভেড়াগুলো মাত্র তিন-চারজন করে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সার বেঁধে ফেলেছে। এবারে খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ ভেড়াগুলোর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, সারিটার ওপর ভালোমতো দৃষ্টিপাত করে দেখল, পালের গোদা ভেড়াটার জায়গা হল খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচের পাশে। মেষপালক থলি থেকে একটা পাঁউরুটি বার করল, তার ওপরকার ছিলকে কেটে নিয়ে

কেন যেন ঐ ভেড়াটাকে দিল। বিমের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না যে পালের গোদা ভেড়ার কোন ভয়ডর থাকা ত চলবেই না, সেইসঙ্গে মেষপালকের প্রতি তার ভালোবাসাও থাকতে হবে। তাই, নিজের অজ্ঞতাবশত ঘটনাটির মধ্যে বিম্ স্রেফ এই তথ্যেরই সমর্থন খুঁজে পেল যে বাবা লোকটি ভালো— এর বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে কি বাবা একজন চালাক লোকও বটে — এই কারণে ভেড়াটা তার পিছন পিছন কুকুরের মতন ঘুরঘুর করে, তার ডাকে সব সময় সাড়া দিয়ে থাকে। একজন মেষপালকের ভেতরে ভেতরে যে কত রকমের প্যাঁচ থাকতে পারে তা অবশ্যই বিমের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ কিন্তু বেশ ভালো করেই জানত যে দলছাড়া মূর্খ ভেড়া, তায় যদি আবার সঙ্গে কোন কুকুর না থাকে, ভেড়ার পালকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই— শ্রান্তক্লান্ত হয়ে, টাটানো রোদে হয়রান হয়ে মেষপালকের ঘুমিয়ে পড়ার বা ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হওয়ার অপেক্ষামাত্র। কিন্তু না, এই পালের গোদা ভেড়াটা ছিল এক বিশেষ ধরনের, সমুচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ভেড়া, তাই বিম্‌কে সে বেশ প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করল।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ পাইপ ধরিয়ে আলিওশাকে বলল:

'আর চাপিস নে, আর চাপিস নে — এখানে খাবার ভালোই আছে।'

...আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন প্রিয় পাঠক মহোদয়? আপনি কি জানেন যে শরতের শেষদিকে ভেড়াদের পেট পুরে খাওয়াতে পারা সত্যিই একটা বড় রকমের ক্ষমতার ব্যাপার? — অপটু হাতে পড়লে মাঠে ভালো খাবার থাকলেও এক সপ্তাহের মধ্যে পালের অর্ধেক ভেড়া খতম হয়ে যেতে পারে — মাঠের খাবার মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে, ব্যস আর দেখতে হবে না। কিন্তু সাবধানে, বুঝেশুনে চরাতে পারলে ভেড়ার পাল পেট পুরে খাবার পাবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে। খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচের কায়দা এমনই যে পতিত জমিতে, আনাচে-কানাচে যত্রতত্র, এমন কি শরৎকালে যখন জমি চাষ করা হয়, সেই সময় ট্র্যাক্টরের নাকের ডগায়ও ভেড়ার পাল চরিয়ে সে ঠিক ভেড়াদের খাবার জুটিয়ে দিতে পারে। এর জন্য এক বিশেষ ধরনের প্রতিভা ও নিষ্ঠা এবং জীবজন্তুর ওপর টান থাকা একান্ত দরকার। ভেড়া চরানো — বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ, মোটের ওপর বলতে গেলে সেই কাজের একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও আছে, কেননা মেষপালক মানুষটি কখন-কখন নিজের সম্পূর্ণ অজানতেই প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে, তার প্রভু ও হিতকারী রূপে

নিজেকে উপলব্ধি করে। এখানেই হল এর সারকথা। আমি যদি ক্ষণিকের তরে বিমের কথা বিস্মৃত হয়ে শরতের শেষে খোলা মাঠে কর্মরত কোন মানুষের কথা বলি তাহলে হে পাঠক, আমাকে ক্ষমা করবেন।

যা হোক, ভেড়াগুলো ছোট ছোট ঘাস দাঁত দিয়ে কেটে খেতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এমনভাবে এক জোট হয়ে এক তালে চবর-চবর্, কড়মড় শব্দে খেয়ে চলেছে যে সমস্ত শব্দ মিলেমিশে এক শান্ত, তৃপ্তিদায়ক, অখণ্ড ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন বাবা আর আলিওশা পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেছে, তারা কথাবার্তা বলছে নীচু গলায়। এখন আর আগের মতো দূর থেকে চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে না ওদের।

আলিওশা জিজ্ঞেস করল:

'শামলাকে ছাড়ব, বাবা?'

'আয় পরীক্ষা করে দেখা যাক। এখন আর পালাবে বলে মনে হয় না — কুকুর স্বাধীনতা পেলে পালায় না। ছেড়ে দে। তবে আগে সরে যা, পরে ওর সঙ্গে খেলিস — ভেড়াগুলোকে ঘাঁটাস নে যেন।'

আলিওশা ভেড়ার পালকে খানিকটা দূরে সরার সময় দিল, তারপর দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে খুশি-খুশি গলায় চিৎকার করে বলল:

'শামলা! আয় রে, ছুটি!' এই বলে সে লাফাতে লাফাতে মাটির ওপর বুটের দুপদাপ আওয়াজ তুলে ঢালের নীচের দিকে ছুট দিল।

বিমের আনন্দের আর সীমা রইল না। সেও লাফাতে লাগল, দৌড়াতে দৌড়াতেই আলিওশার গাল চেটে দেওয়ার চেষ্টা করল, দৌড়াতে দৌড়াতে একপাশে সরে গিয়ে ফের তীরবেগে ছুটে এলো। পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দে সে তখন মত্ত। তারপর একটা লাঠি মুখে করে ছুটতে ছুটতে এসে আলিওশার সামনে বসে পড়ল। আলিওশা লাঠিটা নিয়ে একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে বলল:

'নিয়ে আয় রে শামলা!'

বিম্ লাঠি এনে দিল। আলিওশা আরও একবার ছুঁড়ে দিল, কিন্তু এবারে সে আর বিমের মুখ থেকে ওটা নিল না। ঢালের নীচ থেকে ওপরে যেখানে ভেড়ার পাল আছে সেই দিকে উঠতে উঠতে বলল:

'শামলা ধরে রাখ্। নিয়ে চল্!'

বিম্ তার বোঝা নিয়ে পিছন পিছন চলল। ওপরে ওঠার পর আলিওশা

লাঠির বদলে নিজের টুপিটা বিমের মুখে গুঁজে দিল। বিম্ সেটাও সানন্দে বয়ে নিয়ে চলল। এদিকে আলিওশা লাফাতে লাফাতে ওর সঙ্গে ছুটতে লাগল আর বারবার বলে চলল:

'নিয়ে চল্, শামলা। নিয়ে চল্, সাবাস। বাঃ বেশ! এই ত চাই, এই ত চাই!'

কিন্তু পালের কাছাকাছি এসে ওরা চুপ মেরে গেল (বাবা বলে দিয়েছে 'ভেড়াগুলোকে ঘাঁটাস নে যেন')।

'এবারে বাবাকে দে,' আলিওশা মৃদুস্বরে আদেশ দিল।

খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ হাত বাড়াতে বিম্ টুপিটা তাকে দিয়ে দিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে মেষপালকদের কাছে বিমের আরেকটা নতুন গুণ প্রকাশ পেল। ওরা তিনজনেই আনন্দে আত্মহারা।

আর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে বিম্ নিজে, তার নিজের বুদ্ধি দিয়েই বিবেচনা করে বুঝতে পারল যে একটা নতুন কাজের ভার এসে পড়েছে তার ওপর — কাজটা হল দলছুট ভেড়াদের পালে ফিরিয়ে আনা, এক সারিতে ফেলার পর তাদের ওপর নজর রাখা; তবে সন্ধ্যার আগে আগে গাঁয়ে ঢোকার পর যখন তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যার যার ঘরে যায় তখন আপত্তি করা চলবে না।

যৌথখামারের বিশাল মেষপাল পাহারা দেয় যে দুটো কুকুর তাদের সঙ্গে বিমের আলাপ হয়। ঐ পালটা দেখাশোনা করত তিনজন মেষপালক। তারা সবাই বয়স্ক, তাদেরও সবার গায়ে বর্ষাতি। যৌথখামারের নিজস্ব এবং সদস্যদের ভেড়ার পাল কখনও একে অন্যের কাছাকাছি আসত না, একটা আরেকটার সঙ্গে মিশতও না, তবে শরৎকালে ভেড়া চরাতে গিয়ে চারণভূমির কাছাকাছি চালাঘরে অল্পকালের জন্য বিরতির সময় ফাঁক পেয়ে আলিওশা যখন যৌথখামারের মেষপালকদের কাছে ছুটে যেত তখন তার সঙ্গে সঙ্গে বিম্ যেত যৌথখামারের কুকুরদের কাছে। কুকুরদুটো বেশ — ফিকে হলুদ রঙ, লোমশ, বিশাল আকৃতির, তবে শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির। ওরা কৃপা করে বিমের সঙ্গে খেলাও করত, খেলত শান্ত ভাবে। তবে বিম্ যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে বা চার পায়ে লাফিয়ে উঠে লীলায়িত ভঙ্গিতে মাটিতে এসে পড়ে ওরা সে রকম করে না — ভেড়ার পালের চারধারে নিঃশব্দে পায়ে পায়ে হাঁটে, এদের মধ্যে বেশ একটা কুকুরসুলভ আত্মমর্যাদাবোধ দেখতে পাওয়া যায়। কুকুরদুটোকে বিমের পছন্দ হয়। ভেড়াগুলোও বেশ। বিমেরও

স্বাধীন কর্মজীবন শুরু হল। যদিও ওরা তিনজনেই ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরত আর সেই কারণে ওদের কারও মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বার করার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকত না, তবু এই জীবনের মধ্যে ছিল মুক্তির স্বাদ আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। কোন কুকুর পর্যন্ত এরকম জীবন ছেড়ে পালায় না।

কিন্তু একদিন হঠাৎই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া, ঘূর্ণিঝড় তুষারঝঞ্ঝা। খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ, আলিওশা আর বিম্ মিলে ভেড়াগুলোকে একসঙ্গে গোল করে জড় করল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা দিন শেষ হওয়ার বহু আগেই ভেড়ার পাল গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ভেড়াগুলোর গায়ের ওপর সাদা বরফের গুঁড়ো, মানুষগুলোর কাঁধ বরফে ঢাকা, মাটিতেও বরফ। সর্বত্র সাদা বরফ, মাঠে কেবলই বরফ — বরফ্ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। শীত তার আবির্ভাব ঘোষণা করল, ঝুপ করে এসে নেমে পড়ল আকাশ থেকে।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচের হয়ত বা মনে হয়েছিল যে বিমের মতন একটা কুকুরের পক্ষে দড়ি বাঁধা অবস্থায় থাকা কিংবা শুয়োরদের সঙ্গে ঘুমানো শোভন নয়, অথবা অন্য কোন চিন্তা থেকেও হতে পারে, বিম্‌কে এখন রাতের জন্য স্থানান্তরিত করা হল এক বেশ আরামপ্রদ আশ্রয়ে। বিমের রাতের আশ্রয় এই কুকুরঘরটি বানানো হয়েছিল ঐ বারবারান্দারই এক কোণে। ঘরের ভেতরটা মোলায়েম শুকনো ঘাসে ঠাসা। রোজ সন্ধ্যায় ও পরিবারের একজন সদস্যের মতো বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকত আর রাতের খাওয়াদাওয়া যতক্ষণ না সারা হচ্ছে ততক্ষণ সেখানেই থেকে যেত।

'এ সময়ে শীত পড়তে পারে না। এখনও শীতের সময় আসে নি,' একদিন খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ বলল পেত্রোভ্‌নাকে।

ওরা কথাবার্তার মাঝখানে প্রায়ই 'শীত' কথাটির উল্লেখ করত, আর মনে হত উল্লেখ করত কেমন যেন উদ্বেগের সঙ্গে। বিম্ অবশ্য জানত শীত অর্থ হল সাদা ঠাণ্ডা বরফ।

সেদিন সন্ধ্যায় পেত্রোভ্‌না যখন বাড়ি এলো তখন তার সর্বাঙ্গ বরফের গুঁড়োয় ঢাকা, ভিজে, তার মুখ বাতাসের ঝাপটায় রুক্ষ, ফুলো ফুলো। বিম্ দেখতে পেল জামাকাপড় ছাড়ার সময় তার হাত কাঁপছে, সে কাতরাচ্ছে। তার হাত লাল-লাল ফাটলে আর ছাইরঙের ছোপে ছেয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো দেখাচ্ছে বিমের পায়ের থাবার মতো ঢিবি-ঢিবি। পরে সে গরম জলে হাত ডুবিয়ে হাত ধুলো, অনেকক্ষণ ধরে ঘসে ঘসে হাতে মলম লাগাল।

মলম লাগানোর সময় তার মুখ থেকে কাতরোক্তি বেরিয়ে আসছিল। খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ পেত্রোভ্‌নার দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কিসের জন্য যেন কষ্ট পাচ্ছে (তার চেহারা দেখে বিম্ এটা লক্ষ না করে পারল না)।

পরদিন সকালে খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ ছুরি শানিয়ে নিল। এবারে পেত্রোভ্‌না, খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ, আলিওশা ও বিম্ — চারজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে তারা চলল সমতল সাদা মাঠের ওপর দিয়ে। হালকা তুষারে ঢাকা মাঠ — তুষারের স্তর বিমের অর্ধেক থাবার বেশি গভীর হবে না, তাই হাঁটতে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। চারদিক সুনসান, তবে ঠাণ্ডা। তারপর তারা এসে পেঁছুল একটা মাঠে, যেখানে কিছু দূরে অন্তর অন্তর সার বেঁধে রাখা হয়েছে মাঠ থেকে তোলা বীটের স্তূপ। বীটগুলোর মাথার ওপর যেমন পাতা আছে তেমনি একেকটা স্তূপের ওপরও বেশ করে কিছু পাতা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি স্তূপের কাছে বসে ছিল একেকজন স্ত্রীলোক। তাদের প্রত্যেকেরই জামাকাপড় পেত্রোভ্‌নার পরনের জামাকাপড়ের মতো। তারা বসে বসে নীরবে একমনে কী যেন কাজ করে চলছিল।

ওদের চারজনেই ওরকম একটা স্তূপের কাছে এসে তার চারধারে বসে পড়ল। বিম্ মনোযোগ দিয়ে ওখানকার হালচাল লক্ষ করতে লাগল। পেত্রোভ্‌না পাতাসুদ্ধ মাথা ধরে একটা বীট স্তূপের ভেতর থেকে টেনে বার করল, নিপুণ হাতে সেটার শেকড়ের দিক নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুরি চালিয়ে কচ করে একবারে পাতার গোছা কেটে ফেলল। বীটের মাথায় আরও দু'-একবার কচাকচ ছুরি চালাতেই মাথাটা দিব্যি সাফসুতর হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বীটটা নিজের পাশে আরেকটা গাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচও তার দেখাদেখি হুবহু ঐ একই পদ্ধতির অনুসরণ করল। আলিওশাও — এমন কি ওকে যেন এ ব্যাপারে ওর বাবার চেয়েও বেশি নিপুণ মনে হল। কাজ পুরোদমে চলল। খচ্ — পাতা খতম। খচ্-খচ্-খচ্ — মাথা সাফ। ধপাস! — বীট গিয়ে পড়ল এক পাশে, সাফ করা বীটের নতুন একটা গাদায়।

খানিকটা দূরে, বীটের এই রকমই আরেকটা স্তূপের পাশে একজন স্ত্রীলোক একা বসে ছিল, সেও এই একই কাজ করছিল। পরেরটার পাশেও — তাই, তবে এখানে দু'-তিনজন একসঙ্গে। এই রকম কাজ চলছিল সারা মাঠ

জুড়ে — ঝুপড়ির আকারে সাজানো বীটের স্তূপ, চাদরে ঢাকা স্ত্রীলোকের দল, তাদের হাতের তালু ফাটা, ঠাণ্ডায় ফোলা ফোলা মুখ। সবাই কাজ করে চলেছে হয় হালকা তেরপলের দস্তানা পরে নয়ত খালি হাতে। খচ্-খচ্! — মাথার ওপরকার পাতা সাফ্! খচ্-খচ্! — পাতা সাফ্। খচ্-খচ্! — লোকে কাজ করতে-করতে হাতের ছুরি ফেলে দেয়, ফুঁ দিয়ে হাতের তালু গরম করে, হাতে হাত ঘষে, ফের লেগে যায় কাজে: খচ্-খচ্! খচ্-খচ্! — ঘড়ির মতো নিখুঁত গতিতে।

ঠাণ্ডাও পড়েছে। ছুরি চালানো দেখতে দেখতে ঠাণ্ডায় বিমেরও কাঁপুনি আসতে থাকে, তাই সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আশেপাশের এলাকা নিরীক্ষণ করতে চলল, তবে বেশি দূর গেল না। শরীর গরম হওয়ার পর নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এলো। ফেরার পথে অন্য মেয়েলোকেরা তাকে ডাকাডাকি করলেও বিম্ তাদের আমল দিল না (এখন অবশ্য সারা গাঁয়ের লোকে শামলাকে চিনে গেছে)।

এর পর যে স্ত্রীলোকটি একেবারে একা একা বসে কাজ করছিল সে ওদের কাছে এলো। বয়স তার অল্প, কিন্তু চেহারা দুর্বল। স্ত্রীলোকটি কী নিয়ে যেন অভিযোগ করল, নাক ঝাড়ল, তারপর পেত্রোভ্না'র পাশে বসে পড়ে তাকে নিজের হাতদুটো দেখাল। পেত্রোভ্নাও তার নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতের চেটো দেখাল তাকে। তা দেখে স্ত্রীলোকটি দুঃখ প্রকাশ করল, তেরপলের দস্তানা বুকে চেপে ধরে কাশতে কাশতে শেষে চুপ করে গেল। এর নাম ছিল নাতালিয়া।

পেত্রোভ্না — খচ্-খচ্! খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ্ — খচ্-খচ্! আলিওশা — খচ্-খচ্! সবাই থেকে থেকে ফুঁ দিয়ে হাত গরম করছে, হাত দিয়ে গাল ঘষছে। পেত্রোভ্না — খচ্‌খচ্!.. এমন সময় — টপাস!.. সেই দুখী-দুখী চেহারার স্ত্রীলোকটির চোখ থেকে এক বিন্দু জল ঝরে পড়ল পাতার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সে দুহাতে মুখ ঢেকে চলে গেল নিজের গাদাটার দিকে।

'ঈশ্বর রক্ষা করুন, তোর আবার কোন ঠাণ্ডা-টাণ্ডা না লেগে যায়,' আলিওশাকে লক্ষ করে এই কথা বলে পেত্রোভ্না তার কাছে এগিয়ে এলো, আলিওশার টুপির নীচের গরম স্কার্ফটা ঠিকঠাক করে দিল, গলার চারধারে ভালো করে জড়িয়ে দিল, নিজের কোট থেকে ক্যাম্বিসের বেল্ট খুলে আলিওশার চামড়ার কোটের ওপর জড়িয়ে দিল।

বিম্‌ও আলিওশার চামড়ার কোটের গায়ে নাক গংজে পেত্রোভ্‌নাকে সাহায্য করতে গেল। কিন্তু বিম্‌ দেখল আলিওশাকে দেখে যেমন মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু তার তেমন শীত করছে না; বরঞ্চ বাবা আর পেত্রোভ্‌নার তুলনায় ওর শরীর অনেক বেশি গরম (এটা কিন্তু বিম্‌ মানুষের চেয়ে ভালো বুঝতে পারে)।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ দ্বিগুণ জোরে ছুরি চালাতে চালাতে বলল:

'শুনছিস আলিওশা,' (বিম্‌ সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করল)। 'যা দেখি, শামলার সঙ্গে ছুটোছুটি করে শরীরটা একটু গরম করে নে।'

বিম্‌ ছুটল ছেলেটার আগে আগে ঠাণ্ডায় জমাট শক্ত খেতের ওপর দিয়ে। ওরা খেতটা আড়াআড়ি পার হল। আলিওশার এখন বেশ গরম লাগছে। সে মাথার টুপি খুলল, জড়ানো স্কার্ফটা খুলে কোটের ভেতরে বুকের কাছে গংজে রাখল, টুপির কানদুটো সামান্য উঠিয়ে ওটা মাথায় দিল। বন যেখানে শুরু হয়েছে তার পাশে একটা হলদেটে ঘন ঘাসের চাপড়ার ওপর বিম্‌ ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, নাক টেনে বাতাস শুঁকল, মাকুর চালে আগে-পিছে ছুটতে শুরু করল, তারপর আলিওশাকে অবাক করে দিয়ে শিকার-সঙ্কেতের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আলিওশা ওর দিকে ছুটে গেল:

'কী হল রে শামলা?'

বিম্‌ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল। আলিওশা কিন্তু ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল।

'ভড়কে দে! ভড়কে দে!' আলিওশা চেঁচাল।

বিম্‌ অপেক্ষা করছিল কখন আলিওশার মুখ থেকে বেরোবে 'সামনে!' কিন্তু আলিওশা সেই মন্ত্র উচ্চারণ করল না, তার বদলে সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলল:

'ভড়কে দে!'

বিম্‌ তড়বড় করে এগিয়ে গিয়ে এক ঝাঁক তিতিরকে উড়িয়ে দিল।

আলিওশা বেশিক্ষণ ভাবনা চিন্তা না করে বিম্‌কে সঙ্গে নিয়ে ছুটল তাদের আগের জায়গায়। বিম্‌ বুঝতে পারল এবারেও ওদের দুজনের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হল না — ইভান ইভানভিচ যে-সমস্ত শব্দ বলত সেগুলো আলিওশার জানা নেই, তা সত্ত্বেও ও আলিওশার পাশে পাশে ছুটতে লাগল। আলিওশার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে, জায়গায় ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে

সে তার মা-বাবাকে বলল যে বিম্ এক ঝাঁক তিতিরের সন্ধান পেয়ে তাড়া দিয়ে তাদের উড়িয়ে দিয়েছে।

'শিকারী কুকুর, আমাদের শামলা রীতিমতো তালিম পাওয়া কুকুর!' খিৎসান আন্দ্রেয়েভিচ তারিফ করে বলল। 'আমাদের যদি একটা বন্দুক থাকত রে আলিওশা! তাহলে শিকারে যাওয়া যেত! তাই না রে আলিওশা?'

বন্দুক? শিকার? কী পরিচিত আর কী মিষ্টিই না এই কথাগুলো বিমের কাছে! ও জানে এর অর্থ কী।

বিম্ লেজ নাড়ল, একবার আলিওশার, একবার খিৎসান আন্দ্রেয়েভিচ আর একবার পেত্রোভ্নার গা ঘেঁষে সোহাগ জানাল — এই ভাবে তার নিজের ভাষায় সুস্পষ্ট, পরিষ্কার বক্তব্য জানাল। কিন্তু এখানে ওর কথা কেউ বুঝল না — কেউ বন্দুক আনতে গেল না, এমন কি বন্দুক ছাড়াও শিকারে গেল না। বিম্ আলিওশার পিছনে চামড়ার কোটের গা ঘেঁষে বসল, গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল — অন্তত ওর চেহারা দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল।

ওরা যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন গোধূলি। সকলে ক্লান্ত, শীতে হিহি করে কাঁপছে। কিছুদিন বাদে বীট কাটার জন্য যাওয়াও ওদের বন্ধ হয়ে গেল — ওদের ভাগের কাজ চুকে গেছে।

এখন পেত্রোভ্নাকে আর কোথাও যেতে হয় না, তাকে দেখে মনে হয় এতে সে খুব খুশি। সারাদিন সে বাড়িতে টুকটাক এটা-ওটা কাজ করে: গোরুর গা ধুয়ে সাফ করে, জামাকাপড় কাচে, মেঝে ধোয়াপাকলা করে, বাঁধাকপি কাটে, মাখন তোলে, উনুন ধরায়, রান্না করে, সেলাইকলে সেলাইফোঁড়াই করে, পোশাক-পরিচ্ছদ মেরামত করে, গোরুকে জাব দেয় — তার কাজের আর অন্ত নেই। বিম্ সর্বক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে।

একবার বই হাতে করে এক সাফসুতর মহিলা আলিওশার খোঁজে এলো। মহিলা পেত্রোভ্নাকে বকাঝকা করল (তবে বিম্ লক্ষ করল ক্রোধের প্রকাশ তাতে নেই)। ওদের দুজনের কথাবার্তার মধ্যে বারবার 'আলিওশা', 'ভেড়া', 'বীট' — এই কথাগুলো শোনা যেতে লাগল। পরদিন সকালে আলিওশা বইপুথি নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। এখন থেকে রোজ সে সারা দিনের মতো উধাও। খিৎসান আন্দ্রেয়েভিচও রোজ নিয়মিত সময় বিদাকাঠি নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে যায়, ফিরে যখন আসে তখন তার গা দিয়ে গোবরের গন্ধ বের হয়।

এমনি নিত্যকার এক সাধারণ সন্ধ্যায় সবাই যখন রাতের খাবার

খেতে বসেছে, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল একজন লোক। লম্বাচওড়া চেহারা, হাড়ের গড়ন মজবুত, বিশাল চওড়া মুখ, তবে চোখজোড়া শেয়ালের মতো ছোট-ছোট আর মাথায় তার শেয়ালের চামড়ার টুপি। বিম্ লক্ষ করল খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ অপ্রসন্ন মুখে আগন্তুকের দিকে তাকাল, সচরাচর সে যেরকম করে থাকে আজ তার বিপরীত আচরণ করল — উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাল না, করমর্দনের জন্য হাত পর্যন্ত বাড়াল না।

'বলি হালচাল কেমন?' আগন্তুক উদাসীন কণ্ঠে বলল, মাথার টুপি পর্যন্ত খুলল না সে।

'এই যে ক্লিম, বোসো,' খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ উত্তর দিল।

লোকটা বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসল, নিজের জন্য একটা বেশ বড় করে সিগারেট বানাল, বিম্‌কে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে করতে জিজ্ঞেস করল:

'ও এটাই তাহলে সেই শামলা?' (বিম্ কান খাড়া করল) 'শিকারে না নিয়ে গেলে এটা ত খারাপ হয়ে যাবে। ভেগেও পড়তে পারে। বেচে দাও — পঁচিশ রুবল দেব।'

'বেচবার কুকুর নয়,' বলে খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল — তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বিম্ তিন কদম দূরে থেকে স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারল যে আগন্তুকের গা থেকে খরগোশের গন্ধ আসছে। কাছে এগিয়ে এসে ও লোকটাকে শুঁকে দেখল, লেজ নাড়ল, শেয়ালের চামড়ার টুপির নীচে তার চেহারাটা উঁকি মেরে দেখল — বিমের ভাষায় এসবের অর্থ হল 'বুঝতে পেরেছি — শিকারী।'

ক্লিম বলল:

'দেখলে ত? শামলা ঠিক টের পেয়েছে কার সঙ্গে কথা হচ্ছে। বললাম, বেচে দাও।'

'না, বেচব না ক্লিম, বেচতে পারব না। এর আগের ঘটনা তাহলে তোমাকে বলি ,আলিওশাও গোড়ার দিকে এটা জানত না — জেলার খবরের কাগজের দপ্তরে আমি তিন রুবল আর একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপনে জানালাম: 'সাদা রঙের এক শিকারী কুকুর, একটা কান কালো — আমার কাছে এসে পড়েছে।' উত্তর পেলাম: 'দয়া করে বিজ্ঞাপন দেবেন না, যতদিন সময় না আসছে ততদিন আপনার কাছেই থাকুক।' ব্যাপার কী বুঝতে পারলাম না, তবে এটা ঠিকই অনুমান করতে পারছি যে কুকুরটা খুবই উঁচু দরের, ওকে যত্ন করে রাখা দরকার।'

'কিন্তু তোমার হাতে ওর বারোটা বাজবে। বেচে দাও।' ক্লিমও নাছোড়বান্দা। তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের আভাস।

'না, না, ওসব কারবার চলবে না,' খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ তার কথায় বাধা দিয়ে বলল। 'অমনি দরকার হয় শিকারে নিয়ে যাও, কিন্তু ঐদিনই ফিরিয়ে আনতে হবে। শামলা না হয় এই ভাবে ওর জাতধর্ম রক্ষা করে চলুক।'

'না, না বেচবার কুকুর নয়,' আলিওশাও কথার মাঝখানে বলে উঠল।

'যাক গে, তোমাদের যা ইচ্ছে,' ক্লিম অসন্তুষ্ট স্বরে এই কথা বলে বিমের দুই কাঁধের উঁচু ফলকের ওপর মৃদু চাপড় মেরে চলে গেল।

খাওয়ার পর খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ লণ্ঠনের আলোয় একটা ভেড়া জবাই করল। তারপর পেছনের দুই ঠ্যাঙে ওটাকে লটকিয়ে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল, ভেতরের নাড়িভুঁড়ি সাফ করল, ভেড়ার গাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে ঐ অবস্থায়ই সকাল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখে দিল চালাঘরে।

পেত্রোভ্না সারা সন্ধ্যাবেলা ধরে ঝুড়িতে ডিম ভরল, বয়ামে মাখন ভরল, ঘি ঢেলে রাখল। তারপর সমস্ত জিনিস সাদা বেতে বোনা বাজারের টুকরিগুলোতে সাজিয়ে রাখল।

এতক্ষণে বিম্ টের পেল যে ও সমস্ত জিনিস (ছালছাড়ানো ভেড়া, ডিম, ঘি-মাখন, টুকরি) থেকে শহরের বাজার-বাজার গন্ধ ছাড়ছে। বিম্‌কে কি আর এটা বলে দিতে হবে! ইভান ইভানভিচের সন্ধানে যে সারা শহর এ মাথা ও মাথা চষে বেড়িয়েছে! বিম্ সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে পড়ল: বাজার, শহর, ঝুড়ি, ওর সেই ফ্ল্যাট — এসব মিলে পরিণত হল একটিমাত্র ধ্যানে: ইভান ইভানভিচ অবশ্যই ওখানে। রাতে ও চোখের পাতা ফেলতে পারল না।

খুব ভোর থাকতে থাকতে ছালছাড়ানো মাংসটা যখন শক্ত হয়ে এসেছে তখন খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ ওটাকে একটা পরিষ্কার বস্তার ভেতরে পুরে ভালো করে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে কাঁধের ওপর তুলে নিল, পেত্রোভ্না বাঁকের দুধারে দুটো ঝুড়ি ঝুলিয়ে বাঁকটা উঠিয়ে দুই কাঁধের ওপর চাপাল। বিম্ ওদের সঙ্গে যাবার জন্য কত অনুনয়-বিনয়ই না করল। ও কত স্পষ্ট করে, কত জোর দিয়েই না বোঝাতে চাইল: 'তোমাদের সঙ্গে যাওয়া আমার দরকার। আমি ওখানে যেতে চাই। আমাকে তোমরা সঙ্গে নাও।'

কেউ বুঝল না ওর মনের কষ্ট। কেবল তাই নয়, খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ বোঝাটা ঠিক করে দু'কাঁধের ওপর জুত করে রাখতে রাখতে বলল:

'ওরে আলিওশা, শামলাকে একটু ঠেকিয়ে রাখ ত—আমাদের পেছন পেছন আবার ভেগে না পড়ে।'

আলিওশা ওর গলার পটি ধরে ওকে দেউড়িতে আটকে রাখল। এদিকে বাবা ও মা দুজনেই ভারী বোঝা নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বড় রাস্তার দিকে, বাস স্টপের উদ্দেশে চলতে শুরু করল। আলিওশার আদর ও মন-ভুলানো কথায় কোন মনোযোগ না দিয়ে বিম্ দৃষ্টি দিয়ে ওদের অনুসরণ করল, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা চোখের আড়াল না হল ততক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

এর কিছুক্ষণ বাদেই এলো ক্লিম। সঙ্গে তার বন্দুক, পিঠে ঝোলা। কিন্তু শিকার রাখার থলি আর কার্তুজের বেল্ট তার কাছে নেই (উপকরণের এই ত্রুটি সঙ্গে সঙ্গে বিমের চোখে পড়ে গেল)। কিন্তু হাজার হোক বন্দুক ত আছে! এটাই আসল কথা। বিম্ সরল বিশ্বাসে শিকারীর দিকে এগিয়ে গেল, আর তখনই ওর নজরে পড়ল যে কার্তুজ শিকারীর পকেটে আছে। এটাও একটা বড় রকমের নিয়মবহির্ভূত ঘটনা। তবে সবচেয়ে বড় কথা — বন্দুক। বন্দুকধারী লোকের সঙ্গে বিম্ যেখানে সেখানে যেতে পারে। হয়ত খুব একটা বেশি সময়ের জন্য নয়, কিন্তু কম সময়ের জন্য হলেও যাবেই। এটাই হল 'সেটার' কুকুরের স্বভাব, বিম্ও এর ব্যতিক্রম নয়: এমন কি এই আগের দিনও যে আকুলি-বিকুলি তার মনের মধ্যে উঠেছিল তাও যেন অন্তত কিছু সময়ের জন্য শান্ত হয়ে এলো। বন্দুকের প্রতি সম্পর্কের ব্যাপারে বিম্ ছিল এক সাধারণ শিকারী কুকুর। এর জন্য যুক্তিহীনতার দোষ ওকে দেওয়া ঠিক হবে না। যদিও বিম্ এক পরম বুদ্ধিমান কুকুর, তবু বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন ভাবেই সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা ওর ছিল না। ও যে একটা কুকুর একমাত্র এই ঘটনাটার জন্যই জীবনে ওর আরও বহু ভোগান্তি আছে। তাই ওকে দোষ দিয়ে কাজ নেই।

'চল্ রে শামলা, শিকারে চল্,' ক্লিম বলল।

বিম্ লাফিয়ে তার সামনে চলে এলো: 'শিকার!'

ক্লিম ওকে একটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিল। আলিওশা তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল:

'ক্লিম চাচা, শামলা যখন শরীর টানটান করে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে পড়বে তখন বুঝতে হবে যে সামনেই কোথাও তিতির আছে। ওকে

তখন চেঁচিয়ে বলবেন: 'ভড়্‌কে দে!' নইলে কিন্তু জায়গা থেকে এক পাও নড়বে না।'

'আচ্ছা, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আমি যে জানি,' আলিওশা গম্ভীর ভাবে বলল। 'আমাকে আবার পড়া তৈরি করতে হবে কিনা, নইলে আপনার সঙ্গে গিয়ে নিজেই দেখিয়ে দিতে পারতাম।'

ক্রিম আশ্বাস দিয়ে বলল:

'ওরকম কিছু কিছু ব্যাপার আমাদেরও জানা আছে। শিকারে ত আর এই প্রথম যাচ্ছি না।'

এই ভাবে অনেক দিন বাদে এবং মনে মনে বহু কষ্ট ভোগের পর বিম্‌ শিকারে চলল। শুরুতে দুর্গন্ধময় একটা খট্টাশের খোঁড়ল ছাড়া আর কিছুই তাদের পথে পড়ল না।

'কাজে লেগে যা,' ক্রিম বলল।

এ ধরনের কথা বিমের বোধগম্য নয়, ও একপাশে সরে গিয়ে হতভম্ব হয়ে বসে পড়ল।

দুপুর গড়াতে না গড়াতে বেশ গরম পড়ে গেল। চারদিক রোদে ঝলমল, বরফের পাতলা পরত সূর্যের কিরণে গলে গেছে, বিমের পায়ের নীচে এখন কাদা প্যাচপ্যাচ করছে, ওর পায়ের গোছার ঝুমঝুমে লোম জলকাদায় জবুথবু হয়ে গেছে, ওকে কেমন যেন হাড্ডিসার দেখাচ্ছে। এই অবস্থায় যে-কোন ভিজে 'সেটার' কুকুরের মতো বিম্‌কেও বিশ্রী দেখাতে লাগল। কিন্তু বিম্‌ পুরোদস্তুর নিয়মমাফিক খোঁজাখুঁজি করতে লেগে গেছে — ক্রিমের সামনে মাকুর চালে কখনও এদিক কখনও বা ওদিক চলতে লাগল, কখনও আড়াআড়ি, কখনও বা যাচাই করার জন্য তার পিছেও চলে গেল। একটা ঝোপমতো জায়গার কিনারায় কিছু তিতির দেখতে পেয়ে বিম্‌ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্রিম হাঁক দিল:

'ভড়্‌কে দে!'

হেঁড়ে গলার বিকট গর্জনে বিম্‌ রীতিমতো চমকে উঠল। ও কোনরকম বিচারবিবেচনা না করে ঝটকা মেরে ছুটে গেল (ওঃ কী ভুলই না করে ফেলল!), কিন্তু গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ হল না। বিম্‌ পিছু ফিরে দেখল। শিকারী তার একনলা বন্দুকে কার্তুজ ঢোকানোর চেষ্টা

করছে — কিন্তু ঢোকাতে পারছে না। এর পর সে কার্তুজ বার করার চেষ্টা করল — সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। বিম্ বসে পড়ল, যে জায়গায় ও তিতিরগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে নড়ল না; শিকারীর কাছাকাছি না গিয়ে দূর থেকেই দেখতে লাগল তার কাণ্ডকারখানা। এদিকে ক্লিম গালাগাল শুরু করে দিল, যেমনভাবে সন্ধ্যাবেলায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালাগাল করতে থাকে মাতাল লোকেরা; লোকগুলো টলতে টলতে গালাগাল করে একে অন্যকে, অথবা স্রেফ কালো রাতের দিকে তাকিয়ে। এ লোকটা কিন্তু টলছিল না, কেবল গালাগাল দিয়ে চলছিল।

ক্লিম যদিও শেষ অবধি কার্তুজ বার করে অন্য একটা কার্তুজ ভরে বন্দুক বন্ধ করল, তবু রাগ তার পড়ল না। এই সময় তাকে দেখে কেন যেন ছাইরঙাটার কথাই বারবার মনে হচ্ছিল।

'আচ্ছা, এইবারে খোঁজ!' বিম্‌কে সে আদেশ দিল। 'খোঁজ রে শামলা!'

বিম্ মুখ ফিরিয়ে হাওয়ার বিপরীতে মাকুর চালে এধার ওধার করতে করতে চলতে লাগল বটে, কিন্তু ওর আর উৎসাহ দেখা গেল না — ভাবটা এই: 'আচ্ছা, বলছ যখন, খুঁজব।'

কিন্তু ওর নেংচানো দৌড়ের মধ্যে দেখা দিল কেমন যেন একটা উদাসীনতা — তিতিরগুলো ওড়ানোর আগের মুহূর্তে যে উৎসাহ ছিল তার চিহ্নমাত্র এখন আর ওর মধ্যে নেই। ক্লিম এই ঘটনাটাকে শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে করল। সে কিন্তু বুঝতে পারল না যে বিমের এহেন হাবভাবের কারণ একটাই — লোকটাকে ও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। লোকটার দিকে ও আড়চোখে তাকাচ্ছে, ঠায় দাঁড়িয়ে না থেকে তার দিকে দৃষ্টিপাত করছে, তার কাছ থেকে তফাতে তফাতে থাকছে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে। দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন শিকারের খোঁজ করছে না, স্রেফ শিকারীকে অনুসরণ করে চলেছে; কিন্তু সেটা ভুল ধারণামাত্র। শিকারী কুকুর যতক্ষণ এই পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ তার ঐকান্তিক আবেগ, তার অন্তঃপ্রেরণা অদম্য, অফুরন্ত। বিমের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিম্ আসলে ক্লিমকে অনুসরণ করছিল না, ও চলছিল ক্লিমের বন্দুককে অনুসরণ করে।

আচমকা ওর নাকে এলো খরগোশের ঘ্রাণ। ইভান ইভানভিচ বিম্‌কে নিয়ে এই জন্তু কখনও শিকার করে নি, যদিও বিম্ তাদের দেখতে পেয়ে বার দুই-তিন শিকারের সঙ্কেত জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু

স্পষ্টই দেখা গেছে এই খরগোশগুলো শিকারী কুকুরের থমকে দাঁড়ানো পর্যন্তও অপেক্ষা করে না — একটু দাঁড়িয়েছ কি অমনি সব ভোঁ ভাঁ। ওদের তাড়া করাও বারণ — প্রভুর নিষেধ। অবশ্য এটা ঠিক যে গরমকালে ওরা শিকারী কুকুরের ঐরকম সঙ্কেতের পরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। কিন্তু ইভান ইভানভিচ বিম্‌কে সব সময়ই ফেরত চলে আসতে বলত; এমন কি একবার ও যখন হাতের তালুর সমান একটা খরগোশছানাকে ধরে ফেলে তখন ইভান ইভানভিচ দেখতে পেয়ে ওর থাবার নীচ থেকে ওটাকে বার করে ছেড়ে দেয়। অতএব খরগোশকে পাখিদের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু বিম্‌ তাও নাক উঁচিয়ে খরগোশের গন্ধপ্রবাহ শুঁকল, প্রবাহ ধরে ধরে সঠিক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিকারের সঙ্কেত দিল — খারাপ থাবাটার ওপর ভর দিয়ে সামান্য কাত হয়ে দাঁড়ানো একটা ভিজে মূর্তি। না, খোঁড়া পায়ে এটাকে আর শিকারী কুকুরসুলভ সেই বিশেষ ভঙ্গি বলা চলে না। এর মধ্যে সেই শিল্পসৌন্দর্য নেই।

'ভড়্‌-কে দে...!' ক্লিম গলা ফাটিয়ে বলল।

এখানে বলে রাখা দরকার যে ভিজে আবহাওয়ার সময়, বিশেষত প্যাচপেচে জলকাদা থাকলে ত কথাই নেই, খরগোশ তার মধ্যে এঁটে পড়ে থাকে। এই কারণে বিম্‌ ওর জায়গা থেকে নড়ল না, ও যেন বলতে চাইল: এখানে চেঁচানোটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না কিন্তু!

'ভড়্‌-কে দে বলছি, খোঁড়া শয়তানের বাচ্চা!' ক্লিম গাঁক গাঁক করে উঠল।

বিম্‌ খরগোশটাকে তাড়া দিল, তারপর শুয়ে পড়ল — গুলি চলার আগে যে রকম নিয়ম।

ক্লিম তোপ দাগার মতো গুড়ুম শব্দে গুলি ছুঁড়ল। খরগোশটা ছুটতে লাগল বটে, কিন্তু তার গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ওটা বসে পড়ল, তারপর ঝপ করে চষা জমির কোন্‌ একটা খোঁড়লের ভেতরে গিয়ে গা ঢাকা দিল, চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ক্লিম ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাল।

'ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ওটাকে! ছু-ছু-ছু! ধর্‌!' বলতে বলতে সে ছুটল খরগোশটা যেখানে গা ঢাকা দিয়েছে সেই দিক লক্ষ্য করে।

ক্লিমের পাশে পাশে বিম্‌ও ছুটতে লাগল বটে, কিন্তু ও নিশ্চিত জানত যে গোটা ব্যাপারটাই নিয়মবিরুদ্ধ — কুকুরের মতো দৌড়ানো কোন শিকারীর উচিত নয়। দরকার হলে বিম্‌ নিজেই শিকার খুঁজে বার করবে, এমন কি

সেই শিকার যদি খরগোশও হয় — অবশ্য ইভান ইভানভিচ যদি ওকে আদেশ দিত।

ক্লিম হাঁপাতে হাঁপাতে শেষকালে দাঁড়িয়ে পড়ল, প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ল:

'খোঁজ, আহাম্মক! খোঁড়া শয়তান!'

বিম্ চলতে লাগল, তবে বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে। তাছাড়া খরগোশের গন্ধেও এখন আর আগের মতো আগ্রহ তার দেখা গেল না। এদিকে আহাম্মকটা আবার মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে পেছন পেছন আসছে। যাই হোক বিম্ গন্ধের সূত্র ধরে ধরে খরগোশটার সন্ধান বার করতে পেরে ফের থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিকারের সংকেত দিল, সেই বিশ্রী 'ভড়্‌কে দে' আদেশের অপেক্ষা করল, শেষকালে খরগোশটাকে তাড়া দেওয়ার জন্য জোরে সামনে ছুটে গেল। খরগোশটাও চষা জমির খোঁড়লের ভেতর থেকে ঠিক যেন বুকে হেঁটে বেরিয়ে এলো, নেংচাতে নেংচাতে এগোতে লাগল; দেখে মনে হল যেন অসুস্থ। ক্লিম গুলি করল, খরগোশও ছুট দিল। আরও একবার গুলি ছুঁড়ল, এবারে খরগোশ ধীরে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে লাগল, মাঝে মাঝে থামতেও লাগল। এক্ষেত্রে যা নিয়ম বিম্ তা-ই করল — জলকাদা থাকা সত্ত্বেও ওরই মধ্যে শুয়ে পড়ল, অপেক্ষা করতে লাগল শিকারীর আদেশের।

ক্লিম তখন গজরাচ্ছে:

'ছু-ছু, হারামজাদা! ছু, ধর্ বলছি, আহাম্মক!' খরগোশটাকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে সে বলল।

বিম্ ফের দেখতে পেল জখম হয়ে জন্তুটা কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে, তাই এবারেও সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সংকেত দিল। এই নিয়ে তিনবার! এবারেও আহাম্মকটা সুযোগ হারাল। খরগোশ ফের পালাল।

ক্লিম রাগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল, তাই তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে শিকারীর হাতে ঘায়েল হওয়া কোন জন্তুকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার শিক্ষা শামলা পায় নি, এটা যে-কোন মার্জিত রুচির 'সেটার' কুকুরের পক্ষে মর্যাদাহানিকর এবং কোন 'সেটার' কুকুরই তার মতো শিকারীকে বরদাস্ত করতে পারে না। শেষবারের মতো খরগোশটা চোখের আড়াল হয়ে যেতে (এবারে পালানোর সময় তাকে আগের চেয়ে খানিকটা বেশি চাঙ্গা দেখাচ্ছিল), ক্লিম ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এবারে বিমের

একেবারে কাছে ঘেঁষে এসে রাগে, ঘৃণায় ওর ওপরে চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ করতে লাগল; স্পষ্টই বোঝা গেল বিম্‌কে শাপ-শাপান্ত করছে।

বিম্‌ বসে বসেই মুখ ঘুরিয়ে নিল, বন্দুক থেকে দূরে সরে যাওয়ার উদ্যোগ করল। ঠিক এই সময় ক্লিম তার ভারী বুটসুদ্ধ পাটাকে পেছনে দুলিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সপাটে নীচ থেকে বিমের বুকে লাথি কষিয়ে দিল।

বিম্‌ আর্তনাদ করে উঠল। মানুষের কণ্ঠের আর্তনাদ যেমন শোনায় ওর আর্তনাদটাও তেমনি শোনাল।

'ও-ওঃ!' টানা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো বিমের কণ্ঠ থেকে, ও পড়ে গেল। 'আঃ-ওঃ!' বিম্‌ স্পষ্ট মানুষের ভাষায় বলল। 'ওঃ... কেন? কোন্‌ অপরাধে?' ও কিছু বুঝতে না পেরে অসহ্য যন্ত্রণাকাতর, ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল।

তারপর ও অনেক কষ্টে চারপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, সামান্য টাল খেয়ে আবার পড়ে গেল ধপ করে, ওর পায়ের থাবাগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'এ আমি কী করলাম!' ক্লিম নিজের মাথা চাপড়াল। 'এখন পঁচিশ রুবল গচ্চা দিতে হবে। গেল, আমার টাকা গেল!' বলতে বলতে বিমের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই যেন সে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সটকে পড়ল।

সেদিন ক্লিম গাঁয়ে দেখা দিল না, রাত না হওয়া পর্যন্ত উলটো পালটা ঘোরাঘুরি করে সময় কাটিয়ে দিল। মাঝরাতে সে সবজিবাগানের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চুপিসারে নিজের কুটিরে গিয়ে ঢুকল। ওর কুটিরটা ছিল গাঁয়ের শেষপ্রান্তে।

কিন্তু বিমের কী হল? ও কোথায়?

বিম্‌ একা পড়ে রইল ঠাণ্ডা ভিজে মাটির ওপর। সে এখন একা, বিশ্বসংসারে সম্পূর্ণ একা। আঘাতে ওর ভেতরে যেন কিছু একটা ছিঁড়ে গেছে, আর সেই 'কিছু একটা' যেন গরম গরম লাগছে, তাতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, পাঁজরা ঠেলে উঠে আসছে। ফলে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কিন্তু শেষকালে বিমের কাশি উঠল, বমি বমি পেতে লাগল, ও নিশ্বাস নিতে গেল — দেখল কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। আরও একবার হাঁ করে নিশ্বাস নিতে গেল, একটা দমকা কাশি ঠেলে বেরিয়ে এলো। অনেক কষ্টে মাথাটা

সামান্য তুলল — মাঠ দুলতে লাগল, বিমের মনে হল ও যেন বসন্তকালের জলপ্লাবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে চলেছে। বিম্ বুকে সাহস বেঁধে চেষ্টা করে উঠে বসল: মাঠ দুলছে, সূর্য দুলছে, দুলছে এমন ভাবে যেন ওটা কোন দড়িতে লটকানো।

আজ বিমের কাছ থেকে ওর সামর্থ্যের বেশি চাওয়া হয়েছিল। যা ওর কুকুরসুলভ আত্মসম্মানবোধ ও বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে, যা ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়, সে কাজই ওকে করতে হবে, সেটাই ওর কর্তব্য — এমন দাবি করা হয়েছিল ওর কাছে। এই দাবি ও পূরণ করতে রাজি হয় নি বলেই এমন নির্মম, নৃশংস প্রহারে আজ জর্জরিত হতে হল ওকে। কিন্তু লোকে যাই বলুক না কেন, যে-জন্তু ঘায়েল হয়েছে তাকে বিম্ গলা টিপে মারতে পারবে না।

'কেন? কেন? কোন্ অপরাধে?..' বিম্ মৃদুস্বরে কিঁউ কিঁউ করতে লাগল। 'কোথায় তুমি, আমার প্রাণের বন্ধু? কোথায়? কো-থা-য়?' বিমের অভিযোগের সুর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষকালে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাইরে থেকে দেখলে যে-কারও মনে হতে পারে একটা খোলা পঙ্কিল মাঠে পড়ে আছে এক মরা কুকুর। কিন্তু আসলে তা নয়।

শেষকালে বিম্ দেহের পিছন দিকটা সামান্য উঠিয়ে চার পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াল, এবারে পড়ল না। এক পা বাড়াল — না, পড়ল না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার আরেক পা বাড়াল। চষা জমিতে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে পা টেনে টেনে চলল, নিজের পায়ের ঘষায় ওর নিজের পদচিহ্নই লেপটে যেতে লাগল।

...কী অসমসাহসিকতা, কী অসাধারণ সহ্যশক্তিই না থাকতে পারে একটা কুকুরের! কী সেই শক্তি যা তোমাদের এতটা প্রবল আর দুর্ধর্ষ করে গড়ে তুলেছে যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা দেহকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পার? হোক সামান্য, কিন্তু আগে ত বটে। বাড়াতে পার আগে, সেই লক্ষ্যে, যেখানে অকলুষ হৃদয়ের এক নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, হতভাগ্য কুকুর বিশ্বাস ও সহৃদয়তার সন্ধান পেলেও পেতে পারে।

বিম্ তাই চলল। কোন রকমে হলেও চলল। ঠোঁটে রক্ত দেখা দিয়েছে, তাও চলার কামাই নেই। কাশির সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে, তবু চলছে। হোঁচট খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, তাও। শক্তি হারিয়ে ঠাণ্ডা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, ফের উঠে আরও একটু সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এক

জলস্রোতের ধারে আসার পর ও প্রাণ ভরে তৃষ্ণা মেটাল — একটু যেন হালকা মনে হল। কোথা থেকে যেন ও আভাস পেল যে জল থেকে বেশি দূরে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই সামনেই শুকনো ঘাসবিচালির যে গাদাটা ওর চোখে পড়ল সেখানে পেঁৗছে মাটি পর্যন্ত ঝুলে থাকা গাদার ভেতরে অতিকষ্টে শরীর গলিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল। অসুখবিসুখ হলে এই ভাবেই কুকুরেরা মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করে। স্বয়ং প্রকৃতিই তাদের এটা শিখিয়েছে। প্রকৃতির এই সঠিক বিধানের, তার বুদ্ধিবিবেচনার প্রশংসা করতে হয়!

বিম্ জানতে পারে নি কতক্ষণ ও এরকম অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিল, কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসতে ও বুকের মধ্যে অনুভব করল একটা তীব্র যন্ত্রণা; ওর মাথাটা ঘুরতে লাগল। এখনই কিছু একটা ঘটে যেতে পারে ভেতরে ভেতরে এই উপলব্ধি হতে বিম্ বিচালির গাদার ভেতর থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় একটু শুয়ে থাকল। ও টের পেল যে গায়ের লোম শুকিয়ে গেছে। উঠে বসল। শরৎকালের ঘাস এখন আর চোখের সামনে দুলছে না, বিচালির গাদা না, সূর্যও না — সব স্বাভাবিক। সূর্য এখন আগের চেয়ে তেতে উঠেছে, অল্পস্বল্প তাপ দিচ্ছে। বিম্ উঠে পা টেনে টেনে জলস্রোতটার কাছে গেল, আরও একবার জল খেল, খেয়ে খেয়ে যেন আর আশ মেটে না। খানিকটা জিরোয়, ফের জল খায় — এবারে অবশ্য ছোট ছোট ঢোকে। স্রোতটার সামান্য দূরে ও দেখতে পেল স্তেপের শরবন — পাতলা, এখনও সবুজ, অনেকটা লম্বা লম্বা ঘাসের মতন (হিমে খুব একটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার নয়)। বিম্ ঐ কাঁচ শর খেতে লাগল। কিসের তাগিদে দেখতে নিতান্তই সাদামাঠা ধরনের এই ঘাস খেতে বিম্ প্রবৃত্ত হল মানুষের পক্ষে তা কখনও জানা সম্ভব হবে না, কিন্তু ও ঠিকই জানত ঠিক এই জিনিসটাই খাওয়া চাই। তাই ও খেল। এর পর ওর চোখে পড়ল এত দেরিতেও, এই অসময়ে টিকে রয়েছে একটা শুকনো ডেইজি ফুলগাছ। ফুলগাছের ওপরে শরতের চাপে আধা শুকিয়ে যাওয়া কিছু ফুল লেগে রয়েছে। বিম্ ডেইজি ফুলও খেল। আরও একবার জলস্রোতটার কাছে ফিরে এসে পেট ভরে জল খেয়ে গ্রামের দিকে চলল। সমানে এগিয়ে চলল।

শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের সীমানায় যখন এসে পেঁৗছুল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। না, বিম্ গাঁয়ের ভেতরে গেল না। কী করেই বা যায়! ক্লিমও ত

ওখানেই গেছে। না না, ক্লিমের পেছন পেছন ও যাবে না। ক্লিম ঘাড়ের পটি চেপে ওকে ধরতে পারে, আর তা যদি হয়... না, সেটা চলবে না।

একটা জায়গায় শুকনো ঘাসবিচালির গাদার কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। বিম্ সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল, কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করে নিল। পাশেই একটা ভাঁটুইয়ের ডাঁটার গন্ধ পেল। ডাঁটা খেয়ে দেখল — শুকনো। ও তাই মাটির কাছ থেকে গোড়াটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে অনেকখানি গভীরে, শেকড়ের ভেতরে দাঁত বসিয়ে দিল। এটাও ওর জানা ছিল, ভাঁটুই এমনই একটা জিনিস যে খেতেই হবে।

কুকুরদের আয়ুর্বেদিক জ্ঞান ব্যাপক ও বিচিত্র। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কোন কুকুরকে রোগের শুরুতে একবার বনে ছেড়ে দিয়ে এসেই দেখুন না: দু'-তিন সপ্তাহ বাদে সে যখন ফিরে আসবে তখন তার দেহ ক্ষীণ, বেশ দুর্বল, কিন্তু ততদিনে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। কোন কুকুরের যদি পেটের গোলমাল দেখা দেয়, তাহলে তাকে বনে কিংবা স্তেপ তৃণভূমিতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দু'-তিন দিন সেখানে কাটান, দেখবেন ঘাসপাতা দিয়ে সে তার শরীর ঠিক সারিয়ে ফেলেছে। কুকুরের চিকিৎসা কী করে করতে হয় তা কুকুরের কাছ থেকেই শেখা উচিত। প্রকৃতি কুকুরের মস্তিষ্কে এত জ্ঞানসম্পদ ভরে দিয়েছে যে এই অলৌকিকত্বের পরিচয় পেয়ে মানুষের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

...রাত কেটে গেল। শরতের দীর্ঘ রাত, যে রাতে ভেতরটা বেদনায় টনটন করে।

প্রথম দফার মোরগের ডাক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার, এবং শেষ দফার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যে মোরগের ডাক শোনা যায় তার অপেক্ষায় না থেকে বিম্ উঠে পড়ল। কিন্তু বুকের ব্যথার দরুন কিছুতেই জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছিল না। তবু চেষ্টাচরিত্র করে উঠতে গিয়ে দুবার শুয়ে পড়ে ফের উঠে শরীরের আড় ভাঙল, তারপর ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।

বিম্ শরীর টেনে টেনে চলল খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচের বাড়ি লক্ষ্য করে। বাড়িতে এসে দুটো ধাপ বেয়ে দেউড়িতে উঠল, ওখানেই শুয়ে পড়ল। বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নেই।

বলা যায় না, আজ হয়ত ও এই বাড়ি ছেড়ে আদৌ যেত না। কিন্তু হঠাৎ ও দেখতে পেল বাড়ির পাশ দিয়ে, একেবারে কাছ দিয়ে ক্লিম চলেছে নিঃশব্দে, চোরের মতো গুড়ি মেরে। ওকে দেখামাত্রই বিম্ থরথর করে

কাঁপতে লাগল। বিমের তখন এমন অবস্থা যে সে তার শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত। চরম দণ্ডাজ্ঞা পাওয়ার পর আর কিছুই হারানোর আশঙ্কা না থাকায় লোকের যেমন দশা হয় বিমেরও সেই দশা। ওর মধ্যে তখন জেগে উঠেছে প্রবল আত্মসম্মানবোধ। কিন্তু ক্লিম বেড়ার খুঁটির ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, অর্ধস্ফুট স্বরে বলল:

'শামলা তাহলে এসেছে।' পরমুহূর্তেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চটপট উলটো দিকে পা চালাল। বিমের সন্ধান পেয়ে ও প্রসন্ন হয়েছে বলেই মনে হল।

লোকটা যে রকম নির্মম নৃশংসভাবে ওকে বুটের লাথি মেরেছিল তার জন্য পিছু ধাওয়া করে যে প্রতিশোধ নেবে সে শক্তি বিমের ছিল না। ঘেউ ঘেউ ডাক ছাড়ারও উপায় নেই, কেননা সে চেষ্টা করতে গেলে ভাঙা পাঁজর ভেদ করে ঘড়ঘড় আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরোবে না। কিন্তু ক্লিম হঠাৎ ফিরে এসে ওকে ধরার চেষ্টা করে এটাও ওর কাম্য নয়। তাই ও উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে আঙ্গিনার চারধারটা ঘুরে দেখল, শুয়োরের খোঁয়াড়ের কাছে শুয়োরদের, গোয়ালঘরের কাছে গিয়ে গোরুর আর ভেড়ার চালার সামনে ভেড়াদের গন্ধ শুঁকে দেখল, খানিকক্ষণ বসে থেকে তারপর গাঁয়ের ত্রিসীমানা ছেড়ে চলে গেল। অথচ ওর বন্ধু ঐ শুয়োরছানাদের পাশে শোওয়ার কী বাসনাই না ওর হচ্ছিল!

...তৃতীয় দফায় মোরগ ডেকে উঠল। ভোরের আলো ফুটে উঠল।

বড় রাস্তার দিকে চলেছে এক কুকুর। চলেছে মাথা হেঁট করে, লেজটা তার নিষ্প্রাণ হয়ে ঝুলে রয়েছে, যেমন দেখা যায় জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কুকুরের বেলায়। এই অবস্থায় বাইরের কেউ দেখলে ভাবলেও ভাবতে পারে যে কুকুরটা জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত, রোগের শেষ পর্যায়ে: এক্ষুনি বুঝি প্রথম যে বস্তুর সাক্ষাৎ পাবে তার গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হবে, মারাও যাবে। এই কুকুরটাই আমাদের বিম্, আমাদের বড় ভালো, বড় বিশ্বাসী বিম। ও চলেছে ওর প্রভু ইভান ইভানভিচের সন্ধানে। চলেছে নির্ভুল, সেই পুরনো পথ ধরে, যে পথে ওকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে।

গাঁ থেকে বাস স্টপের দূরত্ব পাঁচ-ছয় কিলোমিটার। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা যেতে না যেতে বিমের আর শক্তিতে কুলোল না, ওকে আবার থামতে হল: অনেক কষ্টে একটা শুকনো ঘাসবিচালির গাদার সামনে ও এসে পৌঁছুল। রাতের বেলায় কেউ গাদা থেকে বিচালি চুরি করার ফলে ওটাতে একটা

খোঁড়লমতন হয়েছে — তার ভেতর দিয়ে বিম্ ঢুকে গেল। ওখানে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ, প্রায় সারাদিন, তারপর সূর্যাস্তের আগে আগে বেরিয়ে এলো নিজের আশ্রয়স্থল ছেড়ে। জল পিপাসা পেয়েছে, কিন্তু ধারে কাছে কোথাও জল নেই। ব্যথাটা বুকে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে, যদিও নিশ্বাস নিতে আগের মতো ততটা কষ্ট হচ্ছে না, আর ও যখন পথ ধরল তখন মাথা ঘোরাটাও আর নেই। এবারে এক জায়গায় মিলে গেল সদাবাহার ফুলের একটা ঝাড়। এই ফুলগুলোও বিম্ খেল। হলুদ রঙের ছোট ছোট এই শুকনো ফুলগুলো ফোটার সময় থেকে শুরু করে পরিপূর্ণতার সময় পর্যন্ত এবং তার পরেও, বসন্তকালের আগে পর্যন্ত পুরো শীতকাল তাদের রঙ পালটায় না। ডেইজী ফুলের একটা ঝাড়ও ওপড়াল, কিন্তু এই ফুলগুলো বড় বেশি পেকে গেছে, তাই ঝুরঝুরে হয়ে গলার ভেতরে ঢুকে খুসখুস করতে লাগল, এর ফলে আরও বেশি জল পিপাসা পেয়ে গেল। ও যখন একটা মেঠো রাস্তা পার হচ্ছিল তখন গাড়ি চলাচলের ফলে বসা একটা জায়গার মধ্যে বরফগলা জলের ছোট্ট একটা ডোবা ওর চোখে পড়ল। বিমের জন্য পথ সযত্নে জল রেখে দিয়েছে। বিম্ আকণ্ঠ জল পান করে একটু একটু করে এগিয়ে চলল।

বড় রাস্তার ওপর পৌঁছুতে পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে এলো। কিছুক্ষণ বসে বসে চোখের দৃষ্টিতে কয়েকটা মোটরগাড়ি আর তাদের চোখধাঁধানো হেডলাইটের গতিবিধি অনুসরণ করল। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল কোন্ দিকে যেতে হবে ওকে। কিন্তু রাতের বেলায় ত আর যাওয়া চলে না! হঠাৎ যদি ক্লিমের আবির্ভাব ঘটে? কিংবা ঐ ছাইরঙার? অথবা নেকড়ের?

বিম্ ঠিক করল মোটরগাড়ি চলাচলের রাস্তা ছেড়ে দূরে সরে না গিয়ে রাতটা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে কাটিয়ে দেবে। ও ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বাস স্টপে গিয়ে পৌঁছুল। সেখানে ছিল একটা ছোট্ট বাড়ি। বাড়িটার একদিকের একটা দেয়াল নেই, তবে ভেতরে চওড়া চওড়া কয়েকটা বেঞ্চ আছে। সেখানে একটা বেঞ্চির নীচে এক কোনায় গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল।

অসম্ভব রকমের দুর্বল হয়ে পড়লেও সারা রাত ও চোখের পাতা ফেলতে পারল না। পাশ দিয়ে একের পর এক মোটরগাড়ি চলেছে ঘর্ঘর শব্দে — রাতের বেলায়ও রাস্তাটা প্রাণবন্ত। যে বাস স্টপে বিম্ আশ্রয় নিয়েছিল

একটা বাস তার সামনাসামনি এসে গতি মন্থর করে দিল। কিন্তু সেখানে কোন যাত্রী না থাকায় বাস এগিয়ে গেল।

রাতটা অসুস্থতা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হলেও গরমের আমেজ ছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে শরৎ আরও একবার শীতকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

* * *

কিন্তু বিম্ এই যে দুটো দিন অনুপস্থিত এই সময়ের মধ্যে গাঁয়ে কী ঘটল?

খিদ্রসান আন্দ্রেয়েভিচ ও পেত্রোভ্না যখন বাজার থেকে ফিরে এলো ততক্ষণে বিকেলের আলো পড়ে এসেছে। আলিওশা বাড়ি নেই, দরজায় তালা লাগানো। ওরা দুজনে নিজেদের চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। শহরের বাজারে বিক্রি করে যা টাকাকড়ি পেয়েছে সেগুলো গুনল, পর দিন ব্যাঙ্কে জমা দেবে বলে তখনকার মতো সিন্দুকে ভরে রাখল। ঠিক এই সময় আলিওশার আবির্ভাব।

'কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলি?' বাপ জিজ্ঞেস করল।

'ক্লিমের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'ও কি শামলাকে ফিরিয়ে আনে নি?'

'এখনও শিকার থেকে ফেরে নি।'

'আসবে। এলেই নিয়ে আসবে — যাবে কোথায়?' আলিওশার গায়ে একটা নতুন সোয়েটার পরিয়ে মাপে ঠিক আছে কিনা দেখতে দেখতে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল পেত্রোভ্না।

খিদ্রসান আন্দ্রেয়েভিচ সন্দিগ্ধ স্বরে বলল:

'সেটা অবশ্য ঠিকই, তবে কিনা জানই ত ক্লিম হল গে একটা চোর।... কেবল যৌথখামারের জিনিস নিলেও না হয় বুঝি — ওটা কারও সম্পত্তি নয়; কিন্তু না তা ত নয়, খামারের চাষী-সদস্যদেরও মাল সাফ করে দেয়। ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা মোটেই একটা সুখের ব্যাপার নয়। ওকে সবাই ভয় পায়। জাহান্নামে যাক ক্লিমটা, শামলাকে কখন-সখন শিকারে নেয় ত নিক গে — এর চেয়ে বেশি কিছু যেন আমার কাছ থেকে আশা না করে।'

'যৌথখামারের জিনিস কারও সম্পত্তি নয় এমন কথা বলছ কেন? ওটাও ত আমাদেরই?'

'হ্যাঁ তা ত বটেই... কথাটা বুঝলি কিনা, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে... ঠিকই বলেছিস তুই — আমাদের।... তবে হ্যাঁ, তোকে ঠিক বুঝিয়ে বলব কী করে? আমাদের যেটা সেটা আমাদেরই বটে, কিন্তু এখানে যা আছে সে হল আমাদের নিজেদের। এই যেমন ধর্ না, ইস্কুল হল আমাদের, ছেলেপুলেরাও সব আমাদের, কিন্তু তুই হলি গিয়ে আমার। তেমনি বলা যায় খেত আমাদের, কিন্তু এই জমিটুকু আমার নিজের। গোরু-ভেড়ার ক্ষেত্রেই তাই — যেমন আমাদের আছে, তেমনি আছে আমার নিজের। বুঝলি?'

'হ্যাঁ বুঝলাম। এটা আর না বোঝার কী আছে? কিন্তু তুমি বললে কিনা 'কারও নয়'।'

'হ্যাঁ, তা তুই ঠিকই বলেছিস। একেবারে কারও নয় এমন কোন জিনিসই থাকতে পারে না।'

আলিওশার সঙ্গে বাবা সব সময় এমন ভাবে কথা বলত যেন ও একটা বয়স্ক লোক; আর আলিওশা উত্তরও দিল সেই সেই রকম:

'তার মানে এই যে যেটা আমাদের সেখান থেকে ক্রিম যদি কিছু নেয়ও তাতে তেমন কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যত আপত্তি আমার জিনিসে যদি ভাগ বসায় তার বেলায়?'

'আসলে বলতে গেলে তা-ই দাঁড়াচ্ছে,' বাবা ওকে নিজের সিদ্ধান্ত জানাল। 'এই ধর্ না কেন আমি তুই — আমরা গোরুর জন্য খড়টা-বিচালিটা, নয়ত বীট — এই রকম ছোটখাটো কত জিনিসই ত নিই। তাই না? খামারের সভাপতিমশাইকে না বলেই নিই, অবশ্য নিই একটু-আধটু। তা সে সভাপতিমশাই নিজেও জানেন, সর্দার-কর্মীও জানে; কেই বা না জানে? এছাড়া কোন উপায়ও নেই — নিই আমাদের জিনিস থেকে। নেওয়ার সময় আমরা নিজেদের বিবেকবুদ্ধির সীমানা ছাড়িয়ে যাই না; নিই গত বছরের পুরনো ঘাসবিচালির গাদা থেকে, বীট নিলেও নিই তার ঝরতি-পড়তি অংশ। না নিয়েই বা উপায় কী? গোরু ভেড়াগুলোকে ত খাওয়াতে হবে, জাবনা দিতে হবে।'

'আসলে বলতে গেলে তা-ই দাঁড়াচ্ছে,' তেরো বছর বয়সের খুদে চাষীটির উত্তর। এই খুদে চাষীটি অবশ্য এখনই ভেড়ার পাল চরাতে পারে, 'নিজের' গোরু-ভেড়ার যত্ন নিতে পারে, সময় থাকলে মাখন তোলার কাজে মাকে সাহায্য করতে পারে; আর ঠাণ্ডার মধ্যে 'আমাদের' বীট কাটাছাঁটার কাজ, কিংবা 'নিজের' খেতে আলু চাষ করা — সে ত পারেই।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ আরও স্পষ্ট করার জন্য বলল:

'আইনে যা বলা আছে আমরা সবাই তা মেনেই কাজ করি। ওটা আমাদের, আর এটা আমার। এই দ্যাখ না, আমি আজ একটা ভেড়া শহরের বাজারে নিয়ে গেলাম। নিয়ে যাবই বা না কেন? লোকজনকে খাওয়াতে পরাতে হবে ত — এই জন্যই না আমরা আছি। তোর মাও কিছু ডিম আর মাখন নিয়ে গেল। সবই যৌথখামারের নিয়মকানুন মেনে, পরিকল্পনা মাফিক। জীবনটা, আলিওশা, বেশ ভালোই চলছে রে। আমাদের পায়ের জুতো আছে, গায়ের জামা আছে — আর সেসব স্কুল মাস্টার বা খামারের সভাপতিমশাইয়ের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। আমাদের টেলিভিশন বা ঐরকম আরও নানা জিনিস আছে, যতটা দরকার ততটা টাকাকড়িও আছে। আর আমাদের যে প্রচুর খাটতে হয় এতে খারাপ ত কিছুই নেই, বরং আমাদের শরীর মজবুত হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, ভোদকা-টোদকা না খাওয়াই উচিত।' এই বলে উপদেশের ভঙ্গিতে তার বক্তব্য শেষ করল খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ।

'অথচ তুমি নিজে খাও,' আলিওশা যুক্তিসম্মত মন্তব্য করল। 'খাওয়া যখন উচিত নয় তখন না খাওয়াই ভালো। এতে লাভটা কী?'

'কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস,' আলিওশার বাবা স্বীকার করল। 'কিন্তু আমাদের কর্মিদলের যে সর্দার তাকে ত সম্মান দিতেই হয়। তবে এই রেওয়াজ আমরা শুরু করি নি। ...আর ক্লিমের কথা যদি বলিস... ওটা কে? ওটা একটা চোর। পড়শীর বাড়ি ঢুকে মুরগী চুরী — এটাকে আর কী বলা যায়? কোন বিবেকের বালাই না থাকলেই এমন কাজ করা সম্ভব। বিবেক না থাকলে মানুষের আর কী রইল! সে লোকের হয়ে গেল।'

শামলার অপেক্ষা করতে করতে আলিওশা আর খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ এই রকম নানা কথাবার্তা বলে রাত্ত এগারোটা অবধি কাটিয়ে দিল। এর পর ওরা আঙিনার চারপাশ ঘুরে দেখল, শুয়োরছানাদের খোঁয়াড় আর দেউড়ির নীচে উঁকি মেরে দেখল (বলা যায় না হয়ত ক্লিমের কাছ থেকে পালিয়ে এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে)।

শেষকালে খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ নিজেই ক্লিমের বাড়ি গেল।

ক্লিমের বউয়ের নাম নাতালিয়া। শান্ত স্বভাবের স্ত্রীলোক, স্বামীর অত্যাচারে সদা তটস্থ। একেই আমরা দেখেছিলাম বীট কাটাছাঁটার সময় চোখের জল ফেলতে। বিলাপের সুরে সে জানাল:

'ভবঘুরেটা এখনও ফেরে নি। কোথায় কোন্ ভাগাড়ে গিয়ে রাত কাটাচ্ছে জংলী ভূতটা। নয়ত হতভাগা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। হায় রে, আমার দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলি! এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে মদো-মাতালটা কালকের আগে ফিরছে না। তবে কুকুর ও কোথাও ফেলে আসবে না, ওকে আমি জানি। ঠিক নিয়ে আসবে।'

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ বাড়ি ফিরে এলো, ক্লিমের বউ যা যা বলেছিল সবই জানাল এসে, তারপর বাপ বেটায় নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। কথাবার্তা চলতে লাগল ফিসফিসিয়ে, যাতে আলিওশার মার ঘুম না ভেঙে যায়। এদিকে শামলা যে কখন দেউড়িতে এসেছিল, কখন যে ক্লিম গুড়ি মেরে ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে তারপর পালিয়ে যায়, কখন যে নিষ্ঠুর লোকটার ভয়ে ওদের এত ভালো, নতুন বন্ধুটি ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এসব কিছুই ওরা টের পেল না।

সকালে বাপ আলিওশার ঘুম ভাঙাল:

'উঠে পড়্! দেউড়িতে নতুন পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে — শামলা ফিরে এসেছে।'

ওরা দুজনে মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল, ডাকাডাকি করল, শিস দিল, কিন্তু শামলা তখন অনেক দূরে চলে গেছে, ওদের ডাক আর ওর কানে যাওয়া সম্ভব নয়। খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ প্রায় পড়িমরি করে ছুটে এলো ক্লিমের বাড়িতে। ক্লিমকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল।

'নিয়ে এসেছি, ফেরত নিয়ে এসেছি,' ভারী ফ্যাঁসফেঁসে গলায় অসন্তুষ্টস্বরে সে বলল। 'মাঝরাতে ফেরত নিয়ে রেখে এসেছি। তোমাকে আর ডেকে তুলে বিরক্ত করতে চাইলাম না। ...যদি চাও ত পায়ের চিহ্নও দেখাতে পারি। দেখ দেখি, আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে, মেজাজটাই খিঁচড়ে দিলে। তোমার কি মনে হয় এটা একটা মানুষের যুগ্যি কাজ করা হল? তাছাড়া হ্যাঁ বলে রাখি, তোমার ঐ কুত্তাটা বাপু শিকারের পক্ষে একেবারেই অচল। আমার বয়েই গেছে ওকে নিতে! আর কখনও বাপু শিকারে নিয়ে যাচ্ছি না, বলে রাখলাম।'

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ ওর সঙ্গে কোন তর্কবিতর্ক করল না — এসব লোকের পাল্লায় একবার পড়লে আর দেখতে হচ্ছে না।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ আর আলিওশা গোটা গাঁ, গাঁয়ের সমস্ত সবজি

বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল যৌথখামারের আঙ্গিনাও খুঁজে দেখল (এমনও ত হতে পারে যে শামলা ওখানে অন্য কুকুরদের দলে গিয়ে ভিড়েছে)। না, কেউই বলতে পারল না শামলা কোথায়। কেউ তাকে দেখে নি। শামলা নিরুদ্দেশ।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ মনে মনে আঁচ করল:

'বোঝাই যাচ্ছে ক্লিম ওকে মারধোর করেছিল আর তাইতেই শামলা পালিয়ে গেছে।'

দুঃখে বেদনায় আলিওশার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে দেউড়ির মেঝে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। পায়ের দাগগুলো ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু শামলা যেখানে শুয়ে ছিল সেই জায়গাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আলিওশা ঝুঁকে পড়ে দেখেই আচমকা চিৎকার করতে করতে বাড়ির ভেতরে ছুটল:

'বাবা, বাবা! রক্ত!'

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচও চিৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে এসে ভালো করে দেখতে লাগল: শামলার মাথাটা যেখানে ছিল সেখানে লালা মেশানো রক্তের শুকনো দাগ রয়ে গেছে।

'জানোয়ার কোথাকার!' খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ বলল। তারপর একটু ভেবে আলিওশাকে সাবধান করে দিয়ে বলল: 'দেখিস এই লোকটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাস নে — বিপদে পড়বি। আমি যা বলি শোন্ — আয়, শামলা যে পথ ধরে গেছে সেই পথ ধরে আমরা চলতে থাকি — ওর যাবার এই একটাই রাস্তা।'

ওরা রাস্তার ওপর দিয়ে শামলাকে ডাকাডাকি করতে করতে, ওর খোঁজখবর করতে করতে বাস স্টপ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল। অনেকক্ষণ সেখানে ওর অপেক্ষায় থেকে থেকে শেষকালে বাড়ি ফিরে গেল। ওরা এটাই ধরে নিল যে এই পর্যন্ত যদি আসতেই পারে, তাহলে এতক্ষণে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে। আসলে কিন্তু বিম্, ওদের শামলা যেখানে বিশ্রাম করার জন্য শুয়েছিল সেই বিচালির গাদা থেকে ওরা সেদিন খুব একটা দূরে ছিল না।

সন্ধ্যাবেলায় আলিওশা কয়েকবার দেউড়িতে বেরিয়ে এসে অপেক্ষা করল, ডাকল। তারপর বাড়ির বারবারান্দায় ফিরে এসে শুকনো ঘাসবিচালিতে ঠাসা কুকুরঘরের সামনে বসে পড়ে কাঁদতে লাগল — কাঁদল একটা ছোট

বাচ্চার মতো গলা ছেড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বাঁধভাঙা চোখের জলে মাখামাখি হয়ে গেল জামার আস্তিন।

খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ ওর কান্না শুনে বারবারান্দায় বেরিয়ে এলো। আলো জ্বালল।

'তুই কি ওই জন্য কাঁদছিস নাকি রে অ্যাঁ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।' আলিওশা জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বাপ তার কাঠের মতো শক্ত খরখরে হাত ছেলের মাথার চুলে বুলোতে বুলোতে বলল:

'তুই বড় ভালো ছেলে রে আলিওশা। তোর মনে দয়ামায়া আছে...'

পেত্রোভ্‌নাও বেরিয়ে এলো।

'শামলার জন্যে দুঃখ হচ্ছে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ মা... দুঃখ হচ্ছে, বড় দুঃখ হচ্ছে!'

'মন খারাপ ত হওয়ারই কথা গো,' রুদ্ধস্বরে সে বলল খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচের দিকে ফিরে। 'কী আর করবি রে এখন, আলিওশা। ...যা হওয়ার হয়ে গেছে। বড় দুঃখের কথা...'

... এই সব ঘটনা যখন ঘটছিল তখন বিম্‌ বাস স্টপের চালার ভেতরে একটা বেঞ্চির তলায় শুয়ে ছিল।

বিম্‌ শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল কেবল একটা জিনিসের — কখন ভোরের আলো দেখা দেবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বনের হাসপাতাল। মা আর বাবা। বনে বজ্রবিদ্যুৎ

ভোরের আলো ঝলমল করে উঠতেই বিম্‌ উঠে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কাজটা সহজ নয়, প্রায় অসম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, সেই যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে ছিল তা থেকে আড় ভেঙে ওঠাই এখন দুঃসাধ্য। ভেতরে কী যেন একটা এঁটে জমাট বেঁধে লেগে আছে। ঠিক কুকুরের স্বভাবমতো নয়, মুরগী যেমন তার ডানার নীচ থেকে পা বার করে তেমনি ভাবে সে আস্তে

আস্তে কোনরকমে প্রথমে পেছনের একটা ঠ্যাঙ ছড়াল, তারপর আরও একটা। পেছনের দুই ঠ্যাঙ দেয়ালে ঠেকিয়ে বেঞ্চের তলা থেকে বেরিয়ে এলো। একটুখানি শুয়ে থাকার পর চালার ভেতর থেকে গুড়ি মেরে বাইরে চলে এলো। উঠে বসল। ঝিম-ধরা পাগুলো আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে লাগল। ব্যথাটা দমন করতে করতে এবং ক্ষীণকণ্ঠে কিঁউ কিঁউ আওয়াজ করে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ও চলল — প্রথম প্রথম চলতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, পায়ের থাবাগুলো মাটিতে ঘসটে ঘসটে চলতে হচ্ছিল, পরে পদক্ষেপ ক্রমেই বেশি করে মজবুত হতে লাগল।

খানিকটা দুলকি চালে চলার চেষ্টা করে দেখল — তাতে বুকের ভেতরের ব্যথাটা একটু কম লাগে। ও তাই এখন থেকে ধীরে ধীরে হালকা কদম ফেলে ফেলে দুলকি চালে চলতে শুরু করল। বাইরের কেউ দেখলে নির্ঘাত ভাববে কুকুরটা না দৌড়াচ্ছে, না চলছে, যেন পাগুলো কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে পাকিয়ে পাকিয়ে চালাচ্ছে যার ফলে শরীর প্রায় দুলছেই না বললে চলে। এই ভাবে চলতে ওর অনেকটা সহজ লাগছিল। ও টের পেল যে ঘাসপাতা ও খেয়েছিল তার ফলে এবং এই ভঙ্গিতে চলার ফলে মোটের ওপর বেশ স্বচ্ছন্দ লাগছে। ও এখন তাই বড় রাস্তার কিনারা ধরে পায়ে পায়ে সমানে এগিয়ে চলতে লাগল।

যে-দিক থেকে মোটরগাড়ি আসছিল তার উলটো দিক ধরে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে ও চলল। 'সোভিয়েত ইউনিয়নের পথ চলাচলের নিয়মকানুন' ওর নিশ্চয় জানা ছিল না, উলটো দিক থেকে যে-সমস্ত মোটরগাড়ি আসছিল তাদের ড্রাইভাররা নিখুঁত আইন মাফিক চলা দেখে যা-ই ভাবুক না কেন আসলে কিন্তু এর মধ্যে যুক্তিতর্ক বা লক্ষ্যনিষ্ঠার কোন বালাই ছিল না। স্রেফ ওর সহজাত বুদ্ধি ওকে বলে দেয় এই পথে ওরা ওকে এখানে নিয়ে এসেছিল, তাই এই পথেই ওকে ফিরে যেতে হবে। চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে এক পলকের জন্য ওর ওপর চোখ পড়লে লোকে না ভেবে পারবে না: 'ওঃ কী বুদ্ধিমান কুকুর! অসুস্থ হলে কী হবে, পথ চলার নিয়মকানুন কেমন মেনে চলছে দেখ।' আসলে কিন্তু এই সব নিয়মকানুন যে নিরাপত্তার দাবিই পূরণ করে একথা প্রমাণ করার জন্য বড় রকমের কোন বুদ্ধিবিবেচনার দরকার হয় না।

বিম্ অনেকক্ষণ ধরে খুট খুট করে চলতে লাগল — তিনঘণ্টা হতে পারে, চারঘণ্টাও হতে পারে (মাঝে মাঝে ওকে যে থামতে হয়েছে, শুয়ে

বিশ্রাম করতে হয়েছে সে সব ধরলে অবশ্য আরও বেশি)। ওর চলার বেগ পথচারীদের চলার বেগের চেয়ে বেশি ছিল না, যদি হয়ও যৎসামান্য বেশি হতে পারে। কিন্তু সেটাও মন্দের ভালো।

এই রকম চলতে চলতে এক সময় বিমের নিজেরই চমক লাগল যখন ও চিনতে পারল সেই বাস স্টপ, যেখানে প্রত্যেকবারই শিকার শুরু করার আগে ও আর ইভান ইভানভিচ বাস থেকে নেমে পড়ত। হ্যাঁ, ঠিক চিনতে পেরেছে!

চালাটার সামনে লোকজন বাস-এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বিম্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, লোকজনের কাছাকাছি না গিয়ে মোড় নিল বাঁয়ে, যে-রাস্তা দিয়ে ওরা শিকারের জন্য বনে যেত সেই দিকে। কেউ কেউ ওর পেছন পেছন শিস দিল, কেউ কেউ তু-তু করে ডাকল, কেউ বা চেঁচিয়ে বলল: 'পাগলা কুকুর!' বিম্ কান দিল না এমন কি ও পায়ের গতি বাড়িয়ে দ্রুত তালে চলার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, গতিবেগ ত বাড়লই না উলটে চলা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

সবচেয়ে বড় কথা, যেতে হবে ঐ দিকটায়। ওখানে, যেখানে ইভান ইভানভিচ সম্ভবত কিছুদিন আগেও এসেছিল, নয়ত শিগগিরই আসবে। আগে, আরও আগে বাড়তে হবে।

বিম্ দুলকি চালে চলল বনের দিকে। বনের কিনারায় এসে দাঁড়াল, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। কিছুটা দূরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে বার করল বনের ভেতরকার সেই পরিচিত ফাঁকা জায়গাটা, সেখানে একটা কাটা গুঁড়ির সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জায়গা থেকে না নড়েই নাক দিয়ে চারপাশটা পরখ করে দেখল, ঐ গুঁড়িটার চারধার ঘুরে ঘুরে মাটির খুব কাছাকাছি জায়গা শুঁকে দেখল। তারপর হঠাৎই কী যেন এক দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাটা গুঁড়িটার পাশে ঝরা পাতার রাশির ওপর লুটিয়ে পড়ল। এখানে, ঠিক এই জায়গাটায়ই ইভান ইভানভিচ বরাবর শিকারের আগে এসে বসত। বিম্ মাথাটা আগে বাড়িয়ে দিয়ে হলুদ ঝরা পাতার রাশির গায়ে সেই জায়গাটার ওপর সমানে গা ঘষতে লাগল যেখানে এক সময় ওর বন্ধুর পা পড়েছিল। অবশ্য তার সমস্ত গন্ধ সেই কোন্ কালে উবে গেছে।

দিনটা ছিল গরম, চমৎকার গরম!

* * *

কখন-কখন শরতের শেষে, এমন কি শীত শুরু হয়ে যাবার পরও গ্রীষ্মকাল ফিরে এসে প্রস্থানোদ্যত শরৎকালকে তার আগ্নেয় পুচ্ছ দিয়ে আঁকড়ে ধরে। শরৎ তখন বিগলিত হয়ে পড়ে, কোন মহিলা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আদরে গলে গিয়ে কুকুর যেমন চুপচাপ সুখ উপভোগ করতে থাকে তারও তখন সেই অবস্থা। এই সময় ঝরাপাতা, বনগোলাপের রক্তিম ফল আর পীতাভ বুনো ফলের, লঙ্কার মতো ঝাঁঝাল ও তীব্র বুনো আদার এবং ঐরকম আরও নানা ফলের বিদায়ী সৌরভে বনভূমি আমোদিত। সাদা ব্যাঙের ছাতায় কারও হাতের স্পর্শ লাগে নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেগুলো ঝুরো ঝুরো হয়ে ভেঙে পড়েছে, জলে ফুলে টসটস করছে, তবু সৌরভ যায় নি, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বিগত ঋতুর অতীত গৌরব। সারা বনভূমি জুড়ে পাইন থেকে বার্চ গাছে, বার্চ গাছ থেকে ওক গাছে বয়ে চলেছে এক মিষ্টি মধুর ঘ্রাণ। এদিকে ওক গাছ বনপ্রান্তরের শক্তি ও দৃঢ়তার, চিরন্তনতার প্রবল গন্ধ ঢেলে তার জবাব দিচ্ছে। অরণ্যের গন্ধের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা শাশ্বত ও অবিনশ্বর। এটা বিশেষভাবে অনুভব করা যায় প্রস্থানোদ্যত শরতের বিদায়কালীন উষ্ণ, কোমল ও মধুর শেষ দিনগুলোতে। শরৎ তখন বিরক্তিকর বর্ষণ, প্রথম হিমের প্রবল ধাক্কা আর তুহিনের সর্বব্যাপ্ত ছুঁচের প্রবল দৌরাত্ম্য কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সব কেটে গেছে, অতীত হয়েছে। দেখে মনে হয় শরৎ বুঝি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে গ্রীষ্মের স্বপ্ন দেখেছে, আর সে যেন তার ঐ দৈবী কল্পদৃশ্য, সেই দৃশ্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমা, ধরণীর প্রাণদায়িনী সুরভী আমাদের সামনে মেলে ধরছে। সেই মানুষই ধন্য যে আশৈশব এসবের রসাস্বাদন করতে পেরেছে, আমাদের আত্মার মুক্তির জন্য প্রকৃতি যে পাত্র আমাদের দান করেছে তা থেকে এক বিন্দুও মাধুরী না ছলকে ফেলে জীবনভর তাকে বহন করতে পেরেছে!

বনের মধ্যে এই সমস্ত দিনে হৃদয় সব কিছুর প্রতি ক্ষমাশীল হয়ে পড়ে, আর সেই সঙ্গে তার নিজের কাছে মানুষের নিজের দাবি বেড়ে যায়। মানসিক এক প্রশান্তিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। শরৎকালীন স্বপ্নদর্শনের এই সুগম্ভীর মুহূর্তগুলিতে বড় বেশি করে সাধ হয় যেন এই পৃথিবীতে মিথ্যা ও মন্দের কোন অস্তিত্ব না থাকে। আর প্রস্থানোদ্যত

শরতের নিস্তব্ধতার মধ্যে, আসন্ন শীতের কথা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হয়ে শরতের মধুর তন্দ্রাবেশে আচ্ছন্ন এই দিনগুলিতে মানুষ বুঝতে শুরু করে এখানে থাকা চাই শুধুই সত্য, শুধুই মর্যাদা, শুধুই শুদ্ধ বিবেকবুদ্ধি। আর এসবের জন্যই দিতে হবে প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি দিতে হবে মানবশিশুদের কাছে, যারা ভবিষ্যতে বড় হবে, প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বয়স্কদের কাছে, যারা এখনও ভোলে নি যে এককালে তারাও শিশু ছিল।

হয়ত সেই কারণেই আমি লিখছি এক কুকুরের ভাগ্যের কাহিনী, তার বিশ্বস্ততা, আত্মসম্মানবোধ ও নিষ্ঠার কথা। আমি লিখছি সেই কুকুরটির কথা, যে শরতের ঐ ঈষদুষ্ণ সুন্দর দিনটিতে বনের মধ্যে কাটা গুঁড়ির পাশে লুটিয়ে পড়ে ছিল ভগ্নহৃদয়ে।

* * *

এই ভাবে, প্রকৃতির এক সুখী দিনে বনের মধ্যে পড়ে ছিল আমাদের হতভাগ্য বিম্। দিনটি ছিল — ওঃ ভগবান! — কী সুন্দর উষ্ণই না ছিল!

কিন্তু জমি ঠান্ডা। তাই বিম্ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে ছিল কাটা গুঁড়ির পাশে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন শুয়ে আছে ওর প্রভুর পদতলে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর উঠে পড়ল, ধীরে ধীরে বনের ভেতর দিয়ে কিসের যেন সন্ধান করতে করতে এগিয়ে চলল। হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল। একটা সদ্যপতিত কালো পপলার গাছের সামনে এসে ও গাছের সুস্বাদু, রসাল বাকল কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। এই বাকল এল্‌ক হরিণের প্রিয় খাদ্য। কালো পপলারের বাকলও যে ওর পক্ষে উপকারী, বলকারক এটা কি বিম্ অনুমান করতে পেরেছিল?

প্রসঙ্গত, মানুষের পক্ষে হয়ত বোঝা সম্ভব নয় যে কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অতি সূক্ষ্ম বলেই সম্ভবত কোন্ জিনিসটা উপকারী আর কোন্‌টা অপকারী, গন্ধের সাহায্যে তার তফাত সে ধরতে পারে। তাই ত বিম্ বিষাক্ত বুনো আদা খেল না, অথচ ভালেরিয়ানের শেকড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই শেকড়ের গন্ধ কুকুর আর বেড়ালের এত পছন্দ কেন? এটাও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু বিম্ তার পায়ের থাবা দু' একবার চালিয়ে ভুসভুসে পাতায় ঢাকা নরম মাটি কুপিয়ে শেকড় বার করল, কামড়ে ছিঁড়ে

নিয়ে খেয়ে ফেলল। আরও কিছুটা খেল। এই গাছের শেকড় প্রায় মাটির ওপরেই থাকে — বার করতে অসুবিধা হয় না। ও ঠিক যতটা দরকার ততটাই খেল, তার চেয়ে একটুও বেশি খেল না। তারপর একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে যেন পা দিয়ে মাটি চেপে চেপে সমান করে বিছানার আয়োজন করতে লাগল। কিন্তু জায়গাটা শেষ পর্যন্ত ওর পছন্দ হল না (কেন যে পছন্দ হল না বোঝা গেল না)। একটা ছোটখাটো চক্কর মারল, চক্করটাকে চেপে আরও ছোট করে আনল, পরে ওখানে চুড়োচুড়ি পাতায় ঢাকা যুদ্ধকালীন এক পুরনো পরিখা দেখতে পেয়ে তার ভেতরে নেমে গেল। সেখানেও কিছুক্ষণ এক জায়গায় পাক খেল। শেষ পর্যন্ত পায়ে মাটি চেপে চেপে একটা বেশ গভীর ও নরম শয্যা তৈরি করে ফেলল, কিন্তু শোওয়ার ইচ্ছে দেখা গেল না, দেখেশুনে মনে হল ও যেন ঘুমের বিরুদ্ধে যুঝছে। তা সত্ত্বেও এক সময় হঠাৎ ধপ্ করে বিছানায় পড়ে গেল এবং অচিরেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ভালেরিয়ানের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। তাম্বোভ প্রদেশে অবশ্য এই গাছের স্থানীয় নাম আছে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, কোন প্রদেশে কোন জেলাতেই কোন সুস্থ কুকুর কস্মিনকালে এর শিকড় খায় নি, এর গায়ে নাক যদিও বা ঘসে ভুলেও কখনও খাবে না। অথচ অসুস্থ কুকুরে খেয়ে থাকে। বিম্ মার্জিত রুচিসম্পন্ন হলে কী হবে এদিক থেকে কিন্তু আর দশটা কুকুরের সঙ্গে ওর কোন তফাত নেই। ও তাই ভালেরিয়ান খেল। খেয়ে এখন ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ চুপ করে থাকুন, মুখ বুজে থাকুন। ঐ গর্তের মধ্যে ঘুমোচ্ছে আমাদের বড় ভালো, চমৎকার কুকুর বিম্।

গত তিন দিন হল বিম্ গাছগাছড়া ছাড়া আর কিছুই খায় নি, ব্যথা-বেদনায় ও দুর্ভাবনায় ঘুমোতে পারে নি, সম্ভবত এত গভীর নিদ্রা বহুকাল ওর হয় নি। গর্তের ভেতরটা গরম, কোন সাড়াশব্দ নেই সেখানে। শরৎকালের বনভূমি তার স্বাভাবিক শান্তিময়তা দিয়ে অসুস্থ বিমের শান্তি রক্ষা করছে, সঞ্জীবনী বায়ুপ্রবাহ আর নিজের ওষধি দিয়ে ওর চিকিৎসা করছে। হে অরণ্য, তোমাকে ধন্যবাদ!

বিমের যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ও গর্তের বাইরে চলে এলো। চলতে যদিও কষ্ট হচ্ছে, তবু এখন অনেকটা সহজ, সকালের তুলনায় বেশ সহজই বলতে হয়। ভেতরটা এখন হালকা লাগছে। কেবল অসুবিধা

এই যে শরীরে এখনও বল নেই। বিম্‌ ওর প্রিয় গুঁড়িটার কাছে চলে গেল, কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার ফিরে গেল নিজের আস্তানায়। আবার বসে রইল। আবারও চারদিক শুঁকে পরীক্ষা করল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল: সব সুনসান। ফের শুয়ে পড়ল দিব্যি আরামের, গরম-গরম গভীর খোঁড়লটার ভেতরে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিম্‌ নিশ্চয়ই সুন্দর কোন স্বপ্ন দেখছিল। নির্ঘাত দেখছিল, কেননা ঘুমের মধ্যে ওর লেজ সামান্য, মৃদু মৃদু নড়ছিল।

এই ভাবে ও সারা রাত পড়ে পড়ে ঘুমোল। শীতের কোন অনুভূতি ওর ছিল না।

খুব ভোরে একটা মৃদু খসখস শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। মাথাটা সামান্য ওপরে তুলে কান পাতল: পাতার স্তূপের মধ্যে কে যেন কী হাঁটকাচ্ছে। বিম্‌ বাইরে বেরিয়ে এলো, প্রবাহরহিত বায়ুর বিরল সূক্ষ্ম ধারার মধ্যে নাক বাড়িয়ে দিয়ে পাঠ করল, নিশ্চিতরূপে জানতে পারল ওটা কী। বনমোরগ!

শিকারের দুর্নিবার প্রেরণায় ওর দুর্বল শরীর টানটান হয়ে উঠল, ভেতরের চাপা যন্ত্রণাটা দমে গেল। বনমোরগটা পাঁচ কদমের বেশি দূরে ছিল না। সে তার পায়ের থাবা দিয়ে পাতার রাশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফাঁকের ভেতর দিয়ে নরম মাটির মধ্যে ঠোঁট গলিয়ে দিচ্ছিল, যেখানে কেঁচো আছে ঠিক সেই জায়গায় তাক করে কেঁচো উঠিয়ে উঠিয়ে দিব্যি কপাকপ খেয়ে চলছিল। পাখিটার একটা ডানা মাটিতে হেঁচড়াচ্ছে (কোন আনাড়ি শিকারীর হাতে ঘায়েল হয়েছে। এ ধরনের পাখিরা শীত পড়ার আগে পর্যন্ত টিকে থাকে, তারপর শিয়ালের শিকার হয়, আর তা নইলে কোন কৌশলে আরও কিছুকাল, প্রচণ্ড হিম পড়ার সময় পর্যন্ত যদি টিকেও যায় ত শীতে অবশ্যই মারা যাবে)।

বিম্‌ এক পা আগে বাড়াল — বনমোরগটা শুনতে পেল না, সে তার নিজের কাজে ব্যস্ত। আরও একটা পা ফেলল — এবারেও শুনতে পেল না, আগের মতো কাজ করে চলেছে। বনমোরগেরও হাতে বেশি সময় নেই, সময় হারালে তার চলবে না — গরম পড়তে কেঁচো জমির ওপরে উঠে আসতে থাকে, কখন কখন ঘন পাতার রাশির ঠিক নীচেই পাওয়া যায়। বিম্‌ এই ভাবে একটা গাছের পেছন দিক থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এলো, তারপর শিকার-সঙ্কেতের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ ওকে

চে'চিয়ে বলল না: 'আগে বাড়্!' ও নিজেই নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে গেল। পাখিটার ওপর লাফিয়ে পড়ে ওটাকে থাবা দিয়ে চেপে ধরার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু লাফানোটা যুতসই হল না — ও স্রেফ ধপ করে গিয়ে পড়ে বনমোরগটাকে দাঁতে চেপে ধরল। একপাশে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ ধরে রইল, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।... শিকারটাকে খেয়ে শেষ করল। কিছুই বাদ রাখল না। পড়ে রইল কেবল পাখিটার পালকগুলো। বিম্ যখন দেখল এমন কি ঠোঁটটাও একেবারে নরম, তখন সেটাও খেয়ে সাফ করল।

এটা কী করে সম্ভব হল? এক অভিজ্ঞ শিকারীর হাতে তালিম পাওয়া, শিক্ষিত কুকুর হয়ে বিম্ কিনা তার আত্মসম্মান বিসর্জন দিল? — শিকার উদরস্থ করে ফেলল? হ্যাঁ, এটাই ত কথা, আমি নিজেও তাই ভাবি। ঘটনাটা আসলে এই যে কুকুরও বাঁচতে চায়। এই আচরণের এছাড়া আর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া ভার।

মূল কথাটা হল এই যে এর পর বিমের শক্তিও বেড়ে গেল। পিপাসা পেল। যে-কোন অতিথিপরায়ণ বনে যেমন জমে থাকা জলের ছোট ছোট ডোবা দেখতে পাওয়া যায় সেই রকম একটা ডোবা এখানেও বিমের নজরে পড়ল। সে পিপাসা মেটাল। ফিরতি পথে ওর নাকে এলো ইঁদুরের গন্ধ। প্রথম পদের সঙ্গে আরও একটি পদ জুটল — ইঁদুরটাও উদরস্থ করল। এর পর গাছগাছড়া খুঁজতে শুরু করে দিল। বুনো রসুনের কিছু আধা শুকনো ডাঁটার সন্ধান পেয়ে প্রথমেই সেগুলো ওপড়ালো, কিন্তু মুখে নিয়েই ফেলে দিতে হল, তবে সেই সঙ্গে মাটির নীচ থেকে রসুনের গাঁট বেরিয়ে আসতে মুখ বিকৃত করে সেটা খেয়ে ফেলল (হাজার হোক, রসুন ত বটে)। বনের এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে যা যা ওর দরকার খুঁজে খুঁজে বার করল। ঈশ্বর জানেন, কী করে এ তথ্য ওর জানা থাকতে পারে যে রসুনে বিশ-ত্রিশ শতাংশ আয়োডিন আছে? এ প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। কেবল এটাই অনুমান করা যেতে পারে যে দুদিন আগে যখন ওর প্রায় মর মর দশা সেই সংকট মুহূর্তে ওর কাছে যেন একটা আবিষ্কারের মতো এসে উদয় হয় ওর দূর পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা, অতীতের, সেই মোজেসের আমল থেকে, যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। এটা ছিল প্রকৃতির এক পরমাশ্চর্য!

বিম্ আরও পাঁচদিন নিজের চিকিৎসা চালিয়ে গেল। ঈশ্বর ওকে যা দেন

তাই খেয়ে ও জীবনধারণ করে, কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে ও একরোখা। যেই খোঁড়লে ও ঘুমোত ওটাই ওর অস্থায়ী ঘরে পরিণত হল। একদিন ত বিম্ আচমকা একটা ঘুমন্ত খরগোশছানারই ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। কিন্তু ওটার স্বাদ আর নেওয়া গেল না — খরগোশছানাটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পালাল। বিম্ও তার পিছু ধাওয়া করার চেষ্টা করল না। সুস্থ 'সেটারের' পক্ষেই সম্ভব নয় ছুটে খরগোশের নাগাল ধরা — বিমের পক্ষে ত দূরস্থান। বিম্ দৃষ্টি দিয়ে ওটাকে অনুসরণ করল, লোভবশত ঠোঁট চাটল মাত্র। তবে অরণ্য বিমের মনে কোন খেদ রাখল না — যা হোক তা হোক করে বিমের পেট চলে যেত। খাওয়া অবশ্য খুব একটা সুবিধার হত না, কিন্তু ঠিক জুটে যেত। রোগে, অর্ধাহারে বিম্ খুবই রোগা পাতলা হয়ে গেল বটে, কিন্তু গাছগাছড়ায় যথেষ্ট কাজ হল — বিম্ কেবল বেঁচেই রইল না, ওর পক্ষে নতুন করে পথে নামা, ফের মানুষ-বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হল। আর এ কাজটাও যে তেমন একটা বুদ্ধি-বিবেচনার প্রেরণায়, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ওর প্রেরণা ছিল কেবলই ওর হৃদয়, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা।

বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটা আর সেখানকার কাটা গুঁড়িটা রোজকার মতো পরীক্ষা করার সময় বিম্ একবার শুয়ে পড়ল, তারপর উঠল, আরও একবার শুলো, পরে আবার উঠে পড়ল। সম্ভবত ও শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করে দেখল যে ইভান ইভানভিচের জন্য এখানে অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। খোঁড়লটার দিকে ফিরে গেল, সেখান থেকে ফের গুঁড়িটার কাছে। দুটো জায়গায়ই এক-এক মিনিট করে থেমে আবার উলটো দিকে ফিরল। একবার আগে আরেকবার পিছে এই যে ছুটোছুটি, এর মধ্যে ওর প্রচণ্ড অধীরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। অস্থিরতা ক্রমে বেড়ে চলল। অবশেষে ও কাটা গুঁড়ির পাশে না থেমেই, ওটার পাশ দিয়ে ছুটল, দুলকি চালে চলল বড় রাস্তার দিকে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, সূর্য বিশ্রাম নিতে চলেছে।

* * *

বেশ রাত করে বিম্ শহরে এসে পেঁছুল। শহর আলোয় ঝলমল করছে, রাতের বেলায় বনে যেমন দেখা যায় এখানে সেরকম নয়। কিন্তু এই আলোর উজ্জ্বলতাই বিম্‌কে উদ্বিগ্ন করে তুলল। এমন কিন্তু আগে ওর কখনও হত

না। ও সন্তর্পণে চলতে লাগল, সেই সঙ্গে চটপট পাও চালাতে লাগল — অবশ্য ওর দুর্বল শরীরে যতটা সাধ্য। নিঃসন্দেহে ওর লক্ষ্য ঘর — ওর প্রভু, স্তেপানভ্‌না, ল্যুসিয়া, তোলিয়া — সবাই হয়ত ওখানেই আছে। কিন্তু বিম্‌ নিজেই অবাক হয়ে গেল যখন শহরের এক প্রান্তের সেই নতুন এলাকায় আসতেই এক ধাঁচের বাড়িগুলো চোখে পড়তে ও বিপজ্জনক অঞ্চলটা এড়িয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল, কেননা ঐ বাড়িগুলোর একটার মধ্যে ছাইরঙা থাকে। একটা পাক দিয়ে পাশের এক রাস্তায় মোড় ঘুরতেই গিয়ে পড়ল একটা বেড়ার পাশে। ঘুরে গিয়ে রাস্তায় পড়তে যাবে, এমন সময় বাড়ির ফটকের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল: আরে, এখানে যে তোলিয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! সেই ছেলেটি, যাকে বিম্‌ ভালোবেসেছিল, সে এখান দিয়েই গেছে। হ্যাঁ, এই ত সবে গেছে। ফটকে কুলুপ লাগানো ছিল, কিন্তু বিম্‌ কোন রকম ভাবনা চিন্তা না করে চিত হয়ে তার নীচ দিয়ে ভেতরে গলে গেল, খুদে বন্ধুটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলতে লাগল। এই ত, এই এক্ষুনি এখান দিয়ে গেছে! ও এসে পেঁছুল একটা ছোট্ট পার্ক ধরনের বাগানে, তার মাঝখানে ছিল একটা দোতলা বাড়ি। গন্ধ ওকে নিয়ে চলল সেই দিকে।

বিম্‌ যে দরজাটার সামনে এলো তারই ভেতর দিয়ে মাত্র কিছুক্ষণ আগে তোলিয়া গেছে। খুব বাচ্চা বয়স থেকে যে-কোন দরজার ওপর আস্থাস্থাপনের শিক্ষা ওর থাকায় এই দরজাটার গাও ও আঁচড়াল। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বিমের এটা ধারণাই ছিল না যে এই বিশেষ দরজাটার প্রতি ওর এহেন আচরণকে মূর্খতাপূর্ণ ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় না। ও আরও একবার দরজার গা আঁচড়াল, তবে এবারে আরও জোরে।

দরজার ওপাশ থেকে শোনা গেল মহিলাকণ্ঠ:

'কে ওখানে?'

'আমি,' বিম্‌ জবাব দিল। 'ভৌ!'

'এটা আবার কে রে? তোলিয়া! কে আবার তোর কাছে এলো কুকুর সঙ্গে নিয়ে। যত সব!'

'আমি, আমি!' বিম্‌ বলল। 'ভৌ, ভৌ!'

'বিম্‌! বিম্‌!' তোলিয়া চিৎকার করতে করতে দরজা খুলে দিল। 'বিম্‌, আমার বিম্‌, বিম্‌ রে!' বলে সে ওকে জড়িয়ে ধরল।

বিম্‌ ছেলেটার হাত চাটল, ওর কোর্তা, চটিজুতো চাটল, অনবরত ওর চোখের দিকে তাকাতে লাগল। এত সব কঠিন ভাগ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে

কুকুরটিকে যেতে হয়েছে কত আশা-ভরসা, কত বিশ্বাস আর ভালোবাসাই না প্রকাশ পাচ্ছে তার এই দৃষ্টিতে!

'মা, মা, তুমি চেয়েই দেখ না কেমন ওর চোখদুটো। একেবারে মানুষের মতন। বিম্ রে, কী বুদ্ধি তোর, নিজেই খুঁজে বের করেছিস আমাকে! মা, ও আমাকে নিজে খুঁজে বার করেছে!...'

কিন্তু যতক্ষণ দুই বন্ধু সাক্ষাৎকারের আনন্দে ডগমগ, ততক্ষণ মা'র মুখ থেকে একটি কথাও বের হল না। খুশির ভাব কিছুটা শান্ত হয়ে এলে মা জিজ্ঞেস করল:

'এই কি সেই?'

তোলিয়া উত্তর দিল:

'হ্যাঁ। এই সেই বিম্। ও বড় ভালো।'

'এক্ষুনি বার করে দে বলছি।'

'মা, মামণি!'

'বললাম যে, এক্ষুনি!'

তোলিয়া বিম্‌কে চেপে ধরল।

'অমন কোরো না মামণি। লক্ষ্মীটি!' এই বলে সে কেঁদে ফেলল।

এমন সময় দরজায় মধুর সুরেলা শব্দে বেল্ বেজে উঠল। একজন লোক ভেতরে ঢুকল। লোকটি প্রসন্ন অথচ ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল:

'এখানে এত চিৎকার-চেঁচামেচি কেন? তুই কাঁদছিস তোলিয়া?' গায়ের ওভারকোট খুলল, বাইরের জুতো খুলে ঘরের চটি পায়ে গলাল, তারপর কুকুর নিয়ে ছেলেটা যেখানে বসেছিল সেখানে এগিয়ে গেল। 'কী রে বোকা ছেলে?' এই বলে তোলিয়ার মাথায় হাত বুলাল, বিমের কানের পেছনেও মৃদু চাপড় মারল। 'ইস্ দেখ দেখি, কুকুর! দেখ দেখ, কী কুকুর... একেবারে হাড় জিরজিরে দেখছি,' মন্তব্য করল সে।

'বাবা... বাবা ও ভালো, বিম্ ভালো কুকুর। ওকে থাকতে দাও না।'

মা এইবারে গলা চড়াল:

'বরাবরই দেখে আসছি এই রকম! আমি ওকে এক কথা বলি, আর তুমি বল তার উলটো। এর নাম শিক্ষা! বাচ্চার বারোটা বাজাবে!' এর পরই তার কণ্ঠস্বর পালটে গেল — স্বামীকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে শুরু করল। 'সেমিওন পেত্রোভিচ, এমন সময় আসবে যখন নিজের হাত নিজেই কামড়াবেন। তখন কিন্তু আর কিছুই করার থাকবে না।'

'রোসো, রোসো, চেঁচামেচি করো না। আস্তে,' বলেই সে স্ত্রীকে হাত ধরে দূরের একটা কামরায় টেনে নিয়ে গেল। সেখানে স্ত্রী আরও জোরে চেঁচাতে শুরু করল, আর স্বামী তাকে বোঝাতে লাগল।

এসব থেকে বিম্ এটাই বুঝতে পারল যে মা বিমের বিপক্ষে, আর বাবা লোকটা ওর 'পক্ষে' এবং আপাতত বিম্ তোলিয়ার কাছে থেকে যাচ্ছে। এটা বোঝার জন্য কোন কথা কানে যাওয়ার দরকার হয় না, এমন কি কোন মানুষেরও তা দরকার হয় না। তার কানের ফুটো যদি কোন কিছু এঁটে একদম বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলেও সে ঠিক বুঝতে পারবে কী ঘটছে। আর এখানে ত না বোঝার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না — কুকুরের দু কান খোলা, তার চোখজোড়াও বুদ্ধিদীপ্ত। ঠিকই বুঝেছে ও! সত্যি সত্যিই তোলিয়া বিম্‌কে নিজের আলাদা কামরায় নিয়ে গেল (ওখানে কেবলই তোলিয়ার গন্ধ)।

অতঃপর মা ও বাবার মধ্যে যে কথাবার্তা হল তা না বিম্ না তোলিয়া দুজনেরই কারোরই কানে যায় নি।

সেখানে, দূরের কামরায় ঘটনা ঘটছিল এই রকম:

''বাচ্চার বারোটা বাজাবে' হেন তেন এই ধরনের সব কথা তোলিয়ার সামনে বলতে যাও কেন শুনি? এটা যে ওর পক্ষে খারাপ তা বোঝ?'

'আর তুমি যা করছ সেটা খারাপ নয়? — স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রাস্তার একটা ছাড়া কুকুর, ওটার রোগও আছে — আমাদের এমন চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িতে কিনা ঐ কুকুর! তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি? কালই ওটার থেকে ছেলেটার কী রোগ ধরতে পারে কে বলতে পারে। না না, এ আমি হতে দেব না। এক্ষুনি তাড়াও কুত্তাটাকে!'

'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না গো!' সেমিওন পেত্রোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কৌশল কাকে বলে তার ছিটেফোঁটা ধারণা তোমার নেই!'

'চুলোয় যাক আপনার ঐসব কৌশল-ফৌশল, সেমিওন পেত্রোভিচ!'

'ঐ ত আবার শুরু হয়ে গেল সেই এক কথা। আরে বাপু, যা করতে হয় তা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ত করা দরকার — এমন ভাবে করা দরকার যাতে তোলিয়ার মনে আঘাত না লাগে, অথচ কুকুরটাকেও বিদেয় করা যায়।' তারপর স্ত্রীর কানে কানে ফিসফিস করে কী সব বলার পর শেষকালে জানাল: 'তা-ই করব — কুকুরটাকে বিদেয় করব।'

এই কথায় কর্ত্রী আশ্বস্ত হয়ে বলল:

'সে কথা প্রথমে বললেই ত চুকে যেত।'

'তোলিয়ার সামনে আমি একথা বলি কী করে!... তোমারও বুদ্ধির বলিহারি! 'চুলোয় যাক কৌশল-ফৌশল' বলে লম্ফঝম্প!' এই বলে কর্তা স্ত্রীর গালে মৃদু চাপড় মারল (এর অর্থ, দুজনের মধ্যে ফের ভাব হয়ে গেল)।

ওরা দুজনে তোলিয়ার ঘরে এসে ঢুকল। মা বলল:

'যাক গে, থাকুক তাহলে...'

'হ্যাঁ, থাকবে, অবশ্যই থাকবে,' বাবা সায় দিল।

তোলিয়ার আনন্দ আর ধরে না। সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মা-বাবার দিকে তাকাল, বিমের কাহিনী বলল, বিম্ যা যা করতে পারে সে-সবও দেখিয়ে দিল।

ওদের পরিবারটা এক সুখী পরিবার। এখানে সবাই তাদের জীবনে তৃপ্ত।

'কিন্তু একটা শর্ত আছে তোলিয়া — কোন মতেই তোমার কামরায় বিমের শোওয়া চলবে না, ও শোবে বাইরের ঘরে,' বাবা শেষ পর্যন্ত বলল।

'ঠিক আছে, তা-ই শুক,' তোলিয়া রাজী হয়ে বলল। 'বিম্ কিন্তু খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বভাবের কুকুর। আমি খুব ভালো ভাবেই জানি।'

বিম্ লক্ষ করে দেখল বাবাটি বস্তুতই ভালো, আত্মবিশ্বাসী, শান্ত ও ধীরস্থির প্রকৃতির লোক। খানিকক্ষণ বাদে তোলিয়া যখন ওদের ফ্ল্যাটের সঙ্গে বিম্‌কে পরিচিত করানোর জন্য ওকে এঘর-ওঘর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে তখনই বিম্ দেখতে পেল বাবা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একা একা খাবার খাচ্ছে -- আর এই সময়ও তাকে দেখাচ্ছে শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী। ভালোই এই বাবা লোকটি, সে আবার সেমিওন পেত্রোভিচও বটে।

অনেক রাত পর্যন্ত বিম্‌কে নিয়ে তোলিয়া মেতে রইল: ওর গায়ের লোম আঁচড়ে দিল, অল্পস্বল্প খাওয়ালও (বাবা বেশি খাওয়াতে নিষেধ করল, বলল: 'ক্ষুধার্ত কুকুরকে বেশি খাওয়ানো ঠিক নয় — মারা যেতে পারে'), অনুনয়-বিনয় করে মা'র কাছ থেকে একটা ছোট গদি আদায় করে নিল (একেবারে নতুন!), বাইরের ঘরের এক কোনায় বিমের জন্য বিছানা পেতে বলল:

'এই যে তোর জায়গা বিম্। জায়গায় যা!'

বিমা বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়ল। ওর কিছু বুঝতে বাকি রইল না: আপাতত ও এখানে বাস করবে। এই খুদে মানুষটির মনোযোগে ও আদরে বিমের অন্তঃকরণ বিগলিত হল।

'আর নয় তোলিয়া, এবার ঘুমোতে যাও। এখন ঘুমানোর সময়। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। যাও, শুতে যাও,' বাবা বলল।

তোলিয়া নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম আসতে আসতে ও ভাবতে লাগল: 'কাল স্তেপানভ্‌নার কাছে যাব, গিয়ে বলব ইভান ইভানভিচ যতদিন না ফিরছেন ততদিন বিম্‌ আমার কাছেই না হয় থাকুক...' এছাড়াও ওর মনে পড়ে গেল সে দিনের ঘটনা: যেদিন ও বাড়িতে বলল যে স্তেপানভ্‌নার বাড়িতে যায়, সেখানে ল্যুসিয়া নামে একটা মেয়ে আছে, বিম্‌কে ও পথে ঘোরায়, তখন মা কী চিৎকার-চেঁচামেচিই না করলেন! আর বাবা তোলিয়াকে বললেন: 'ওখানে আর যাবে না।' তোলিয়া যখন কাঁদতে লাগল তখন বাবা মাকে এই বলে তাঁর কথার উপসংহার টানলেন যে 'আমরা দুজনেই ভুলে গেছি কৌশল কাকে বলে।' তারপর তোলিয়ার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: 'কী আর করবি এখন বল্‌? তোকে মানুষ হতে হবে, বড় হতে হবে, তুই ত আর কুকুরের কারবারী হতে যাচ্ছিস না, তাই ওসব বুড়ি-টুড়িদের কাছে গিয়েও তোর কাজ নেই। কিছু করার নেই!' 'যাক, এখন আর 'বুড়ি-টুড়িদের' ওখানে ওকে যেতে হবে না, বিম্‌ ওদের কাছেই থাকবে। ও কেবল একবারটি স্তেপানভ্‌নার কাছে যাবে, গিয়ে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে আসবে... আর হ্যাঁ, ল্যুসিয়ার কাছেও। ...বড় মিষ্টি মেয়েটা। বিম্‌ এতক্ষণে নির্ঘাত ঘুমোচ্ছে। বিম্‌ বড় ভালো।'

এই ভাবতে ভাবতে তোলিয়া ঘুমিয়ে পড়ল — শান্তিতে, আনন্দে আর পরিপূর্ণ বিশ্বাসে।

...গভীর রাতে বিম্‌ পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ও মাথা না তুলেই চোখ খুলল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বাবা নিঃশব্দে টেলিফোনের কাছে চলে গেল, একটু দাঁড়িয়ে থেকে কান পাতল, তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল মাত্র দুটি শব্দ:

'গাড়ি... এক্ষুনি।'

কথাগুলোর তাৎপর্য বিম্‌, বলাই বাহুল্য, বুঝতে পারল না। কিন্তু ও লক্ষ করল বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে তোলিয়ার ঘরের দরজার দিকে তাকাল, বিমের দিকে অস্থির দৃষ্টি হানল, রান্নাঘরে চলে গেল, তারপর সেখান থেকে একটা

দড়ি আর কিসের যেন একটা পুঁটলি হাতে করে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো। বিম্ বুঝতে পারল কিছু একটা গড়বড় দেখা দিয়েছে, বাবা কেমন যেন বদলে গেছে — ওকে আর চেনা যাচ্ছে না। বিমের মন বলল ডাক ছাড়া উচিত, তোলিয়ার কাছে ছুটে যাওয়া উচিত! বিম্ নির্ঘাত তাই-ই করত, কিন্তু এমন সময় বাবা বিমের কাছে এসে ওর গায়ে হাত বুলোতে লাগল (তাহলে ত সবই ঠিক আছে), তারপর বিমের গলার পটির সঙ্গে দড়িটা বাঁধল, ওভারকোট গায়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বিম্‌কে নিয়ে বাইরে চলে এলো।

সদর দরজার সামনে জলজ্যান্ত একটা গাড়ি ঘরঘর আওয়াজ করছে।

বিম্ চলেছে গাড়ির পেছনের সীট-এ বসে। সামনে ড্রাইভার, তার পাশে সেমিওন পেত্রোভিচ। বিমের পাশে যে পুঁটলিটা রাখা হয়েছে তা থেকে মাংসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ওর গলায় দড়ি বাঁধা। দুজন লোকের কারও মুখেই কোন কথা নেই। বিম্‌ও চুপচাপ। রাত। গভীর কালো রাত। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, খিসান আন্দ্রেয়েভিচের বাড়িতে যে লোহার বাসন আছে সেই রকম কালো মেঘ, তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। এরকম ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কোন কুকুরের পক্ষে মোটরগাড়ি থেকে রাস্তার ওপর নজর রাখা এবং ফিরতি পথের চিহ্ন খেয়াল করে রাখা অসম্ভব। তাছাড়া ওরা যে ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও বিমের জানা নেই। ওরা ওকে নিয়ে যাচ্ছে — এর বেশি আর কিছু ওর বোধগম্য নয়। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এই দড়িটা ওর গলায় কেন? বিমের আসল দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেল তখনই যখন গাড়িটা বনের সামনে এসে থেমে গেল।

সেমিওন পেত্রোভিচ বন্দুক হাতে নিয়ে বিমের গলায় বাঁধা দড়ি ধরে ওকে গভীর বনের ভেতরে নিয়ে গেল। বনপথে টর্চের আলো ফেলে রাস্তা দেখতে দেখতে ওরা একটা ঢাল ধরে নীচে নামতে লাগল। পথটা এসে ঠেকেছে বনের ভেতরকার এক ফাঁকা জায়গায়, তার চতুর্দিকে বিশাল বিশাল ওক গাছ। এখানে এসে সেমিওন পেত্রোভিচ বিমের গলার দড়িটা একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল, সঙ্গের পুঁটলিটা খুলে সেখান থেকে এক বাটি মাংস বার করে একটা কথাও না বলে বিমের সামনে রাখল। তারপর ফিরে চলল। কিন্তু কয়েক পা সরে যাবার পর ফিরে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলে বিমের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে বলল:

'আচ্ছা, চালিয়ে যা। এই হল অবস্থা।'

বিম্ টর্চের অপসৃয়মাণ আলো দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল। ও এত আশ্চর্য হয়ে গেছে, ঘটনার আকস্মিকতায় এমনই চমকে গেছে, বেদনায় ওর মন এতদূর তিক্ত হয়ে গেছে যে মুখে ওর কোন আওয়াজ বের হল না। কিছু বুঝতে পারছিল না, মাথামুণ্ডু কিছুই ও বুঝতে পারছিল না। উত্তেজনায় ও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, অথচ সেদিন গরম ছিল, এমন কি গুমোটই ছিল — এমন আবহাওয়া শরৎকালের পক্ষে অস্বাভাবিক বলতে হয়।

মোটরগাড়ি চলে গেল। বিলীয়মান আওয়াজ থেকে বিম্ মনে মনে বিবেচনা করল 'গাড়িটা ওখানে চলে গেল।' আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষকালে একেবারেই মিলিয়ে গেল। ঐ আওয়াজটাই বিম্‌কে দিক নির্দেশ দিল — সেরকম কিছু ঘটলে কোথায় যেতে হবে বলে দিল।

অরণ্য নীরব।

এক ঘোর অন্ধকার শারদ রাতে বনের মধ্যে বিশাল বিশাল ওক গাছের নীচে দড়িতে বাঁধা অবস্থায় বসে রইল এক কুকুর।

আর সেই রাতে, ঠিক সেই রাতেই কিনা এমন ঘটনা ঘটল যা শরৎকালে প্রায় কখনও ঘটে না। কিন্তু ঘটল সেই ঘটনাই — নভেম্বরের শেষে, যখন অস্বাভাবিক গরমের ভাব দেখা দিয়েছে, সেই সময় দূরে, অনেক দূরে কোথায় যেন মেঘ গুরু গুরু গর্জন করে উঠল।

প্রথমে বিম্ বসে বসে অরণ্যের ধ্বনি শুনতে লাগল, ওর ঘ্রাণশক্তিতে যতটা সম্ভব তার সাহায্যে চারপাশ পরখ করে দেখল। কোন কুকুর যদি আগে অন্তত একবারও কোন বনে এসে থাকে, তাহলে পরেও তার চিনতে অসুবিধা হয় না। বিম্ শিগগিরই বুঝতে পারল এটা সেই জায়গা, যেখানে এক সময় প্রভুর সঙ্গে সে নেকড়ে শিকারে এসেছিল। হ্যাঁ, সেই বনই বটে। কিন্তু আপাতত কাছে পিঠে নেকড়ের কোন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। বিম্ গাছের সঙ্গে পাঁজর ঠেকিয়ে দাঁড়াল, সূচীভেদ্য অন্ধকারের গায়ে শরীর লেপটে তার সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল। ও এখন নিঃসঙ্গ, অসহায়, যে মানুষের কোন ক্ষতি ও করে নি সে ওকে এখানে ছেড়ে চলে গেছে।

অন্তরের অন্তস্তলে, সত্তার গভীরতম প্রদেশে কোথাও যেন সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বিম্ বুঝতে পারল যে তোলিয়ার কাছে এখন আর যাওয়ার কোন মানে হয় না, ওকে এখন যেতে হবে ওর নিজের বাড়ির দোরগোড়ায়, একমাত্র ওখানেই, আর কোথাও নয়। ওখানে যাওয়ার জন্য ওর মন এমনই ব্যাকুল

হয়ে উঠল যে দড়ির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল সেইটুকু প্রয়োগ করে ও গাছের গা থেকে ছুটে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুকের ভেতরকার যন্ত্রণাটা সর্বশরীরে ছেয়ে গেল, ওঠার মতো অবস্থা ওর রইল না। এখন ও চারটি ঠ্যাঙ ছড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণের জন্য নয়। আবার উঠে পড়ল, উঠে গাছের গা ঘেঁষে বসল, দেখে মনে হল যেন নিজের ভাগ্যকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে।

অন্ধকার কালো রাত্রির বুক ভেদ করে আবার কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল, এবারে কিন্তু কাছেই। ন্যাড়া বনের মাথার ওপর দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে গুরুভার গমগম আওয়াজ গড়াতে গড়াতে চলে গেল। বাতাস বইল, গাছপালার শাখাপ্রশাখাগুলো যেন বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে কাতরোক্তি করে উঠল, যে-সমস্ত গাছের কান্ড একটু দুর্বল সেগুলো দুলতে লাগল, আর শেষ পর্যন্ত বনের সমস্ত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এক বিকট ব্যাকুল ধ্বনিতে বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু তার মধ্য থেকে একটা আধা শুকনো এস্প গাছের কাতরানি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল — শিকড়ের কাছে কোথায় যেন নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় যে-কোন মুহূর্তে গাছটার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা — এখন সেটা সমান তালে ক্যাঁচকোঁচ আর্তনাদ করে চলেছে। তার চাপা আকুল আর্তনাদ বিম্‌কে এত বেশি ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল যে সম্মিলিত ভাবে বনের সমস্ত ধ্বনিও ওকে ততটা ভীতচকিত করে তুলতে পারে নি।

এদিকে অরণ্য ধ্বনি তুলে চলেছে, গজরাচ্ছে। আর ঐ ভয়াল অন্ধকারের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ তার পূর্ণ, একচ্ছত্র রাজ্য বিস্তার করে চলেছে; এত প্রচন্ড তার বেগ যে ওক গাছগুলো পর্যন্ত আর্তনাদ শুরু করে দিল। বিমের মনে হচ্ছিল বিশাল বিশাল ওক গাছের ওপর, ঐ হতাশ, মুমূর্ষু বৃদ্ধ এস্প গাছটার ওপর, নিশাকালীন সন্ত্রাসে দিশেহারা তার মতো একটা কুকুরের ওপর যেন ঘোর কালো রঙের কোন এক বিপুলকায় প্রাণী হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এই কালো প্রাণীটা যেন তার কালোরঙের আলখাল্লার প্রান্ত ঝাপটে বনের গাছপালার মাথার ওপর ঘা মেরে চলেছে, গাছপালাগুলোকে সাপটে জড়িয়ে ধরে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিচ্ছে, এক মায়াবীর মতো নাচতে নাচতে কখনও ছিটকে সরে যাচ্ছে, কখনও এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, শতকণ্ঠের বিকট হুঙ্কারে, গর্জনে ফেটে পড়ছে।

বিম্‌ এত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে সাময়িক ভাবে ও নিজের শরীরের

বেদনার কথাও ভুলে গেল। ও পারলে গাছের গুঁড়ির ভেতরে ঢুকে যায়। গুঁড়িটার গায়ে নিবিড় হয়ে লেপটে রইল। বাতাস বনের গায়ে ঠান্ডা ঝাপটা দিতে লাগল, তার ফলে ঢালের নীচটায় কনকনে হিমের প্রবাহ বয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিমের হাড়-কাঁপুনি শুরু হল। সচরাচর যা হয় — শরতের শেষে দেরি করে একটু গরম পড়লে হঠাৎই আবহাওয়া বদলে যায়, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া শুরু হয়। বিম্ বাতাসের হাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য গাছের গুঁড়ির অন্য দিকে সরে গেল। এর ফলে হাওয়ার বিপরীতে গন্ধ নিয়ে হালচাল বোঝা যায় আর বাতাসের মধ্যে চোখের নজর রাখা যায়। কিন্তু সামনে সূচীভেদ্য অন্ধকার। বিম্ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

এমন সময় অন্ধকারের বুক চিরে ফালাফালা করে চলে গেল বিজলীর একটা গনগনে সরু ফলা। একটানা হুহু আর্তনাদে দীর্ণবিদীর্ণ বনভূমি মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই ওপর থেকে কড়কড় কড়াৎ শব্দে কী যেন একটা জিনিস নীচে পড়ে আছাড় খেয়ে ভেঙে খান খান হয়ে গেল, তারপর বনের ওপর এখানে-ওখানে নানা জায়গা দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল। বজ্রবিদ্যুৎ যেন ঐ মায়াবীটাকে ভয় পাইয়ে দিল, সে পালাতে লাগল, ছুটতে লাগল, শেষে আর তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না; তখনই ওপর থেকে চড়বড় শব্দে এসে পড়তে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা। প্রবল সেই বর্ষণ, ঠান্ডা কনকনে, তবে অল্পকালের। পরে সেই বর্ষণও ক্ষান্ত হল।

অরণ্য এখন ঠিক যেন যুদ্ধের পর গা ঝাড়া দিয়ে সিধে হয়ে উঠছে, আপন মনে মৃদু গরগর আওয়াজ তুলছে। এমন সময় এস্প্ গাছটা আচমকা ক্যাঁচ্‌কোঁচ করে উঠল, মড়মড় আওয়াজ করতে করতে অন্য গাছপালাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল, তারপর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্তিম মুহূর্তের শোকাকুল নৈরাশ্যে নিজের ডালপালা মটমট করে ভাঙতে ভাঙতে ভয়ঙ্কর শব্দে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল: শেষ লড়াইয়ের মোকাবিলা করার পর ধরাশায়ী হল। গাছটা বিমের কাছাকাছি ছিল, তার মৃত্যুকালীন আর্তনাদ বিমের কানে যেতে ও শঙ্কিত হয়ে উঠল, ওর ভয় হল আরও এই কারণে যে প্রথমে মনে হয়েছিল গাছটা যেন সোজা ওর ওপরই এসে পড়ল। সেই মুহূর্তে বিম্ তার অভিশপ্ত ওক গাছটা থেকে পেছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দড়ি... দড়িই — সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে টান পড়ল।

অসুস্থ, যন্ত্রণাকাতর বিম্‌ ভোরবেলা পর্যন্ত বসে বসে কাঁপতে লাগল। ওর সামনে মাংসের বাটিটা ছিল, কিন্তু সেটা ও ছুঁয়েও দেখল না।

ভোরের আলো ফোটার আগে আগে দূরে একটা নেকড়ের ডাক শোনা গেল। একাই ডাকল, ঐ বনে ওর ডাকে সাড়া দিয়ে আওয়াজ করার মতো আর কোন নেকড়ে ছিল না। ওটা হল সেই নেকড়েটা যেটা ঐদিন শিকারের সময় পালিয়ে গিয়েছিল — পালের মধ্যে ওটাই ছিল সবচেয়ে সেয়না। বিমের দুই কাঁধের উঁচু ফলকের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ওর দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক আওয়াজ হতে লাগল, অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে শুনল, জোরে জোরে নাক টেনে বাতাসের গন্ধ শুঁকল। ও নেকড়ের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হল, ক্ষণিকের জন্যও মনে সন্দেহ জাগল না যে আত্মরক্ষার সাহস ওর আছে। এই সাহসের নামান্তর মরিয়ার বীরত্ব (এটা ত ঠিক যে ঐ ছাইরঙা লোকটাকে ও কামড়েছিল, কামড়ে প্রায় ধরাশায়ী করেও ফেলেছিল!)। কিন্তু নেকড়েটা এবারে এলো না। হাওয়া এখন আর নেই, তাই জানোয়ারটার পক্ষে দূর থেকে বিমের গন্ধ টের পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মনে হল, বনের ঐ অংশে জানোয়ারটার ঘোরাফেরা করার সময়ও এটা নয়। তা সত্ত্বেও বিম্‌ প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রতীক্ষা করতে করতে বিম্‌ এতদূর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে নিজের অজান্তেই ওর গলার বাঁধনে টান পড়ল আর তার ফলে গলার পটিটা চেপে বসে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। বিম্‌ গাছটার দিকে পিছিয়ে গেল, শরীরের পেছনটা গাছের গুঁড়ির গায়ে লাগিয়ে কশের দাঁত দিয়ে দড়ি চেপে ধরল, চেপে ছুরি দিয়ে কাটার মতন করে কেটে ফেলল।

যাক, একটা কাজের কাজ হল!

এই নিবিড় অরণ্যে বিম্‌ একা বটে কিন্তু সে স্বাধীন।

যে-কোন কুকুর শেষ পর্যন্ত এটাই করে থাকে, যদিও একেক জাতের কুকুরের ক্ষেত্রে ঘটে একেক রকমে। শেকলে বাঁধা পাহারাদার কুকুর দড়ির বাঁধন সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলে, কেননা মজবুত শেকল ছাড়া আর কোন কিছুর বাঁধনই তার পছন্দ নয়। থাঁদা নাকওয়ালা ছোট জাতের কুকুর দড়ি কাটবে না বটে, কিন্তু বেঁধে রাখলে সে ছটফট করতে থাকবে, সমানে এদিক-ওদিক ঘুরবে, চেঁচামেচি শুরু করবে, এমন কি গলায় ফাঁস লেগে দম বন্ধ হয়ে মারাও যেতে পারে। হাউন্ড জাতের কুকুর অনেকক্ষণ ভাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে ফেলে। কিন্তু মার্জিত রুচির কুকুর, আসল

শিকারী কুকুর এই অবস্থায় তার প্রভুর প্রতীক্ষায় বহু দিন বসে থাকে, দাঁড় দাঁতে কাটে কেবল বিপদের মুহূর্তে, অথবা মরিয়া হয়ে — যখন বুঝতে পারে সাহায্যের জন্য আর কেউ আসছে না। বিম্‌ও এই প্রকৃতির — সময় আসতে, যা তার করা উচিত তাই-ই করল।

বিম্‌ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে, কান পেতে বনের আওয়াজ শুনতে শুনতে সাবধানে গাছটার কাছ থেকে সরে এলো। আচমকা একটা ছাতারপাখি কিচমিচ করে ডেকে উঠল: 'কে ও, কে ও, কে ও! কে কে কে!' বিম্‌ও ছাতারপাখির প্রথম সতর্কবাণী শোনামাত্র কালবিলম্ব না করে শতবর্ষের প্রাচীন এক বিশাল ওক গাছের চারপাশে নিবিড় হয়ে ঘিরে থাকা ছোট ছোট ওক গাছের ঘন জঙ্গলের মধ্যে থমকে দাঁড়াল। ব্যথা এখন আর ও টের পাচ্ছে না, ব্যথাটা যেন কোথায় কোন্‌ গভীরে চলে গেছে। বিম্‌ গলা বার করে দিয়ে মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে ঝরা পাতার রাশির ওপর শুয়ে পড়ল। ছাতারপাখিটা এবারে কাছে ডেকে উঠল — বিম্‌ ওটাকে একটা উঁচু গাছের ওপর বসে থাকতে দেখল। বিম্‌ অবশ্যই এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে চলে যেত, কিন্তু বিমের যেদিকে যাওয়া দরকার সেই দিক থেকেই বিপদসঙ্কেত দিচ্ছে পাখিটা। বিম্‌ দুরুদুরু বুকে কিন্তু মনে মনে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সেই ছাতারপাখিটা তাকে সময়মতো শত্রুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে উঠল। পাখি, তোমাকে ধন্যবাদ! এই পাখিকে, এই অপূর্ব বার্তাবহ অগ্রদূতকে কেবল হিংস্র জন্তুজানোয়ারেরাই গালাগাল দিয়ে থাকে। বনের শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের স্বেচ্ছায় সহায়তা করে এই পাখি, পুচ্ছে এক টেলিগ্রাফ নিয়ে ওর জন্ম। ছাতারপাখি যদি না থাকত, তাহলে বনের যে-সমস্ত অধিবাসী দৌড়ায়, যারা ওড়ে, তারা অরণ্য জীবনের যাবতীয় তথ্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকত।

মাদী নেকড়েটা বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গার এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনের একটা পা বাঁকা (তার মানে কোন এক সময় কোন লোক ওকে ঘায়েল করে)। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে আরও কয়েক পা বাড়াল, সোজা বিমের দিকে মাথা ঘুরিয়ে ঝট করে শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিম্‌কে লক্ষ্য করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল — খোঁড়া পাটা বাধ সাধল। বিম্‌ একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে তার থাবা থেকে ফসকে বেরিয়ে গেল। জন্তুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন ঠ্যাঙে লাফাতে

লাফাতে ফের ধেয়ে গেল বিমের দিকে। কিন্তু বিম্ বোঁ করে পাক খেয়ে ওক গাছের পেছনে সরে পড়ল, পিঠ ঠেকতে গাছের গায়ে একটা ফোকরের অস্তিত্ব টের পেল। সঙ্গে সঙ্গে, নেকড়েটা যখন দ্বিতীয়বার লাফ দিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে বিম্ কোটরের ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। সেখান থেকে দাঁতের পাটি বার করে বিম্ প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগল, এত জোরে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল যে অমন ঘেউ ঘেউ সে জীবনে কখনও করে নি। শিকারের সূত্র পেলে শিকারী কুকুর যেমন করে, ভালুকের গর্তের সামনে এস্কিমো-কুকুর যেমন করে সেই ভাবে অবিরাম ডাক ছেড়ে চলল। বিমের কণ্ঠস্বর অরণ্যময় অনুরণন তুলে কেবল একটি, একমাত্র যে কথাটি বলতে লাগল তা যে কারও পক্ষে বোধগম্য: 'বিপদ! বিপদ! বিপদ!' আর অরণ্যও সঙ্গে সঙ্গে সে কথা লুফে নিল, ওকে সাহায্য করল প্রতিধ্বনি তুলে: 'বিপদ! বিপদ!'

হে অরণ্য, তোমাকে ধন্যবাদ!

এর পর টেলিগ্রাফের চেয়েও দ্রুতগতিতে এক ছাতারপাখির কণ্ঠ থেকে আরেক ছাতারপাখির কণ্ঠ মারফত ছড়িয়ে পড়ল বিপদবার্তা: 'কে খায় কাকে, কে খায় কাকে, কে খায় কাকে! কে কে কে...' রেঞ্জার তার চৌকি থেকেই বুঝতে পারল যে কুকুরের এই ক্রুদ্ধ গর্জন আর ছাতারপাখিদের অস্বাভাবিক অস্থির কিচিরমিচির — এর কোনটাই ভালো লক্ষণ নয়। সে তার বন্দুক হাতে নিয়ে ছররা ভরে গভীর বনের উদ্দেশে চলল। লোকটি চলেছে নিঃশঙ্কচিত্তে, কেননা বন তার একরকমের ঘরবাড়ি, আর বনের অধিবাসীরা সকলেই তার মুখ চেনে। তাছাড়া সে নিজেও ওদের অনেককে জানে, এমন কি মাদী নেকড়েটাকে চাক্ষুষ জানে, কিন্তু কেন যেন ওটাকে মারে নি। 'বলা যায় না, অল্পবয়স্ক কোন শিকারী হয়ত মাদী নেকড়ের আইনসঙ্গত নিজস্ব এলাকায় ঢুকে পড়েছে, তারপর ওটাকে দেখে ভয় পেয়ে গাছে চড়ে বসেছে আর নিজের কুকুরটাকে মাদী নেকড়ের গ্রাস হওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছে,' এই ভেবে রেঞ্জার দ্রুত পা চালাল। কুকুরের ডাকটা আসছিল দূর থেকে, 'নেকড়ে খাদের' ঠিক প্রান্ত থেকে। কিন্তু আওয়াজটা হঠাৎই যেন থেমে গেল। 'ব্যস, খতম!' মনে মনে এই ভেবে নিয়ে সে আগের চেয়েও সাবধানে, চুপিসারে চলতে লাগল, তবে ঐ একই দিক লক্ষ্য করে। নাঃ, তাড়াতাড়ি করা উচিত ছিল! কাজটা ঠিক হয় নি।

সেই সময় শতবর্ষের পুরনো ঐ ওক গাছের সামনে কী ঘটনা ঘটেছিল দেখা যাক।

মাদী নেকড়েটা ছিল বেজায় ঘাগী। বিম্ যাতে চুপ করে যায় তার জন্য গাছের কোটরের কাছ থেকে সরে গেল, কেননা ওর জানা ছিল যে কুকুরের ভৌ-ভৌ ডাকের সঙ্গে সঙ্গে এক বন্দুকধারী লোকের আবির্ভাব অবশ্যই ঘটবে। বিম্ কিন্তু এই জন্যই মুখ বন্ধ করল যে মাদী নেকড়ে এখন আর ওর ওপর হামলা করতে আসছে না। কিছুক্ষণ বাদে মাদী নেকড়েটা আরেকটু কাছে সরে এসে বসল, অপলকে দেখতে লাগল বিম্‌কে। এই ভাবে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল দুই কুকুর — বিমের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, মানুষের শত্রু এক জংলী কুকুর, আর মার্জিত রুচির এক কুকুর, মানুষের দয়া ছাড়া যার পক্ষে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। নেকড়ে মানুষমাত্রকেই ঘৃণা করে, আর বিম্ পারলে সব মানুষকেই ভালোবাসে, যদি তারা সবাই ওর প্রতি প্রসন্ন থাকত। মানুষের বন্ধু এক কুকুর আর মানুষের শত্রু আরেক কুকুর — দু'জনের মধ্যে চোখাচোখি হল।

মাদী নেকড়ে এটা বুঝতে পারছিল যে গাছের ঐ ফোকরে, ঐ কোটরটার মধ্যে ঢোকার সাধ্যি তার নেই। কিন্তু তবু সে ওটার কাছে এগিয়ে এসে সামনে মুখ বাড়িয়ে দিল। বিম্ পিছিয়ে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে আরও ভেতরে চলে গেল, তবে এবারে আর হাঁকডাক করল না, নিজের দুর্গের ভেতরে এখন সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এরকম কতক্ষণ চলত বলা যায় না। কিন্তু শেষকালে মাদী নেকড়েটা চারপাশে নাক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে ঝট করে কোটর থেকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর মনে হল যেন কোন বিপদের আভাস পেয়ে সামান্য ঝুঁকে পড়ে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটার দিকে, যেই ওক গাছটার সঙ্গে বিম্ বাঁধা ছিল সেটার দিকে। ওর চলার ভঙ্গিতে ছিল কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব, ও চলছিল পেছনের দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে লেজ গুটিয়ে।

বিম্‌কে শিকার করার লোভে সে এতই মত্ত হয়ে ছিল যে এই জায়গাটা তার নজরে পড়ে নি, কেননা রাতে বৃষ্টি হওয়ার ফলে গন্ধ বেশ কিছু পরিমাণে উবে গেছে। কিন্তু এখন, একটু হাওয়া বইতেই সে খুঁজে বার করে ফেলল — গাছের সঙ্গে দড়ি বাঁধা, মাংসের বাটি। ও, আর বলতে হবে না এর অর্থ কী — এখানে কোন মানুষ ছিল! দড়িটাতে মানুষের গন্ধ,

ঐ যে গোল জিনিসটা ওটাতে লোহার গন্ধ, আর চিহ্নও ঐ মানুষেরই। মাংসটা হল প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, ফাঁদ। মাদী নেকড়ে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর তড়াক করে লাফিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে ছুটতে লাগল — দেখে মনে হল যেন কোন বড় রকমের সঙ্কটের মুখ থেকে ছুটে পালাচ্ছে। বাইরে থেকে ভালোমতো আড়াল না রেখে কেউ যদি আনাড়ির মতো ফাঁদ পাতে তবে তা দেখতে পেয়ে এবং গন্ধের সাহায্যে বিপদ আঁচ করতে পেরে এই ভাবেই নেকড়ে পালায়।

বনের শেষ মাদী নেকড়েটি, সাহসী ও অহঙ্কারী নেকড়েটি বিমের কাছ থেকে পালাল।

...দুনিয়ায় মানুষই একমাত্র প্রাণী যাকে নেকড়ে ঘৃণা করে, মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। পৃথিবীর বুকে শেষ নেকড়ের দল বিচরণ করছে, আর তুমি মানুষ কিনা তাদের, অরণ্য ও মাঠের পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকারী স্বাধীনচেতা এই নেকড়েদের সংহার করছ, যারা অনিষ্টকর জীবজন্তু, গলিত শবদেহ ও রোগব্যাধি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত রাখছে, জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যাতে কেবল সুস্থ বংশধারাই বজায় থাকে তাদেরই সংহার করছ! পৃথিবীর শেষ নেকড়ে এরা। এরা বিচরণ করছে খোসপাঁচড়া জাতীয় রোগগ্রস্ত খেঁকশিয়ালদের ধ্বংস ক'রে আর সকলকে রোগ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে; তারা আছে এইজন্যই যাতে একিনোকোকাস রোগগ্রস্ত দুর্বল খরগোশেরা বনে প্রান্তরে এই রোগ ছড়াতে না পারে এবং রুগ্ণ ও দূষিত সন্তানদের জন্ম দিতে না পারে। আবার কোন বছর টুলারেমিয়া রোগ সংক্রমণকারী ইঁদুরদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে এই নেকড়েরাই তাদের ব্যাপক হারে সংহার করে। তাই মনে রাখবেন, আজ পৃথিবীর বুকে যে নেকড়েরা বিচরণ করছে এরাই তাদের বংশধারার শেষ ধারক।

রাতের বেলায় ওরা যখন ব্যাকুলস্বরে আওয়াজ করে সমস্ত তল্লাট জুড়ে খোলাখুলি ও প্রত্যক্ষ ঘোষণা করে: 'আ-আ-মি! আ-আ-মি!' তখন হে মানুষ, কেন জানি না তোমার বুক কেঁপে ওঠে। অথচ হে মানুষ, তুমি ত জান যে-কোন মাদী নেকড়ে কোন কুকুরের দুধের ছানার ক্ষতি করে না, বরঞ্চ তাকে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করে; কোন শিশুসন্তানের ক্ষতি সে করে না, তাকে নিজের খোঁড়লে টেনে নিয়ে এসে দুধের বোঁটার দিকে ঠেলে দেয়। নেকড়ে মানবশিশুকে দুধ খাইয়ে বড় করে তাকে নেকড়ে-মানবে পরিণত করেছে এরকম কত ঘটনাই না আছে! শেয়ালের পক্ষে এ কাজ করা

সম্ভব নয়। এমন কি কুকুরের পক্ষেও নয়। আচ্ছা, কোন নেকড়ে তার নিজের এলাকার কোন ভেড়াকে স্পর্শ করে কি? কখনও নয়। অথচ মানুষ, এসব সত্ত্বেও কিনা নেকড়েকে তোমার এত ভয়! এই ভাবে ঘৃণা বুদ্ধিবিবেচনাকে ছাপিয়ে (এখানেই পশুর সঙ্গে মানুষের তফাত) কখনও কখনও সত্তাকে এতদূর আচ্ছন্ন করে ফেলে যে তার ফলে ভালোকে ক্ষতিকারক আর ক্ষতিকারককে ভালো মনে হতে পারে।

কিন্তু নেকড়েদের শেষ বংশধারা এখনও পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে। ওদেরই একজন এইমাত্র পালিয়ে গেল -- বিমের কাছ থেকে নয়, মানুষের ঘৃণ্য ও বিপজ্জনক গন্ধ পেয়ে। ওদের দুজনের এই মোলাকাত কোথায় গিয়ে শেষ হত এবং কতক্ষণই বা মাদী নেকড়ে গাছের কোটরের সামনে বসে থাকত, আমরা জানি না। হয়ত ওরা একে অন্যকে শুঁকে দেখে মিতালিই করত (কেননা মাদী নেকড়েটা ছিল একা, নিঃসঙ্গ, আর বিম্ ছিল মন্দা)। যাক গে, যা ঘটে নি তার আলোচনা করে কোন কাজ নেই, কেবল একটা কথাই এখানে মনে করিয়ে দিতে চাই — নেকড়ের পালের মধ্যে একটা কুকুর ঘুরছে, এমন দৃশ্য লোকে একাধিক বার দেখেছে। কিন্তু বিম্ সেই অদৃষ্ট থেকে পার পেয়ে গেল।

মাদী নেকড়েটা পালিয়ে যেতে বিমের ক্ষতবিক্ষত ভাঙা বুকের ভেতরে আপনা আপনিই প্রচণ্ড ব্যথা উঠল। ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, তাই কোটরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল — কী হবে না হবে এসব চিন্তাই তখন ওর মাথায় এলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফের একটুখানি শুয়ে বিশ্রাম করার পর যখন ওঠার মতো সামর্থ্য ওর হল তখনও মাংস ও খেল না। এখন কেবল একটাই কাজ — যতক্ষণ শক্তিতে কুলোয় ততক্ষণ সামনের দিকে চলতে থাকা।

বিম্ তাই চলতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে, অনেক কষ্ট করে এক কিলোমিটারব্যাপী বিশাল চড়াই বয়ে ও ওপরে উঠতে লাগল। এই ঢালটার প্রায় অর্ধেক ওঠার পর একটা জায়গায় আচমকা ও নেকড়ের গন্ধ টের পেল। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা পার না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল (ওটা এই রাস্তা দিয়েই এসেছিল!)। বিম্ তাই মোড় ঘুরে একটা ঘন দুর্ভেদ্য কাঁটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়ল আর তখনই... তখনই দেখতে পেল একটা নেকড়েকে। দেখতে পেল নেকড়েটা ঠিক ওর সামনে পড়ে আছে — মরা। এটা ছিল সেদিনের সেই নেকড়েটা যেটা মারাত্মক জখম হওয়ার পর শিকারীদের ব্যূহ

ভেদ করে পালিয়েছিল। মাদী নেকড়েটা তখনও তার চারধারে ঘুরে ঘুরে থেকে থেকে যেমন ভয়ংকর বিলাপ করে আশেপাশের সকলকে তার শোকের বারতা জানাচ্ছে তাতে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। মৃত নেকড়ে। ওর গা থেকে গোছায় গোছায় লোম খসে পড়েছে। একটা জানোয়ারের গলিত, চোপসানো দেহাবশেষ মাত্র। কেবল নখগুলো দেখাচ্ছে বড় বেশি লম্বা, মারাত্মক ঝকঝকে, ভয়াবহ। বিম্ দেখল মরে পচে গলে যাওয়ার পরও নেকড়ের নখ থেকে যায়। আর সে নখ ভয়েরও উদ্রেক করে।

অর্ধবৃত্তাকারে পাক খেয়ে যতদূর পারা যায় শক্তি প্রয়োগ করে, আগে যে-রাস্তা ধরেছিল সেই রাস্তা ধরেই বিম্ ফের দ্রুত পায়ে চলতে লাগল। তবে পথে যেখানে যেখানে মাদী নেকড়েটার পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেল সেই জায়গাগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলল। অবশেষে ও চড়াই বয়ে ওপরে উঠে এলো, গতকাল যেখানে মোটরগাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এসে দাঁড়াল। চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ও দিক ঠিক করে নিল, তারপর কোন রকম ভুলচুক না করে ঠিক যে-দিকে দরকার সেই পথ ধরল — চলল নিজের বাড়ির দিকে। ফের ওর শক্তি ফুরিয়ে এলো, তাই আবার শুয়ে বিশ্রাম করে নিল, এই ভাবে কখনও কোন ঘাসের গাদার মধ্যে, কখনও বা পাইনের পাতার স্তূপের মধ্যে শুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে ও চলল, চলার পথে গাছগাছড়া খুঁজে বার করে খেতে লাগল।

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে একটা রোগা-প্যাতলা কুকুর। ছুটছে সামনের দিকে, কেবলই সামনের দিকে, ধীরে ধীরে, ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে, কিন্তু সামনের দিকে। তার লক্ষ্য সেই দরজাটা, যার সামনে ওর জন্য অপেক্ষা করছে এক প্রসন্ন অভ্যর্থনা। বিমের বড় ইচ্ছে করছিল ঐ দরজাটার পাশে গিয়ে ও শুয়ে পড়ে, শুয়ে শুয়ে প্রতীক্ষা করে, কেবলই প্রতীক্ষা করে ওর প্রভুর, প্রতীক্ষা করে মানুষের বিশ্বাসের, সাধারণ, অতি সাধারণ মানবীয় স্নেহ-ভালোবাসার।

...আচ্ছা, এদিকে তোলিয়ার কী হল? ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর কী অবস্থা হল তার?

ও তখনও জামাকাপড় গায়ে না চড়িয়ে রাত-কাপড় পরা অবস্থাতেই বিম্‌কে দেখার জন্য ছুটে বেরিয়ে এলো, তারপর ওকে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল:

'মা! বিম্ কোথায়? কোথায় গেল বিম্?'

মা তোলিয়াকে আশ্বস্ত করে বলল:

'বিম্ হিসি করার জন্যে বাইরে যেতে চেয়েছিল, বাবা ওকে বাইরে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তারপর ও আর ফেরে নি। পালিয়ে গেছে। বাবা অনেকক্ষণ ওকে ডাকাডাকি করল, কিন্তু ওকে আর পাওয়া গেল না।'

তোলিয়া কে'দে ফেলল।

'বাবা! সত্যি কথা নয়, না না, সত্যি নয়!' বলতে বলতে সে যেমন ছিল ঐ অবস্থায়, রাত-কাপড় পরা অবস্থাতেই খাটের ওপর লুটিয়ে পড়ল এবং ব্যাপারটা আসলে তা নয় এই আশায় ভর্ৎসনা মেশানো ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে বলল: 'সত্যি নয়! না না, সত্যি নয়!'

এবারে সান্ত্বনা দিতে লাগল সেমিওন পেত্রোভিচ:

'আসবে, আসবে, ও ফিরে আসবে। ফিরে যদি না আসে ত আমরা নিজেরাই ওকে খুঁজে বার করে নিয়ে আসব। নিয়ে আসবই। খুঁজে বার করবই। একটা জলজ্যান্ত কুকুর — যাবে কোথায়? এ ত আর ছুঁচ নয়।'

তোলিয়া কান্না থামিয়ে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর সে চোখের জল মুছতে মুছতে মা-বাবার দিকে দৃষ্টিপাত করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল:

'যাই বল না কেন, খুঁজে বার করবই।'

তোলিয়া এতখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল যে ওর মা-বাবা আশঙ্কিত দৃষ্টিতে চোখ-চাউয়ি করল, ওরা যেন বলতে চাইল:

'ছেলেটার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে দেখছি!'

ঐদিন থেকে তোলিয়া বাড়িতে এবং স্কুলেও স্বল্পভাষী হয়ে পড়ল, ঘনিষ্ঠ লোকেজনের সামনে সে কুনো আর সশঙ্কিত হয়ে থাকত।

তোলিয়া বিমের খোঁজ করতে লাগল। শহরের রাস্তায় প্রায়ই দেখা যেত সংস্কৃতিবান সুখী কোন এক পরিবারের এক সাফসুতর ছেলে কেবল মুখ দেখে দেখে পথচারীদের মধ্য থেকে বেছে বেছে কাউকে কাউকে থামিয়ে প্রশ্ন করছে:

'মাফ করবেন, একটা সাদা কুকুর কোথাও দেখেছেন কি, যার একটা কান কালো?'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বাড়ির পথে। তিনটি চালাকি

বিম্ যখন শহরের দিকে এগোচ্ছিল তখন ওর পা যেন আর বশ মানতে চাইছিল না। আবারও ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। বড় রাস্তার ধারে কীই বা খাওয়া যেতে পারে? কিছুই না। তরমুজের ফেলে দেওয়া খোসা — একে কি আর খাবার বলা যায়? দেখতেই খাবারের মতো। বিমের মতো একটা কুকুরের দরকার মাংস, ভালো জাউ, আর সবজীর সুপ আর সেই সঙ্গে রুটি (টেবিলে লোকজনের খাওয়াদাওয়ার পর যদি ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকে) — এক কথায়, সাধারণ লোকে যা যা খায় সেই সব খাবার। অথচ বিম্ প্রায় দু'সপ্তাহ হল অর্ধাহারে আছে। বুটের ঘায়ে ভাঙা বুকের পাঁজরা যখন বেদনায় টনটন করছে সেই অবস্থায় এমন ক্ষুধার পীড়ন তিলে তিলে মৃত্যুবরণেরই নামান্তর। তার ওপর যদি যোগ করা যায় যে রেললাইনে থেঁতলে যাওয়া ওর পেছনের থাবাটা মাদী নেকড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় ফের সাঙ্ঘাতিক জখম হয় এবং ফলে ওকে তিন ঠ্যাঙে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে, তাহলে ধারণা করতে অসুবিধা হয় না বিম্ যখন ওর নিজের শহরে ঢুকছিল তখন ওকে কেমন দেখাচ্ছিল।

কিন্তু পৃথিবীতে ভালোমানুষেরও অভাব নেই। শহরের একেবারে উপকণ্ঠে এসে ও একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটার একটা দরজা, একটা ছোট জানলা। বাড়ির চারপাশে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে ইট, পাথর, পাথরের ফলক, তক্তা, গুঁড়ি, লোহালক্কর এটা ওটা নানা জিনিস, আর অন্য দিকে, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা অর্ধসমাপ্ত বিশাল নতুন বাড়ি, তবে বাড়িটার জানলা দরজা নেই, ছাদও নেই। বাতাস জানলার ফোকরের মধ্যে হুটোপুটি খাচ্ছে, ইট আর পাথরের পাঁজার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে হিস্হিস আওয়াজ তুলছে, তক্তার রাশির মধ্যে গুঞ্জরণ তুলছে, টাওয়ার ক্রেনের মাথায় হু-হু হুঙ্কার তুলছে — ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তার ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠ। এই দৃশ্য বিমের কাছে আশ্চর্যের কিছু নয় (সর্বত্রই কিছু না কিছু তৈরি হচ্ছে — অবিরাম তৈরি হচ্ছে), আর সত্যি কথা বলতে গেলে কি ওর এই পথে পথে ঘোরার পর্বে একাধিকবার ও নির্মাণকর্মীদের শরণাপন্ন হয়েছে, তাদের কাছে খাবারের জন্য মিনতি

করেছে। তারা ওর ভাষা বুঝতে পেরেছে, কিছু না কিছু খাইয়েছে।

দুর্বলতার চরম সীমায় এসে অতীতের পরিচিত গন্ধের স্মৃতিতে পরিচালিত হয়ে বিম্ এখন ঐ ছোট্ট বাড়িটার, দারওয়ানের কুঠির দোরগোড়ায় লুটিয়ে পড়ল।

তখন সবে ভোর হয়েছে। হাওয়া ছাড়া আশেপাশে আর কারও কোন চিহ্ন নেই। কিছুক্ষণ বাদে দারওয়ানের কুঠুরির ভেতরে কে যেন কেশে উঠল, আপন মনে কথা বলে উঠল। বিম্ উঠে বসল এবং এবারেও সেই একই নিয়মে দরজার গা আঁচড়াল। বলাই বাহুল্য, অন্যান্য বারের মতো এবারেও দোর খুলে গেল। চৌকাটে এসে দাঁড়াল এক দাড়িওয়ালা লোক, তার মাথার কানঢাকা টুপির একটা কান নীচে নামানো, অন্যটা ওপরে উঠে আছে, গায়ে ভেড়ার চামড়ার লম্বা কোটের ওপর আঁটসাট হয়ে লেপটে আছে একটা আস্তিনছাড়া বর্ষাতি। মোটকথা লোকটার আকৃতি দেখে তার ওপর বিমের পূর্ণ আস্থা জন্মাল।

'আরে বাবাস, অতিথ দেখছি! আহা, ঘরছাড়া বেচারি, তোর দশা খারাপ বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি। তা বেশ, ইচ্ছে করলে ভেতরে আসতে পারিস।'

বিম্ দারওয়ানের ঘরে ঢুকে নীরবে শুয়ে পড়ল, চৌকাটের সামনে প্রায় মুখ থুবড়েই পড়ে গেল। দারওয়ান পাউরুটির একটা টুকরো কাটল, বালতির জলে ডুবিয়ে সেটা ভিজিয়ে নরম করে বিমের সামনে রাখল। বিম্ কৃতজ্ঞচিত্তে টুকরোটা খেয়ে নিয়ে পায়ের থাবার ওপর মাথা রাখল, তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়ো দাদুকে দেখতে লাগল।

জীবন ও সংসার সম্পর্কে ওদের কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল।

দারওয়ানের কাজ বড় একঘেয়ে, তা সে যেখানেই দারওয়ানী করুক না কেন। আর এখানে কিনা একটা জীবন্ত প্রাণী তার দিকে তাকাচ্ছে অবাক চোখে, মানুষের মতোই অবাক আর খোলাখুলি ব্যথাতুর চোখে! এমন কি সেই চোখের দৃষ্টি বিস্ময়েরই উদ্রেক করে।

'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রে কালো-কান, তোর জীবনটা কষ্টের। কষ্টটা কিসের রে?' প্রথমে সে জিজ্ঞেস করল। 'এখনও ঘর পাবার পালা আসে নি বুঝি তোর, তাই না? আমারও ভাই অবস্থাটা দ্যাখ না — কত লোকের পালা আসছে যাচ্ছে, কত লোক বাড়ি পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মিখেই যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। কত শত বাড়িই না তৈরি হল, কিন্তু আমি এই

গর্মটিঘর নিয়েই এ জায়গা ও জায়গা করছি। ধর্ তুই এখুনি এখান থেকে পালাচ্ছিস, এর পর চেষ্টা করে দ্যাখ দেখি আমাকে চিঠি লিখতে! লিখবি কোথায়? ঠিকানা থাকলে ত। আজ এই পাঁচ বছর হতে চলল ঠিকানা ছাড়া আছি। স্রেফ লিখে দাও 'মিখেই, নির্মাণ-যোজন সংস্থা-১২'। ব্যস্। অপমানের চূড়ান্ত যাকে বলে! খানাপিনার কথা যদি বল, কত চাও? — তার কোন কমতি নেই। জুতো বল, জামাকাপড় বল — তাই বা কম কিসের? চাই ত টাই ঝোলাতে পার, কপালের ওপর কানাত নামিয়ে দিয়ে কায়দা করে টুপিও পরতে পার; কিন্তু বাসস্থান বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছুই আপাতত নেই — বুঝলি কিনা? কী আর করা! সাময়িক অসুবিধা যাকে বলে। হ্যাঁ, আমার নাম হল গিয়ে মিখেই। আমি মিখেই,' আঙুল দিয়ে নিজের বুকে টোকা মেরে সে বলল, সঙ্গে সঙ্গে একটা বোতলের মুখ থেকে কিছুটা তরল পদার্থ সে গলায় ঢালল (কথা বলতে বলতে যতবার তার বলার ধক শেষ হয়ে আসছিল ততবারই সে এক ঢোক করে খেয়ে নিচ্ছিল)।

কুকুর যেমন করে বোঝে বিম্‌ও তেমনি নিজের মতো করে বেশ ভালোমতনই বুঝতে পারল মিখেইয়ের একক সংলাপ; অর্থাৎ ও বুঝতে পারল মিখেইয়ের চেহারায়, তার স্বরভঙ্গিতে, তার উদারতায় ও সারল্যে। ওর বুঝতে বাকি রইল না যে মিখেই একজন ভালো লোক। প্রসঙ্গত, কথা বোঝাটা মোটেই গুরুত্বের বিষয় নয় (কুকুরের পক্ষে বোঝার কোন দরকার পর্যন্ত হয় না), বড় কথা হল মানুষকে বুঝতে পারা। বিম্ লোকটাকে বুঝতে পারল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও ঝিমোতেও লাগল — মিখেইয়ের পরের কথাগুলো ওর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আলাপচারী সঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধাবশত ও নিদ্রা কাটানোর চেষ্টা করছিল — কখনও চোখ বন্ধ করছিল কখনও বা খুলছিল।

এদিকে মিখেই একই সুরে চালিয়ে যাচ্ছে:

'এই ধর্ তুই। তোর ঘুম পেল ত তুই ঘুমিয়ে পড়লি — কারও কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার সে উপায় নেই। আচমকা ইনস্পেকশনে এসে গেল:

"মিখেই কোথায়? নেই। বরখাস্ত করে দাও মিখেইকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বরখাস্ত করে দাও!' একটুও বানিয়ে বলছি না। চৌকিতে তোমাকে পাওয়া গেল না, কিংবা পাহারা দিতে দিতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে — ব্যস্, হয়ে গেল: 'মিখেই কোথায়? নেই। বরখাস্ত কর মিখেইকে!' এখানেই মামলা খতম।'

তন্দ্রার মধ্যে অস্পষ্টভাবে বিমের কানে কেবল ভেসে আসতে লাগল: 'মিখেই... মিখেই... মিখেই... ব্যস... ব্যস, খতম...' এই কথাগুলো।

এদিকে মিখেই আরও দু' ঢোঁক খেল, গোঁফ মুছল, রুটির টুকরোর ওপর নুন ছড়িয়ে খেতে খেতেই বিম্‌কে লক্ষ করে বলে চলল:

'তাহলে আমি তোকে বলি কালো-কান, কুকুরের কাছে মনের কথা বলা বরং ভালো: এখানে তর্কবিতর্কের কোন সুযোগ নেই — কুকুর তোমার মনের কথা আর কাউকে বলে দেবে না, অথচ তোমার মনের ভারও হালকা হয়ে গেল। এই যে আমি মিখেই — আমি হলেম গে এক চৌকিদার। আমি বন্দুকধারী। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল চোর যদি একা না হয়? তাহলে মিখেই কী করবে? কিছুই করার নেই তার। ব্যস, মামলা খতম। ...লোকে আইনের কথা বলে। আইন ত ভালোই — কাউকে যদি ধরতে পারলে ত সে হারামজাদার পাঁচ বছর কয়েদ হয়ে গেল! হুঁ-হুঁ! কিন্তু আসল কথাটা হল এই যে ব্যাটাকে আগে ধরতে হবে। কী ভাবে ধরবে? সেটাই ত কথা। এই যে তুই কুকুর। ধর্ না কেন একটা থলিতে বিশটা খরগোশ নিয়ে তাদের সবগুলোকে একসঙ্গে ছেড়ে দিলাম, তোকে বললাম ওগুলোকে ধরে আনতে। কিন্তু ওগুলো নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়ে ছুট লাগল — ব্যস, মামলা খতম। বড়জোর তুই একটাকে ধরলি। কিন্তু বাদবাকিগুলো? স্রেফ হাও-য়া!'

মিখেই এমন এক সংক্রামক হাসি হাসল যে বিম্‌কে মাথা তুলতে হল — সম্ভবত ওর নিজেরও অন্তত মুচকি হাসা উচিত।

কিন্তু বিমের সে অবস্থা ছিল না।

দরজা খুলে গেল। আরেকজন লোক এসে ভেতরে ঢুকল। এ লোকটাও চৌকিদার। সে বলল:

'বদলি। শুয়ে পড় মিখেই, তোমার ছুটি।'

মিখেই কোন রকমে গিয়ে তক্তপোষের ওপর ধপ করে শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়তেও তার দেরি হল না। এদিকে বদলি লোকটা টেবিলের ধারে মিখেইয়ের জায়গায় গিয়ে বসল, বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ পড়ল বিমের ওপর।

'এই পেঁচাটা আবার কোত্থেকে এলো?' সম্ভবত বিমের বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখজোড়ার ওপর নজর পড়তেই সে তার উদ্দেশে বলল।

ভদ্রতার খাতিরে বিম্ উঠে বসল, ক্লান্ত ভাবে লেজ নাড়াল (যেন বলতে চাইল, 'আমি অসুস্থ। প্রভুর খোঁজ করছি।')। বদলি লোকটা কিছুই

বুঝতে পারল না। অবশ্য এটা ঠিক যে অনেক লোকই কুকুরের ভাষা বুঝতে পারে না। লোকটা তাই উত্তরের বদলে দরজা খুলে বিম্‌কে পা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল।

'জঘন্য! নোংরা কোথাকার! ভাগ!'

বিম্‌ এই দৃঢ় ধারণা নিয়ে বেরিয়ে এলো যে বদলি লোকটা বাজে ধরনের। কিন্তু বেশি দূর যেতে ও পারল না — মিথেই ওকে যে জল-রুটি দিয়েছিল সেটা খেয়ে পেট ভরে ওঠার পর এখন কেন যেন আরও বেশি দুর্বল লাগছে ওর, আর আক্ষরিক অর্থেই ও চলতে চলতে ঘুমে ঢলে পড়ছে — পা আর চলে না। ঘুমের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বিম ঐ অর্ধসমাপ্ত বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছুল। ভেতরে একরাশ কাঠের ছিলকে ছিল, সেখান থেকে দেওদারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। বিম্‌ ঐ ছিলকের রাশির ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

সারা দিনের মধ্যে ওর ঘুমের কেউ ব্যাঘাত ঘটাল না। এই ভাবে ও সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ে থাকল। গোধূলি নেমে আসতে নীচের তলাটা বেশ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, সেখানে জানলার ওপর প্রায় অর্ধেক পাউরুটি দেখতে পেল, বেশির ভাগটাই খেয়ে ফেলল (যতক্ষণ পেট না ভরে ততক্ষণ খেল), বাকি ছোট অংশটা বাড়ির ভেতর থেকে বার করে এনে যেখানে ভিত খোঁড়া হয়েছে তারই পাশে নরম জমির মধ্যে পুঁতে রেখে দিল। কোন ফাঁক না রেখে বিধিসম্মত ভাবেই এ কাজ সে সম্পন্ন করল। শক্তি না থাকলে কী হবে 'দুর্দিনের কথা মনে রেখে খাবারের টুকরো মাটির নীচে রেখে দেবে' — কুকুরসমাজের এই যে নিয়ম তা মেনে চলা দরকার। এখন ওর উপলব্ধি হল যে ফের যাত্রা শুরু করা যেতে পারে। ও তাই চলল নিজের বাড়ির দরজা লক্ষ করে।

নিজের বাড়ির দরজা, ওর জীবনের সূচনাকাল থেকে শুরু করে পরিচিত সেই দরজা, যে দরজাটা পেরোলেই আছে বিশ্বাস, পূত সরল সত্য, করুণা, সৌহার্দ আর সহানুভূতি — সে সহানুভূতি এতই সহজ, এতদূর স্বাভাবিক যে এই সব ধারণার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যাওয়াই নিরর্থক। তাছাড়া অত সব ভাবনাচিন্তা করার কী দরকারই বা বিমের? প্রথমত, কুকুর জাতির একজন প্রতিনিধি বলে অমন উঁচুদরের মানবিক ভাবনা চিন্তা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ওর নিজের অগম্য মানবীয় বুদ্ধিবিবেচনার উচ্চমার্গে পৌঁছানোর চেষ্টা যদি ও করতও, তাহলে স্রেফ এই কথা

জানতে পেরেই ও মারা যেতে পারত যে লোকে তার সারল্যকে অসাধারণ ধৃষ্টতা এমন কি অপরাধজনক বলেই বিবেচনা করে থাকে। তাহলে কিন্তু বিম্ বাস্তবিকই ইতর লোককে কামড়ে বসত, অবশ্যই কামড়াত, কাপুরুষকেও কামড়াত, মিথ্যেবাদীকে — বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে। আমলাতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন লোককে ত ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলত — এরকম আরও কত কিছুই না করত। ছাইরঙাটাকে যেমন ও কামড়েছিল মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার পর, তখন কিন্তু তা না করে ও কামড়াত সচেতনভাবে, নিজের কর্তব্য পালন করছে এই বোধ নিয়ে। না, ঐ যে দরজা লক্ষ করে বিম্ চলেছে তা ওর সত্তার অংশ, ওর জীবন। এই হল শেষ কথা। দুনিয়ায় এমন কুকুর একটাও নেই যে তার সহজাত নিষ্ঠাকে সাধারণের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করে। কিন্তু কুকুরের এই উপলব্ধিকে মানুষ কীর্তি বলে তারিফ করে। মানুষ যে এরকম মনে করে তার একমাত্র কারণ এই যে বন্ধুর প্রতি অনুরাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা তাদের সকলের মধ্যে দেখা যায় না; এত ঘন ঘন, এতটা পরিমাণে ত দেখাই যায় না, যাতে মনে হতে পারে এটা মানুষের জীবনের মূল, তার অস্তিত্বের স্বাভাবিক আধার তথা শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে-দরজাকে লক্ষ করে বিম্ চলেছে সেটা ওর বন্ধুর বাড়ির দরজা, সুতরাং বিমের বাড়িরও বটে। ও চলেছে বিশ্বাস ও জীবনের দুয়ারের উদ্দেশ্যে। বিম্ চায় ওর ঐ লক্ষ্যে পৌঁছুতে — ওখানে গিয়ে ও হয় বন্ধুর জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, নয়ত মারা যাবে — শহরে ঘুরে ঘুরে বন্ধুর খোঁজ করার শক্তি আর ওর নেই। এখন ও কেবল প্রতীক্ষা করতে পারে। কেবল প্রতীক্ষাই করতে পারে।

কিন্তু ঐ রাতেও যদি বিম্ তার বাড়ি পর্যন্ত যেতে না পারে, তাহলে আমরা কী করতে পারি বলুন?

সবচেয়ে বড় কথা, ছাইরঙার এলাকার পাশ কাটিয়ে যেতে হবে, আর তা করতে হলে যেতে হয় তোলিয়াদের বাড়ির পাশ দিয়ে। অগত্যা তা-ই করতে হল। ও যখন খুদে বন্ধুর বাড়ির ফটকের কাছে এলো তখন কিন্তু ওটাকে স্রেফ অচেনা কোন বাড়ির ফটক মনে করে পাশ কাটিয়ে যেতে পারল না, কিছুতেই পারল না। উঁচু ইটের দেয়ালের ধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথাটা একপাশে কাত করে ও শুয়ে পড়ল। ওর পাশ দিয়ে যেতে গেলে লোকে ভাববে ও হয় ঘায়েল হয়েছে, নয়ত

মরতে বসেছে, নয়ত বা মরেই গেছে।

না না, কোনমতেই না, বিম্ কোনমতেই এই বাড়ির দরজার কাছে যাবে না। ও কেবল এই দেয়ালের ধারে শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম করবে, তারপর ব্যথাযন্ত্রণা ও দুঃখ একটু হালকা হয়ে গেলেই উঠে বাড়ির পথ ধরবে। আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে... এমনও ত হতে পারে যে তোলিয়া নিজে এসে এখানে দেখা দিল। ...আমরা যাকে যুক্তিতর্ক বলি বিমের কাছে তা অনধিগম্য। তাই ওর চিন্তায় যদি যুক্তিতর্কের কোন বালাই না থাকে সেজন্য কি আর আমরা ওকে দোষ দিতে পারি? তাই ও কোনরকম যুক্তিতর্ক ছাড়াই একটা শোকার্ত কুকুরের ভঙ্গিতে পড়ে রইল।

তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

একটা মোটরগাড়ি সামনে এলো। গাড়ির আলো অন্ধকারের কবল থেকে দেয়ালের একটা অংশ ছিনিয়ে নিল, তারপর গোটা বেড়ার গা হাতড়ে হাতড়ে চোখ ধাঁধানো একজোড়া আলো সোজা বিমের ওপর এসে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল। বিম্ মাথা তুলে তাকাল, যদিও চোখের পাতা ভালোমতো খুলতে পারল না। গাড়ি মৃদু ঘর ঘর আওয়াজ করে চলল, গাড়ির ভেতর থেকে কে যেন নামল। লোকটা বিমের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ধোঁয়ার গন্ধ থাকায় লোকটা যে কে বিম্ তখন পর্যন্ত ঠাহর করতে পারে নি। কিন্তু লোকটা যখন গাড়ির দুচোখের আলোর সীমানায় এসে পড়ল তখন বিম্ উঠে বসল — লোকটা আর কেউ নয়, সেমিওন পেত্রোভিচ! সেমিওন পেত্রোভিচ যখন একেবারে কাছে এসে নিশ্চিত বুঝতে পারল যে কুকুরটা বাস্তবিকই বিম তখন সে বলল:

'বেরিয়ে এসেছিস তাহলে! বোঝ কাণ্ড, অ্যাঁ!.'

গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আরও একটা লোক (যে-লোকটা ঝড়বৃষ্টির আগে গাড়ি চালিয়ে বিম্‌কে নিয়ে গিয়েছিল মাদী নেকড়ের কাছে)। কুকুরের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে সে বলল:

'বুদ্ধিমান কুকুর। নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই।'

সেমিওন পেত্রোভিচ তার কোমরের বেল্ট খুলতে খুলতে বিমের দিকে এগিয়ে গেল।

'বিম্, ওরে আমার বিম্ রে... তুই বড় ভালো রে বিম্। ...আয়, আয়, এদিকে আয়।'

উঁহু! বিম্ আর বিশ্বাস করে না, লোকটার ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই

বিমের; যদিও সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই সে এখন বিম্‌কে নিতে এসেছে তবু তার কাছে যাবে না। সেমিওন পেত্রোভিচ হয়ত ছেলের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বিম্‌কে তোলিয়ার কাছে ফিরিয়ে আনার কথাও ভেবেছিল, কিন্তু তখন আর সে সুযোগ ছিল না — বিম্ পালিয়েছে। কাছে যাওয়া ত দূরের কথা, সেমিওন পেত্রোভিচকে দেখামাত্র গাড়ির আলোয় পথ ধরে দেয়াল বরাবর উলটো দিকে ছুট দিল ও। কোথা থেকে ওর এত শক্তি এলো কে জানে!

সেমিওন পেত্রোভিচ ওর পেছন পেছন। অন্য লোকটি সামনে পথ আটকে দাঁড়াল ওকে ধরার জন্য। বিম্ সুট্ করে আলো থেকে অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে পড়ল, গুড়ি মেরে নেমে গেল একটা কাটা খাদের ভেতরে। এখানে এসে ও চলল কোন রকমে পায়ের থাবা ফেলে ফেলে পায়ে হেঁটে। কিন্তু কাটা খাদটার ভেতর ঢোকার আগে আলো পেয়ে যেদিকে ও ছুটেছিল এখন সেদিকে না গিয়ে চলল উলটো দিকে।

এবারেও বিপদের মুহূর্তে কাজে দিল পূর্বপুরুষদের আবিষ্কার — পায়ের ছাপ গুলিয়ে দাও! খরগোশ, নেকড়ে বা যে-কোন জন্তু এটাই করে থাকে — শিকারী পিছু নিলে ওরা সচরাচর এই রকম চালাকি খেলে, এটা ওদের পয়লা নম্বর চালাকি। খেঁকশিয়াল ও নেকড়ে এসব ক্ষেত্রে পায়ের ছাপের ওপর পায়ের ছাপ ফেলে এমন কৌশলে উলটো পথে যেতে পারে যে একমাত্র অভিজ্ঞ শিকারীর পক্ষেই, তাও আবার নখের দাগ লক্ষ করার পর, বোঝা সম্ভব হয় যে সে ধোঁকা খেয়েছে। দ্বিতীয় যে চালাকি ওরা খেলে তা হল ফাঁসের আকারে পাকিয়ে পাকিয়ে চলা (এই বাঁয়ে ত এই ডাইনে) কিংবা ঝট করে জায়গা বদল (উলটো দিকে পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে হঠাৎ লাফ দিয়ে একপাশে সরে যাওয়া)। তৃতীয় চালাকি হল ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা — পায়ের ছাপ গুলিয়ে দিয়ে কোন ঘন ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে কান পেতে শোনা (শিকারী যদি চলে যায়, তাহলে শুয়ে থাকা আর সে যদি সোজা তোমার দিকেই আসতে থাকে, তাহলে ফের গোড়া থেকে শুরু করা — পায়ের ছাপ গুলিয়ে দিতে থাকা)। সত্যিকারের শিকারী যারা তারা জন্তুদের এই তিনটি চালাকিই ভালোভাবে জানে। কিন্তু সেমিওন পেত্রোভিচ কস্মিনকালে শিকারী ছিল না, যদিও বন্দুক তার ছিল এবং প্রতি বছর মরশুমের শুরুতে গাড়ি চেপে শিকারের জায়গায় যেতও।

মোটের ওপর যা ঘটল তা এই রকম: সেমিওন পেত্রোভিচ এবারে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে একদিক ধরে ছুটল, আর বিম্ ছুটল তার উলটো দিক ধরে। তাও আবার কাটা নালাটা ওকে আড়াল দিয়ে বাঁচাল।

দেখতে দেখতে নালাটা শেষ হয়ে গেল। বিম্ এখন এসে ঠেকল একটা খাড়া দেয়ালের গায়ে। দেয়ালের একপাশে ঝুলছে এক এক্সক্যাভেটরের যান্ত্রিক বেলচা। এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা ওর পক্ষে সম্ভব নয় — নীচের দিকে নামতে অবশ্য ও পারে, কিন্তু ওপরে ওঠার মতো শক্তি ওর নেই — পাশে দেয়াল, সামনেও দেয়াল। ও যদি সুস্থ থাকত, চারটে পা যদি ওর অটুট থাকত, তাহলে কথা ছিল, কিন্তু এখন ও কেবল হেঁটে বেরিয়ে আসতে পারে — লাফিয়ে ওপরে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের বিম তাই ঐ জায়গায় বসে বসে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল এক্সক্যাভেটরের যান্ত্রিক বেলচাটা, কোন রকমে সামনের দুই পা দেয়ালে ঠেকিয়ে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, নালার এক পাশে স্তূপাকার করা মাটি নজর করে দেখল, তারপর আবার বসে পড়ল। দেখে মনে হচ্ছিল ও বুঝি ভাবছে, কিন্তু আসলে ও কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিল ওরা এখনও ওর পিছু ধাওয়া করছে কিনা। পরে আবার উঠে দাঁড়াল উলটো দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে। এই পাশটায় মাটির স্তূপ ছিল না। বিম্ লক্ষ করল টর্চের আলো একই জায়গায় ছটফট করছে, এদিক ওদিক হেলছে-দুলছে। শেষকালে তাও নিভে গেল। বিম্ এও দেখতে পেল যে মোটরগাড়িটা ফিরে চলল, পাশ দিয়ে চলতে চলতে ওটা ওর খুব কাছাকাছি এগিয়ে আসতে লাগল। বিম্ নালার এক কোণ ঘেঁসে বসে রইল, কাঁপতে কাঁপতে আওয়াজ শুনতে লাগল। গাড়ি ওর একেবারে কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আশপাশের সর্বত্র সুনসান। যেটুকু আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তা আসছিল দূর থেকে — মোটরগাড়ির মৃদু সংক্ষিপ্ত গুঞ্জন, ট্রামগাড়ির ঘর্ঘর — সবই পরিচিত, কোনটাই অনিষ্টকর নয়।

শরতের এক ঠান্ডা অন্ধকার রাতে নালার মধ্যে বসে আছে এক কুকুর। এই দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে এখন ওকে সাহায্য করতে পারে। অথচ সাহায্য ওর দরকার, বড় দরকার — ওকে যে পৌঁছুতেই হবে ঐ দরজাটার কাছে! বিম্ লাফিয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পড়ে গেল। ওর সাধ্য কি! অনন্যোপায় হয়ে ও নিজেরই পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে নিঃশব্দে,

সন্তর্পণে চলতে লাগল উলটো পথে। চলতে চলতে কান পেতে শুনতে লাগল, সেই সঙ্গে থেকে থেকে দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল। এক জায়গায় ও দেখতে পেল ওপর থেকে কিছু মাটি ঝরে পড়ে একটা ছোট ঢিবিমতন হয়েছে। ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে পেছনের পায়ের একটা থাবার ওপর ভর দিয়ে সামান্য উঠল -- এবারে সামনের দুই পা দিয়ে বাইরের মাটির স্তূপটা ধরে ফেলল। বিম্ ওপর থেকে মাটি টেনে টেনে নীচে, নিজের পায়ের তলায় জড় করতে লাগল। যত বেশি থাটে ততই বেশি করে মাটি জড় হয় ওর পায়ের তলায়। বিম্ খানিকটা বিশ্রাম করে, আবার কাজ করে। শেষ পর্যন্ত ওর পক্ষে নালার কিনারায় বুক ঠেকানো সম্ভব হল, কিন্তু তাহলে কী হবে, এখন আবার নালার বাইরের স্তূপ থেকে মাটি ঢালার উপায় নেই — মাটির নাগাল ও পাচ্ছে না। বিম্ ওর ছোট ঢিবি থেকে নীচে নেমে এসে শুয়ে পড়ল। কী ইচ্ছেই না করছিল করুণ স্বরে ডাক ছাড়তে, প্রভুকে কিংবা তোলিয়াকে ডাকতে, এত জোরে বিলাপ করতে যাতে শহরের সমস্ত লোকজন জেগে ওঠে! কিন্তু বিম্ চুপ করে থাকতে বাধ্য -- ও যে পায়ের ছাপ গুলিয়ে দিয়েছে, গা ঢাকা দিয়েছে! হঠাৎ মনে মনে একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল, যে টিলাটা ও নিজে তৈরি করেছিল সেটা থেকে পিছু হটে গিয়ে, ব্যথা বেদনার কথা ভুলে গিয়ে সমস্ত শরীর দুলিয়ে এক ঝটকায় ধপ করে গিয়ে পড়ল টিলার ওপরে, পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নালার ঠিক কিনারে সেই গর্তটার মধ্যে, নিচে মাটি ফেলতে গিয়ে ও নিজেই যেটা খুঁড়েছিল।

এমন অসহ্য যন্ত্রণা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও সে কী করে এই অসাধ্য সাধন করতে পারল কে জানে? ধরুন না কেন, কোন নেকড়ের পা ফাঁদে চিপটে গেলে কী করেই বা সে ছাড়া পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে নিজের পায়ের থাবা নিজেই কামড়ায়? নিজের দাঁত দিয়ে নিজেরই ঠ্যাঙ কামড়ান — এটা কী করে সম্ভব কেউ বলতে পারে না, জানে না। কেবল এটাই অনুমান করা যেতে পারে যে নেকড়ে এমন কাজ করে মুক্তির জন্য তার সহজাত প্রবৃত্তির বশে, আর বিম্ যেখানে সহৃদয়তা আছে, আস্থা আছে সেই বাড়ির দুয়ারে পৌঁছানোর এক অদম্য প্রেরণার বশে বিস্মৃত হয়েছে নিজেকে।

যে কারণেই হোক, বিম্ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে ওপরের সেই গর্তটার মধ্যে শুয়ে থাকল।

ঠাণ্ডা রাত। ইট-পাথর-লোহার শহর ঘুমোচ্ছে, রাতের বেলায়, এমন কি

ঘুমের ঘোরেও অস্ফুট কড়কড় ঘরঘর আওয়াজ তুলছে। বিম্ আরও অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে শুনল, ঠাণ্ডায় ওর কাঁপুনি উঠল। শেষকালে ফের যাত্রা শুরু করল।

পথে ও একটা বাড়ির সদরের খোলা দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ল। একমাত্র কারণ এই যে একটু না শুয়ে উপায় ছিল না — অন্তত খুব কম সময়ের জন্য হলেও — এতই দুর্বল ও হয়ে পড়েছে। সরাসরি রাস্তায় ত আর শুয়ে পড়া যায় না — মারা যাওয়ার সম্ভাবনা (গাড়ি চাপা পড়া কুকুর অনেকবার ও দেখেছে)। তাছাড়া অ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তা ঠাণ্ডাও। কিন্তু এই সদর দরজার ভেতরে একটা গরম রেডিয়েটরে গা ঠেকিয়ে ও দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে এক অচেনা-অজানা বাড়ির সদর দরজার ভেতরে ঘুমোচ্ছে এক অচেনা-অজানা কুকুর।

এমন ঘটনা ত ঘটেই।

দুঃখ দেবেন না অমন কুকুরকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শেষ দুয়ারের প্রান্তে। লোহার গাড়ির রহস্য

বিমের যখন ঘুম ভাঙল তখনও ভোরের আলো দেখা দেয় নি। এমন আরামের গরম আর অতিথিবৎসল জায়গা ছেড়ে যেতে ওর ইচ্ছে করছিল না। এখানে কেউ ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় নি। ওর মনে হল যেন গায়ে বল ফিরে এসেছে। পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু চট করে তা হল না দেখে ও উঠে বসল। উঠে বসলে কী হবে ওর মাথা কিন্তু ঘুরতে লাগল (যেমন হয়েছিল বুকে লাথি খাবার পর সেই মাঠে): দেয়ালগুলো টাল খেয়ে পড়ে গেল, সিঁড়ির রেলিং কাঁপতে লাগল; ধাপগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা নিরেট পাহাড়ের আকারে যেন ওপরে উঠে গেছে, ওঠা-পড়া করছে একটা হাঁপরের মতো, মাথার ওপরকার ছাদ এবং সেই সঙ্গে ল্যাম্পও দুলছে। বিম্ বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল, ভাবতে লাগল এর পর ওর কী হবে। ও বসে রইল মাথা হেঁট করে।

মাথা ঘোরাটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। বিম্ এবারে বুকে হেঁটে ধাপ বয়ে বয়ে নীচে নেমে এলো। সদরের দরজাটা খোলাই ছিল, বিম্ তাই হামা দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রাণ জুড়ানো ঠাণ্ডার মধ্যে খানিকক্ষণ শুয়ে রইল, শেষ পর্যন্ত পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হল। ওর চেতনা তখন প্রায় লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা, আর সেই জন্যই কোন বেদনা বোধও ওর ছিল না। কুকুরের যে অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি মানুষের অজ্ঞাত, তারই আজ্ঞানুবর্তী হয়ে এই অবস্থায়ও বিম্ একটা পাগলা কুকুরের মতো টলতে টলতে চলল।

হঠাৎ একটা আবর্জনাস্তূপ যদি বিমের চোখে পড়ে না যেত, তাহলে ও হয়ত বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেই পারত না। একটা ছোট্ট কুকুর সেখানে আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। তা দেখে বিম্ সামনে এসে বসে পড়ল। কুকুরটা আলুথালু, অপরিচ্ছন্ন। বিম্‌কে শুঁকে দেখে সে লেজ নাড়াল।

আলুথালু এই ভঙ্গিতে বিম্‌কে জিজ্ঞেস করল:

'তুই কোথায় চলেছিস?'

বিম্ সঙ্গে সঙ্গে আলুথালুকে চিনতে পারল — সেই দিন ঘাস-জমিতে ওটা যখন নলখাগড়ার ডাঁটা চিবোচ্ছিল তখন বিমের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। এই জন্য বিম অসন্দিগ্ধভাবে, বেদনার সঙ্গে, কেবল চোখের দৃষ্টিতে তাকে জানাল: 'প্রিয় বান্ধবী গো, আমার দশা খারাপ।'

কুকুরটা ফের আবর্জনাস্তূপের কাছে ফিরে গেল, সেখানে গিয়ে অনেকটা যেন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর ভঙ্গিতে বিমের দিকে মাথা ঘুরিয়ে লেজ নাড়াতে শুরু করল — যার অর্থ হল 'এখানে কিছু আছে। চলে এসো।'

তারপর কী হল বলে আপনাদের ধারণা? এটা-ওটা, এর টুকরো, তার খোসা, হেরিং মাছের মাথাটা — শেষ পর্যন্ত বিমের পেট ভরে গেল। অল্প অল্প করে শরীরে বল ফিরে আসছিল। শিগগিরই ঠোঁট চাটতে চাটতে আলুথালুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও নিজের পথ ধরল, তবে এবারে অনেক বেশি শক্তভাবে পা ফেলতে পারল।

না, জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে আস্তাকুড় নেহাৎ হেলাফেলার জিনিস নয়। এই সময় থেকে এ ধরনের জায়গার প্রতি বিম্ হয়ত শ্রদ্ধাশীলই হয়ে পড়ত, যদি না...

কঠিন, বড় কঠিন সেই বিবরণ দেওয়া।

ভোরের আলো ফোটার আগে ধূসর বর্ণের সেই প্রত্যূষে যখন গতকালের ধোঁয়াসার অবশেষ হালকা স্বচ্ছ নীল ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে মাটির গায়ে এসে বসেছে, ঠিক সেই সময় বিম্ পৌঁছাল, অবশেষে এসে পৌঁছাল তার নিজের বাড়িতে। ...এই ত বাড়িটা! এই সেই জানলা, যে-জানলা দিয়ে সে আর ইভান ইভানভিচ অনেক সময় সূর্যোদয় দেখত, উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকত। এমন কি হতে পারে না যে আজও তার প্রভু জানলার ধারে এলো? বিম্ রাস্তার উলটো দিকে বসে রইল, বসে বসে দেখতে লাগল। এখন দেখতে লাগল আশা আর আনন্দ নিয়ে। ওর বেশ লাগছিল। এবারে রাস্তা পার হয়ে চলল। কোন তাড়াহুড়ো করল না বটে, কিন্তু চলল মাথা উঁচিয়ে, যেন মৃদু হাসতে হাসতে, যেন এখুনি, যে-কোন মুহূর্তে দেখা হয়ে যেতে পারে অবিস্মরণীয় বন্ধুটির সঙ্গে। এটা ছিল এক সুখ-প্রতীক্ষার ক্ষণ। তাছাড়া এমন কোন্ জীবিত প্রাণী আছে যার কাছে সুখের পরমক্ষণটির চেয়ে প্রতীক্ষার ক্ষণটি বেশি মধুর নয়?

তাই বিম্ যখন রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায়, যখন তার নিজের বাড়ির সামনে, সেই দরজাটা যখন আর বেশি দূরে নেই তখন আবার নতুন করে আশার আলো জেগে উঠতে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিল বিমের।

কিন্তু এর পরই হঠাৎ যা ওর চোখে পড়ল সেটা ভয়াবহ। বাড়ির বড় ফটক থেকে বেরিয়ে এলো সেই খুড়ী, বয়স্থা স্ত্রীলোকটি! বিম্ বসে পড়ল, আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল, তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। স্ত্রীলোকটি বিমের দিকে একটা ইট ছুঁড়ে মারল। বিম্ চটপট উলটো দিকের ফুটপাতে সরে গেল।

এত সকালে রাস্তায় কোন লোক ছিল না, এমন কি ঝাড়ু হাতে ঝাড়ুদারেরাও বের হয় নি। কেবল সেই বয়স্থা স্ত্রীলোকটি আর বিম্ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে চোখে চোখ রেখে। স্পষ্টই বোঝা গেল স্ত্রীলোকটি ঠিক করেছে যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, বিম্‌কে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। এমন কি ব্যবস্থাটাকে পাকাপোক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে আরও চওড়া করে ছড়িয়ে রাখল দুই পা, মুঠিবদ্ধ হাত কোমরে ঠেকিয়ে ফটকের মাঝখানটায় মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। উদ্ধত ভঙ্গিতে, তাচ্ছিল্য ও অবহেলা ভরে, দেমাক দেখিয়ে সে তাকাল বিমের দিকে; সে যেন নিজের যোগ্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও ন্যায়বোধ সম্পর্কে রীতিমতো সচেতন। অন্যদিকে বিম্

নিতান্ত অসহায়, তবে তার থাকার মধ্যে আছে কেবল দাঁত — সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, তাছাড়া ভয়-জাগানোও বটে — বিশেষত মরণকামড় বসানোর সময়। ও সেটা জানত, সে কথা ও ভুলে যায় নি, তাই মাথাটা ও সামান্য ঝুঁকিয়ে পর্যন্ত নিল এবং ওপরের ঠোঁট খানিকটা উঠিয়ে সামনের দাঁত বার করল। মানুষ আর কুকুর একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। একেকটি মিনিট বিমের কাছে দীর্ঘ মনে হতে লাগল।

...মানুষ আর কুকুর যতক্ষণ তীক্ষ্মদৃষ্টিতে একে অন্যের সামান্যতম গতিবিধি লক্ষ করে যাচ্ছে ততক্ষণ আসুন এই বয়স্থা স্ত্রীলোকটির দিকে নজর দেওয়া যাক, যদিও ইতিপূর্বে বিম্ সম্পর্কিত এক ঘটনাপ্রসঙ্গে আমরা তার খানিকটা পরিচয় পেয়েছি। স্ত্রীলোক পুরো মাত্রায় স্বাধীন, মুক্ত নারী — পুঁজিবাদের শোষণ থেকে যেমন মুক্ত তেমনি সমাজতন্ত্রের প্রতি কর্তব্যের সামান্যতম বোধ থেকেও মুক্ত, শ্রমের বন্ধন থেকে মুক্ত। তবু একটা জিনিসের দাসত্ব কিন্তু তার না মেনে উপায় ছিল না — সেটা হল ক্ষুধার দাসত্ব; যদিও সেই দাসত্বের যোয়াল তার চোখে পড়ত না। এছাড়া তার নিজস্ব কিছু কর্তব্যও ছিল। যেমন এই জনাকীর্ণ বাড়িটার ভাড়াটিয়াদের সকলের আগে, ভোরের আলো ফোটার আগেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়ত। যে-কাজগুলোকে সে নিজের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করত সেগুলো এই রকম: নজর করে দেখা এত ভোরে কোন্ সদর দরজা থেকে বাইরের কোন্ লোক বের হল; সবাই যখন ভোর রাতের গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন সেই সময় কার জানলার আলো জ্বলছে; কে মাছ ধরতে অথবা পশুপাখি শিকারে গেল — কার সঙ্গে গেল; অন্ধকার থাকতে থাকতে প্রথম কে, কী নিয়ে গেল আস্তাকুড়ে ফেলতে। পরে আস্তাকুড়ে কী ফেলা হয়েছে সেটা দেখার পর সে নির্ধারণ করে কী ঘটেছে: বোতল যদি হয় তার মানে বৌয়ের কাছ থেকে গোপন করছে; পরার অনুপযোগী পুরনো ওভারকোট হলে বুঝতে হবে লোকটা হাড়কেপ্পন, ঘরে যত রাজ্যের আজেবাজে কাপড়চোপড় জমিয়ে রাখা অভ্যাস; দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস ফেলে দিয়েছে? — তবে ত বাড়ির গিন্নীটা একেবারেই হাঁদা, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যদি কোন কমবয়সী মেয়ে ভোরের আলো ফোটার আগে আগে বাড়ি ফিরে আসে, তাহলে ত কোন কথাই নেই! খুড়ীকে তখন আর পায় কে! কুকুর আর কুকুরের মালিকদের সে দু' চক্ষে দেখতে পারত না। তাই তাদের ওপর নজর রাখা সম্ভবত তার কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এই

দায়িত্ব পুরো করার জন্য সে ঐ সমস্ত লোকজনের উদ্দেশে কিছু অশ্লীল মন্তব্যও ছুঁড়ে দিত। প্রসঙ্গত, গালাগালির যেরকম অফুরন্ত ভাণ্ডার তার ছিল তা তার অসাধারণ স্মরণশক্তি ও পাণ্ডিত্যই প্রমাণ করে।

দৈনন্দিন তথ্য বিনিময়ের জন্য এসবই ছিল একান্ত জরুরী। তারই মতো আরও কিছু স্বাধীন, মুক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সযত্নে-রঙ-করা বেঞ্চিতে দীর্ঘ সময় ধরে বসে বসে সে রিপোর্ট দিয়ে যেত কে কী লোক; সে বৈঠকে কোন ব্যক্তি যেমন বাদ যায় না, তেমনি কোন বস্তুও বাদ যায় না। প্রতিভা আর কাকে বলে! ছাপা না হয়েও এই রকম সংবাদ-বুলেটিন নিয়মিত প্রকাশিত হত। আর এটা সে সমাজের প্রতি তার দ্বিতীয় কর্তব্য বলে মনে করত। এমন কি আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কেও সে এই রকম ওয়াকিবহাল (নিজের কানে শুনেছে যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে, তাই খুদ কণা, নুন এই সব মজুত করা দরকার)। তারই মতো আরও কয়েকজন স্ত্রীলোকের সক্রিয় সহযোগিতায় গুজব আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ে — তবে এখন বলা হয় ওটা শোনা গেছে 'অমুক লোকের' মুখে — উনি একজন 'পণ্ডিত লোক', আজেবাজে কথা বলবেন না, 'নিজের কানে শুনেছেন' ইত্যাদি।

এসব সত্ত্বেও, আগেই আমরা যেমন শুনেছি, স্ত্রীলোকটি নিজেই নিজেকে একজন 'সোভিয়েত নারী' বলে উল্লেখ করে থাকে, এই নিয়ে তার গর্বেরও অন্ত নেই। তার দৃঢ় ধারণা এই যে কথাটা সত্য, এবং তার কট্টর বিবেক অপরের অনুকরণযোগ্য আদর্শ ছাড়া আর কিছু নয়। এই স্ত্রীলোকটির যদি কোন সন্তান থাকত, তাহলে বড় হয়ে সে একটা মানুষের মতো মানুষ হত বটে!

কিন্তু সপ্তাহে দুটো দিন ছিল তার ছুটির দিন — রবিবারে যৌথখামারের কৃষকদের কাছ থেকে সে বাজারে এটা-ওটা কিনত, আর সোমবারে সেগুলোই বেচত। তাই নিজের কোন মুরগী, সবজিবাগান বা মাছধরার জাল না থাকলে কী হবে মুরগীর ডিম, এমন কি মুরগী এবং টমেটো, তাজা মাছ ইত্যাদি, অর্থাৎ মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য যাবতীয় সামগ্রী সে বিক্রি করত। এই তৃতীয় কর্তব্যের কৃপায় (মনে রাখবেন, ছুটির দিনে!) তার পাশ-বুক ছিল, বেশ সচ্ছলতার মধ্যেই তার জীবন কাটত, ফলে কস্মিনকালে কোথাও তাকে কাজ করতে হয় নি। যে ফ্ল্যাটে সে থাকত সেটা তার উঁচু সাংস্কৃতিক মানের উপযোগী যাবতীয়

সুযোগসুবিধাযুক্ত (দুটো সাইডবোর্ড, তিনটে আয়না, 'যুবতী ও রাজহংস' নামে বাজার থেকে কেনা একটা ছবি, মাটির তৈরি একটা বিশাল ঈগল পাখি, কাঠের ছিলকের কিছু ফুল, যা কোন কালে নষ্ট হয় না, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন) যা যা দরকার সে সবই তার ছিল, এমন কোন জিনিসই ছিল না যার দরকার হয় না।

যাই হোক এই খুড়ী এখন ফটকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এড়িয়ে ভেতরে ঢোকে বিমের সাধ্য কী! বিমের চলে যাওয়া দরকার, এখান থেকে সরে পড়া দরকার, কিন্তু নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এটা কী করে হয়? সে ঐ রকম দাঁত খিঁচিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে, অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না তার শত্রু সরে যায়, অপেক্ষা করবে, তা এর জন্য যত সময়ই লাগুক না কেন। দেখা যাক কে কার ওপরে টেক্কা মারতে পারে!

এমন সময় ধূসর বর্ণের ঠাণ্ডা কুয়াশার মধ্যে দেখা দিল একমাত্র একটি গাড়ি — চারদিক ঢাকা একটা ভ্যান। গাড়িটা আচমকা এসে থেমে গেল খুড়ী আর বিমের মাঝখানে। গাঢ় ছাইরঙা গাড়ি, আগাগোড়া টিনের পাতে মোড়া, কোন জানলার বালাই নেই। গাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে সোজা হাঁটা দিল খুড়ীর দিকে। বিম্ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

ওদের দুজনের মধ্যে যে-লোকটির গোঁফ আছে সে ইঙ্গিতে বিম্‌কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কার কুকুর?'

'আমার,' বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে উদ্ধত ভঙ্গিতে খুড়ী উত্তর দিল।

অল্পবয়সী দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করল:

'সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না কেন তাহলে?'

'সরানোর চেষ্টা করেই দেখ না। দেখতে পাচ্ছ না দড়ির টুকরো ওর গলায় ঝুলছে — দাঁত দিয়ে কেটে পালিয়েছে। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই কামড়াতে যাচ্ছে। হারামজাদাটাকে পাগলা রোগে ধরেছে। নির্ঘাত পাগলা হয়ে গেছে ওটা।'

গোঁফওয়ালা তার সঙ্গীকে বলল:

'বেঁধে ফ্যাল্। ওটাকে তুলে নিতে হবে।'

'আমি নিজে লিখে জানিয়েছি। নিজে অফিসে পর্যন্ত গেছি, বলেছি ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু কিসের কী! যেখানেই যাও কেবল আমলাতন্ত্র —

আমলার ওপর আমলা!' বলতে বলতে সে গলা চড়িয়ে দিল: 'জেরবার করে দিল আমলাগুলো।'

'নে, শুরু কর্,' গোঁফওয়ালা লোকটা তার গোঁফছাড়া সঙ্গীকে বলল।

সঙ্গী গাড়ির ভেতর থেকে ছোট বোর-এর একটা বন্দুক বার করে আনল, এদিকে গুঁফো ভ্যান-এর একপাশের খোপ থেকে বার করল একটা লম্বা ডাণ্ডা। ডাণ্ডার আগায় একটা বেড়ের সঙ্গে জাল আটকানো — দেখতে অনেকটা প্রজাপতি ধরার জালের মতন, কেবল আকারে বড় — এত বড় যে তা দিয়ে ভেড়ার মতো আকারের প্রজাপতি ধরা যায়। প্রথম এগিয়ে এলো বন্দুকধারী লোকটা, তার পেছন পেছন জাল বাগিয়ে ধরে দ্বিতীয় জন।

বিম্ বন্দুক দেখতে পেল। বন্দুক দেখে ও লেজ নাড়াল। এই ভঙ্গির সাহায্যে ও যেন বলতে চাইল: 'বন্দুক! বন্দুক! হ্যাঁ, জানি আমি বন্দুক দিয়ে কী হয়!'

'আহ্লাদে ডগমগ দেখছি,' ছোকরা বলল। 'পাগলা কুকুর মোটেই না! আচ্ছা, বেশ, চলে আয়।'

গুঁফো লোকটা সামনে এলো। বিম্ টের পেল লোকটার গা থেকে কুকুরের গন্ধ আসছে।

'হ্যাঁ, তোমরা সবাই ভালো লোক— অবশ্যই ভালো লোক!' বিমের সমস্ত চেহারায় যেন তার এই মন্তব্যই প্রকট হয়ে উঠল।

এমন সময় বন্ধ গাড়িটার মধ্যে একটা কুকুর শোকে ও হতাশায় ব্যাকুল হয়ে আর্তনাদ করে উঠল। বিমের বুঝতে বাকি রইল না — প্রতারণা। এমন কি বন্দুকও ··· সবটাই একটা ছলনা! ও চট করে একপাশে সরে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সুযোগ ততক্ষণে ফসকে গেছে — জালের ঘের ওর ওপর এসে পড়ল। বিম্ ওপরের দিকে লাফাল। ও আষ্টেপৃষ্ঠে জালে আটকে গেছে।

বিম্ দড়ি কাটবার চেষ্টা করল, দাঁত ঘষল, ভাঙা গলায় বিকট আওয়াজ ছাড়ল, এদিক-ওদিক সমানে ছটফট করতে লাগল, ওর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল — দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওর খিঁচুনি ধরেছে। দেখতে দেখতে ওর শেষ শক্তিও ফুরিয়ে এলো, শিগগিরই ও শান্ত হয়ে এলো। কুকুর-শিকারীরা ডাণ্ডাসুদ্ধ জালটাকে গাড়ির দরজার ভেতরে গলিয়ে দিয়ে বিম্‌কে মেঝের ওপর ঝেড়ে ফেলে দিল।

দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

খুড়ীকে হঠাৎ বেশ খুশি হয়ে উঠতে দেখে গুফো তার দিকে ফিরে বলল:

'অমন দাঁত বের করার কী আছে শুনি? একটা কুকুরকে দেখাশোনা করার মুরোদ নেই ত ওটাকে অন্তত কষ্ট না দিলেও ত হত। নিজে ত দিব্যি খেয়েদেয়ে কোলাব্যাঙের মতো চেহারাখানা বানিয়েছ, এদিকে কুকুরটার দফা রফা করেছ — দেখে ভয় হয় — কুকুর বলে মনে হয় না।'

(লোকটার পর্যবেক্ষণক্ষমতার তারিফ করতে হয় — খুড়ীর কিনার-ঝোলা বড় বড় ঠোঁট, থ্যাবড়া নাক আর ড্যাবডেবে চোখজোড়া দেখে বাস্তবিকই কোলাব্যাঙের চেহারা মনে পড়ে যায়)।

'তবে রে পাজী, ইতর, নোংরা কুকুরওয়ালা, তোর এত দূর আস্পর্ধা যে আমাকে, একজন সোভিয়েত নারীকে অপমান করিস!' তারপরই শুরু হয়ে গেল, যেমন বরাবর হয়ে থাকে — মুখের লাগাম টানার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বর্ষণ করে চলল চোখা চোখা বাক্যবাণ। যে-সমস্ত কথা কাগজে লেখা যায় না সেগুলো এমন অবাধে, এত অনায়াসে, এমন কি যেন স্বচ্ছন্দে ও প্রবল তোড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল যে মনে হচ্ছিল বুঝি সেগুলো তার মাথার ভেতরে আগে থাকতেই পোরা ছিল —বোতাম টেপার অপেক্ষামাত্র।

'অসভ্যতা করো না!' ছোকরা চেঁচিয়ে বলল খুড়ীকে লক্ষ করে। 'অসভ্যতা করলে এই জাল ফেলে দিয়ে ধরে লোহার বাক্সের ভেতরে পুরে ফেলব। তোমার মতন লোকদের বছরে অন্তত এক হপ্তার জন্যে এই এরকম লোহার ভ্যান-এর মধ্যে আটকে রাখতে হয়।' কথাগুলো বলতে বলতে ছোকরা কিন্তু সত্যি সত্যিই ঘেরাটোপ লাগানো ডান্ডাটা বাগিয়ে ধরে সোজা তার দিকে পা বাড়াল।

খুড়ী ছুটল অপমানিত হওয়ার জন্য প্রতিবাদ লিখতে। প্রতিবাদটা সে লিখল নগর সোভিয়েতের সভাপতি মশাইয়ের নামে, লেখার মধ্যে সেই কুকুর-ধরা লোকদুটোকে ত ঠুকলই, সভাপতি মশাইকেও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম ঠুকল না। খুড়ী নিজে কোন রকম দায়-দায়িত্বের ধার ধারে না, সমাজের কাছে নিজের আচরণের কোন কৈফিয়ত দিতে সে নারাজ, অথচ অন্য সকলের কাছ থেকে কৈফিয়ত ঠিক দাবি করে। এই শেষ কাজটা ছিল তার কর্তব্যের একটা অংশ — সমাজের যে-কোন পরজীবী অবশ্য তা-ই করে থাকে।

... সে দিন সকালে সূর্য উঠেছিল —বড় আর হলুদ রঙের, আসন্ন শীতের সূর্য যেমন হয় তেমনি ঠান্ডা আর নিরানন্দ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এমনই নিষ্প্রাণ-নিস্তেজ ভাবে ভোরের ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশাকে সে তাড়া দিল যে শহরের মাথার ওপর এখানে-ওখানে কুয়াশার ছেঁড়া-ছেঁড়া নীলাভ রেশমী টুকরো থেকেই গেল — কোন রাস্তায় আলো, কোথাও বা ঘোলাটে-ঘোলাটে ধূসরতা।

টিনের পাতে মোড়া গাঢ় ছাইরঙা বন্ধ গাড়িটা শহরের বাইরে এসে পড়ল, তারপর মোড় নিয়ে ঢুকল একটা প্রাঙ্গণে, যেখানে চারদিকে উঁচু বেড়ায় ঘেরা মাত্র একটি দালানই খাড়া ছিল। ফটকের ওপর বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে: 'অনধিকারীর প্রবেশ নিষেধ — স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।' জায়গাটা ছিল কোয়ারেণ্টাইন-স্টেশন, যেখানে পাগলা কুকুরদের নিয়ে এসে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলা হয়। নানা রকম সংক্রামক রোগ ও মহামারী ছড়াতে পারে বলে রাস্তার কুকুরদেরও ধরে এখানে আনা হয় — এগুলোকে অবশ্য পুড়িয়ে মারা হয় না, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হয়, অথবা কাজে লাগানোর জন্য এদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। সংক্রামক রোগাক্রান্ত অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা হয় — অবশ্য যদি চিকিৎসার যোগ্য বলে তাদের মনে করা হয়। যেমন, কোন ঘোড়াকে নিয়ে আসা হলে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে; তাকে মেরে ফেলা হয় একমাত্র একটি ক্ষেত্রেই — যখন সে অশ্বগ্রন্থি রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগ আজকাল অতি বিরল, যেহেতু ঘোড়ার সংখ্যাও অনেক কমে এসেছে — অশ্বগ্রন্থি রোগে আক্রান্ত হওয়ার মতো কোন ঘোড়া আর নেই।

যে দুজন লোক বিম্‌কে ধরে এনেছিল তারা ছিল এই স্টেশনের অতি সামান্য দুজন কর্মী। লোক তারা মোটেই খারাপ নয়। শুধু তা-ই নয়, যে-কোন সময় কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার বা পাগলা কুকুরের কামড় খাওয়ার বিপদ তাদের আছে। ওরাই রাস্তার ভবঘুরে কুকুরদের রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে নিয়মিত ভাবে শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে, অথবা কুকুরের মালিকের ব্যক্তিগত আবেদনের ভিত্তিতে কুকুর ধরে নিয়ে যায়। ওরা নিজেদের এই কর্তব্যকে অপ্রীতিকর ও কঠিন বলে মনে করে, যদিও একেকটি কুকুর ধরা বাবদ তারা নিয়মিত মাইনের ওপর ভাতাও পায়।

কখন, কী ভাবে লোহার বন্ধ গাড়িটা প্রাঙ্গণে এসে ঢুকল এবং গাড়ি

থেকে ঐ দু'জন লোক নেমে চলে গেল — এসবের কিছুই বিম্‌ জানতে পারল না। ওর তখন চেতনা ছিল না।

দু'-তিন ঘণ্টা বাদে সংজ্ঞা ফিরে এলো আমাদের বিমের। ওর পাশে বসে ছিল ওর পুরনো পরিচিত সেই আলুথালু, যার সঙ্গে ওর ভোরবেলায় দেখা হয়েছিল আস্তাকুড়ের কাছে। এখন সে বিমের নাক ও কান চাটছে।

কুকুর এক অদ্ভুত প্রাণী! মা-কুকুরের কোন বাচ্চা যদি মারা যায় তখন বাচ্চার মা তার নাক চাটে, কান চাটে, অনবরত চেটেই চলে, তার পেট মালিশ করে। অনেক সময় দেখা যায় এর ফলে কুকুরছানার প্রাণ ফিরে এসেছে। আর মালিশ ত কুকুরদের কাছে বস্তুত সদ্যোজাত কুকুরছানাকে পরিচর্যার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণ্য। এসবই অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক।

আলুথালু যে বিম্‌কে চাটছিল এর পেছনেও কাজ করছিল প্রকৃতির সেই সহজাত প্রেরণা, যা আমাদের অজ্ঞাত। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল ভবঘুরে জীবনযাত্রার ফলে অভিজ্ঞতা তার নেহাৎ কম নেই, আবার এমনও হতে পারে যে এখানে সেই এই প্রথম আসে নি। কিছুই বলা যায় না।

দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ বিমের ওপর এসে পড়ল।

ও মাথা তুলল। লোহার বন্দীশালায় কেবল ওরা দুজন — ও আর আলুথালু। বুকের ভেতরকার ব্যথা দমন করে বিম্‌ শরীরের অবস্থান পালটানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ওর প্রথম প্রচেষ্টা সফল হল না। তবে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ও চারটে থাবাই নিজের শরীরের নীচে গলিয়ে দিতে সক্ষম হল, ফলে এতক্ষণ যে ঠান্ডা লোহার ওপর ও পড়ে ছিল সেখান থেকে শরীরের এক পাশ মুক্ত করে ফেলল। আলুথালুও ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বিমের কাছ ঘেঁষে এসে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। এই ভাবে দুজনে দুজনকে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকায় আগের চেয়ে খানিকটা গরম অনুভব করা যাচ্ছিল।

দুই কুকুর লোহার বন্দীশালার মধ্যে বসে বসে নিজেদের অদৃষ্টের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

বিম্‌ সর্বক্ষণ তাকিয়ে রইল দরজার দিকে, রোদের সরু ফালিটার দিকে — একমাত্র আশার আলো। এমন সময় অদূরে কোথায় যেন একটা তীক্ষ্ম গুলির আওয়াজ শোনা গেল। বিম্‌ চমকে উঠল। ওঃ কী পরিচিতই না এই আওয়াজ! ওর মনে পড়ে গেল প্রভুর কথা, ইভান ইভানভিচের কথা। এই আওয়াজের মানে শিকার, এর মানে বন, এর মানে মুক্তি; আবার যখন

কোন কুকুর পথ হারিয়ে ফেলে, অথবা মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে কোন পাখি কিংবা খরগোশের পেছনে ছুটতে থাকে তখন এই রকম গুলির আওয়াজ করেই প্রভু তাকে ডেকে পাঠায়। গুলি চলার ঐ আওয়াজের পর কোথা থেকে বিমের শক্তি এসে গেল? —ও উঠে দাঁড়াল, টলতে টলতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, দরজার ফাঁকে নাক লাগিয়ে মুক্তির নিশ্বাস টানতে লাগল। ইতিমধ্যে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও পড়েছে — দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওর পুনর্জন্ম ঘটেছে। ধীরে ধীরে একটা ঘড়ির দোলকের মতো এই কোনা থেকে ও কোনায় দুলতে দুলতে ও বদ্ধ গাড়িটার মধ্যে হাঁটতে লাগল। তারপর ফের চলে গেল দরজার দিকে, দরজার ফাঁক দিয়ে ফের গন্ধ নিল, শেষকালে গন্ধ থেকে বুঝতে পারল বাইরে উঠোনে আশঙ্কাজনক কিছু একটা ঘটছে। আবার গাড়ির ভেতরে পায়চারি করতে লাগল, পায়চারি করতে করতে নখ দিয়ে গাড়ির গা আঁচড়াতে শুরু করল। দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন নিজেকে আরও সবল করে তোলার চেষ্টা করছিল, কোন একটা কাজের জন্য তৈরি হওয়ার আগে যেন হাত পা খেলিয়ে নিচ্ছিল।

এই ভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেল বলা কঠিন। কিন্তু বিম্ দরজার গা আঁচড়াতে শুরু করল।

বিমের জানাশোনা কোন দরজার সঙ্গে এই দরজাটার এতটুকু মিল নেই। এটা ছিল টিনের পাতে মোড়া, জায়গায় জায়গায় দাঁতে কাটা, খোঁচা খোঁচা। কিন্তু এটা দরজা, এখন একমাত্র দরজা, যার ভেতর দিয়ে লোকের সাহায্য বা সহানুভূতি পেতে হলে ডাকা যায়।

রাত নামল। ঠাণ্ডা, হিমেল রাত।

আলুথালু করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

বিম্ আঁচড়ে চলল। ও দাঁত দিয়ে কয়েক খাবলা টিন তুলে ফেলল, আবার আঁচড়াতে লাগল, তবে এবারে শুয়ে শুয়ে। ও হাঁকডাক করল, কাকুতি-মিনতি জানাল।

সকাল হতে গাড়ির ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে গেল: আলুথালু এখন আর করুণ আর্তনাদ করছে না, বিম্ও শান্ত হয়ে এসেছে, অবশ্য থেকে থেকে লোহার গা আঁচড়ানোর জন্য পায়ের থাবা তুলছে। শরীরের বল সম্পূর্ণ হারিয়ে ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, নাকি হতাশ হয়ে ভাগ্যকে মেনে নিয়ে নির্বিবাদে তার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল আমরা জানি না। এখনকার মতো এটা লোহার গাড়ির রহস্যই হয়ে থাকল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তল্লাশের সময় দেখাসাক্ষাৎ। পৃথিবীর বুকে বিমের চিহ্ন। চারবার গুলি

সাধারণ দিনের চেয়ে রবিবার দিন শহরে অনেক বেশি লোকজন দেখা যায়। কেউ হেঁটে চলেছে, কেউ গাড়ি চেপে চলেছে, কেউ ছুটছে, কেউ কিনছে, কেউ বা বেচছে। ঝাঁকাবন্দী মাছের মতো ট্রেনে বাসে ট্রলিবাসে ট্রামে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে লোকে শহর থেকে ছুটছে ভূতগ্রস্তের মতো। দুপুর নাগাদ সোরগোল কিছুটা কমে আসে, সন্ধ্যায় ফের শুরু হয়ে যায়। একদল গ্রাম আর বনজঙ্গল থেকে ফিরে আসে শহরে, অন্যদল শহর থেকে চলে যায় যার যার জায়গায়, গ্রামে, জঙ্গলে।

তাই আলিওশাকে সঙ্গে নিয়ে খিসান আন্দ্রেয়েভিচ যে এক রবিবারের দিনে শহরে এলো, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ওরা দুজনে কথাবার্তা বলে ঠিক করে নিয়েছিল যে বাপ যতক্ষণ বাজারে মালপত্র বিক্রি করবে সেই সময়ের মধ্যে আলিওশা শামলার খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করবে। খিসান আন্দ্রেয়েভিচ এর আগেও কয়েকবার ছেলেকে সঙ্গে নিয়েছিল, ওকে শহরে বেড়ানোর জন্য নিশ্চিন্তমনে ছেড়েও দিয়েছে (ট্রামের নম্বর সে জানে, নিজের বাড়িতে যাবার বাস-স্টপ জানে, আকাজ-কুকাজ সে কখনই করে না)। এই রকম ক্ষেত্রে আলিওশা তিন রুবল হাতখরচ পেত, ঐ টাকা দিয়ে সে যা খুশি তাই কিনতে পারত, ইচ্ছে করলে সিনেমায়, ইচ্ছে করলে সার্কাসে — শহরের যে-কোন জায়গায় যেতে পারত। কিন্তু এবারে খিসান আন্দ্রেয়েভিচ নিজে আলিওশার জামার ভেতরের পকেটে পনেরো রুবল গুঁজে দিয়ে বলল :

'শামলাকে যদি কারও কাছে দেখতে পাস, আর যদি দেখিস লোকটা ওকে ফেরত দিতে রাজী হচ্ছে না, তাহলে দশ রুবল দিস। যদি তাতেও রাজী না হয়, তাহলে বারো রুবল দিস। আর তাতেও না হলে পুরো পনেরো রুবলই দিয়ে দিস। এর পরও যদি দিতে না চায়, তাহলে লোকটার ঠিকানা লিখে নিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসিস — আমি নিজেই যাব। ঘোরাঘুরি করতে করতে আবার বেশি দেরি করে ফেলিস না যেন — চারটের

মধ্যে বাস-স্টপে চলে আসবি; দিন এখন ছোট হয়ে এসেছে ··· অন্ধকারের মধ্যে আমাদের যেতে হবে। আর হ্যাঁ, শামলার খোঁজখবর নেওয়ার সময় লোকজনকে ভদ্রভাবে প্রশ্ন করবি, বলবি: 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?' তারপর জানাবি যে আমরা হলাম গিয়ে গাঁয়ের লোক, রাখাল, কুকুর ছাড়া আমাদের চলে না, এদিকে আমাদের কুকুরটা হারিয়েছে — বোধহয় শহরেই পালিয়ে এসেছে। এই রকম সব বলবি আর কি। ভালো লোক অনেক আছে। তুই জিজ্ঞেস করবি। যা বললাম খেয়াল রাখবি।'

... শহরের রাস্তায় চলেছে ধীরস্থির প্রকৃতির, শক্তসমর্থ চেহারার একটি ছেলে, সময় সময় রাস্তায় যাকে দেখে তার মনে হচ্ছে এ লোকটাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে, তাকে প্রশ্ন করছে:

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি আপনাকে? আমরা হলাম গে রাখাল...'

মেদবহুল মোটা লোক সে দেখতে পেল অনেক, অগুনতি — বিশেষত মেয়েলোক। এ ধরনের লোকজনকে আলিওশা বাদ দিল (এরা নির্ঘাত কোন কাজকম্ম করে না, তাই অস্বাভাবিক মোটা)। কিন্তু ঘটনাটা এই যে এরকম একজন মেদবহুল লোকই আলিওশা যখন অন্য একজনকে প্রশ্ন করছে সেই সময় ওর প্রশ্ন শুনতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওকে রেল-স্টেশনে যাওয়ার পরামর্শ দিল (লোকটা বলল যে সারাদিনের মধ্যে স্টেশনের ফটক দিয়ে বহু যুবক যাতায়াত করে — তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয় জানে)। ছেলেদের একজনকেও কিন্তু বাদ দিল না আলিওশা।

ঠিক একই সময়ে তোলিয়াও রোজকার মতো বিমের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়েছে। আজ তিনদিন হল সে হন্যে হয়ে বিমের খোঁজ করছে, অবশ্য স্কুল ছুটির পরে। কিন্তু আজ সে ঠিক করেছে সকাল থেকে শুরু করবে — আজ রবিবার — স্কুল নেই।

শহরের রাস্তা দিয়ে চলেছে মার্জিত পরিবারের এক সাফসুতর ছেলে। যেতে যেতে পথচারীদের মুখ নিরীক্ষণ করে দেখছে, যেন অনুধাবন করার চেষ্টা করছে, মাঝে মাঝে বেছে বেছে একে-ওকে জিজ্ঞেস করছে:

'মাফ করবেন, একটা কালো কানওয়ালা কুকুর দেখেছেন কি?... কুকুরটা সাদা, হলদে ছিটে আছে। ...ও, দেখেন নি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিছু মনে করবেন না। মাফ করবেন।'

তোলিয়া ইতিমধ্যে বাবা-মা'র বারণ সত্ত্বেও স্তেপানভ্‌নার বাড়িতে একবার গিয়েছিল, ল্যুসিয়াকে সে ড্রয়িংখাতা দিয়েছে আর দিয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার সেই রং-পেন্সিল, যা কোন দোকানে কখনও কিনতে পাওয়া যায় না। সেই সময় সে স্তেপানভ্‌নাকে বলেছে যে বিম্‌ একদিন ওদের বাড়িতে এসেছিল, রাত্রিবাসও করেছিল, তারপর তার আর কোন খোঁজ নেই। স্তেপানভ্‌নার কাছ থেকে তোলিয়া জানতে পারল যে বিমের প্রভু ইভান ইভানভিচ — যাকে সে কখনও চোখে দেখে নি — চিঠি লিখেছে, চিঠিতে জানিয়েছে যে শিগগিরই ফিরছে। আজ তোলিয়া সন্ধ্যা নাগাদ আরও একবার অবশ্যই ওদের বাড়িতে যাবে — জানতে হবে বিমের কোন খবর আছে কিনা। তাছাড়া ল্যুসিয়া ওকে কথা দিয়েছে যে সে তার নিজের আঁকা 'আমাদের বিম্‌' ছবিটা ওকে উপহার দেবে।

রেল-স্টেশনের কাছাকাছি এক রাস্তায় বছর তেরো বয়সী শক্তসমর্থ চেহারার একটা ছেলে তোলিয়ার দিকে এগিয়ে এলো। ছেলেটার মুখ রোদে পোড়া, গায়ে নতুন পোশাক — বড়দের পোশাকের কায়দায় সেলাই করা। তোলিয়াকে সে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

যেন কোন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করছে — ছেলেটার সম্বোধনের এই ঢংটা তোলিয়ার ভালো লাগল, তাই সে চটপট উত্তর দিল:

'অবশ্যই।' তারপর জিজ্ঞেস করল: 'কী জানতে চাও?'

'আমরা হলাম গিয়ে রাখাল। একটা কুকুর হারিয়েছে — শহরে চলে গেছে। কোথাও দেখেছ কি? সাদা, হলুদ রঙের ছিটে আছে, একটা কান কালো কুচকুচে। আর একটা পা...'

'কী নাম কুকুরটার?' তোলিয়া অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'শামলা,' আলিওশা জবাব দিল।

'বিম্‌,' তোলিয়া বলল। 'নির্ঘাত বিম্‌!'

ওদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তার পর সমস্ত ব্যাপারটা কী ভাবে স্পষ্ট হল বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না: তোলিয়া ঠিক বুঝে নিল কবে, কখন বিম্‌কে কেনা হয়, কবে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়; আলিওশা বুঝতে পারল আর কোন কুকুর নয়, শামলাই এসেছিল তোলিয়ার কাছে। সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। বিম্‌ এই শহরেই কোথাও আছে। ওদের দুজনের একজনেরও কিন্তু মনে এমন প্রশ্ন পর্যন্ত জাগল না যে বিম্‌কে পাওয়া গেলে ওদের

মধ্যে কার ভাগে জুটবে। সবচেয়ে বড় কথা হল ওর খোঁজ করা, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওকে খুঁজে বার করা।

'প্রথমেই স্টেশনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যাক,' আলিওশা প্রস্তাব করল। 'একজন লোক আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে।'

তোলিয়া রাজী হয়ে গেল:

'তা-ই করা যাক। ওখানে লোকের কোন লেখাজোখা নেই, কেউ না কেউ অবশ্যই দেখে থাকবে।'

অনুসন্ধানের এমন সরল পদ্ধতির ব্যর্থতা সুস্পষ্ট, কিন্তু সরলমতি আলিওশা বা তোলিয়ার কাছে নয়। ওরা দু'জনে তখন এক সহজ সৌহার্দের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, কেবল এক কামনায়, একমাত্র বিমের প্রতি ভালোবাসার বন্ধনে একসূত্রে বাঁধা। ওদের আস্থা ছিল — এটাই ওদের এমন আচরণের সার কথা। ওরা ততক্ষণে মনে মনে এ-ও কল্পনা করতে লাগল যে বিম্ নিজে থেকে ওদের চোখের সামনে এসে ধরা পড়লেও পড়তে পারে।

এবারে পথ চলতে চলতেই আলিওশা ওর সিদ্ধান্ত জানাল:

'তারপর যাব তোমার স্তেপানভ্নার ওখানে। স্তেপানভ্নাকে একেবারে ছেড়ে চলে যেতে পারে না ও। আসলে বলতে কি, ও ওখানেই যাচ্ছে, নির্ঘাত ওখানে। তাছাড়া আর কোথায়ই বা যাবে? — নিজের বাড়ি যে!'

'তা যাওয়া যাবে,' তোলিয়া আপত্তি করল না।

আলিওশাকে ওর ভারিক্কি চালের কথাবার্তার জন্য আর সেই সঙ্গে ওর সারল্য ও সাদামাঠা ভাবের জন্য তোলিয়ার ভারী পছন্দ হয়েছিল। এ ধরনের পরিচয় চিরজীবনের বন্ধুত্ব হয়ে টিকে থাকে। আর সেই ছেলেকেও সৌভাগ্যবান বলতে হবে যে কিনা রাস্তায় চোর বাটপারের পাল্লায় না পড়ে এমন ভালো বন্ধু উপহার পেয়ে যায়।

ওরা ইতিমধ্যে কমসে কম শতখানেক লোককে জিজ্ঞেস করেছে, এর পরও লোকজনের মাঝখান থেকে বাছাই করে দেখছে আর কাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

ঐ দিনই সকালে রেল-স্টেশনের লোকজনের বিপুল ভিড়ের মধ্যে এক্সপ্রেস ট্রেনের একটা কামরার ভেতর থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলো একজন সাদাচুল লোক। তার গায়ে খয়েরী রঙের ওভারকোট। স্টেশন পেরিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখ বুলিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। বহুকাল জন্মস্থানের বাইরে কাটিয়ে ফিরে আসার পর মানুষ এমনি ভাবেই চোখ মেলে দেখে —

সব যেমন ছিল তেমন আছে কিনা, কিছু বদল হয়েছে কিনা। ঠিক এই মুহূর্তে দুটি অচেনা ছেলে তার কাছে এলো। একজনকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় গাঁয়ের ছেলে। সেই ছেলেটিই জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

সাদাচুল মাথাটা একপাশে সামান্য হেলিয়ে হাসি চাপতে চাপতে বলল:

'অবশ্যই অবশ্যই।'

দ্বিতীয়টি স্পষ্টতই শহুরে। প্রথমজনের কথার খেই ধরে সে বলল:

'দয়া করে বলবেন, এমন কোন কুকুর আপনার চোখে পড়েছে কি যার একটা কান কালো, গায়ের রঙ সাদা আর তার ওপর হলদে...'

সাদাচুল খপ করে ছেলেটার কাঁধ চেপে ধরল, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না — তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'বিম্!'

'হ্যাঁ বিম্। দেখেছেন? কোথায়?'

ওরা তিনজনেই স্টেশনের লাগোয়া চত্বরের একটা বেঞ্চের ওপর এসে বসল। ওরা তিনজনেই একে অন্যকে অকপটে বিশ্বাস করে ফেলল, যদিও এই লোকটাকে ছেলেরা আদৌ জানত না, এই লোকটাই যে ইভান ইভানভিচ, বিমের প্রভু, তা জানত না, এমন কি সে নিজে যদি নিজের সম্পর্কে না বলত, তাহলে চট করে ওদের ধরারও সাধ্য ছিল না।

ইভান ইভানভিচের পরিচিত লোকজনও সম্ভবত তাকে চিনতে পারত না। সে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছে, তার মুখ আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে, মুখের ওপর বলিরেখা দেখা দিয়েছে (হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাছি অপারেশন — হাওয়া বদলের ব্যাপার নয়), কিন্তু চোখজোড়া সেই আগের মতোই আছে — মনোযোগী, একাগ্র, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। একমাত্র এই গাঢ় খয়েরী চোখ দেখেই বোঝা যায় যে লোকটির চুল এক কালে কালো ছিল। এখন পুরোপুরি সাদা — তুষারশুভ্র।

তোলিয়া বিম্ সম্পর্কে যা যা জানত সব বলল, এমন কি এও বলল যে বিম্ এখন খোঁড়া, অসুস্থ। আলিওশা বেশ স্পষ্ট করে অথচ সংক্ষেপে শামলার গ্রামীণ জীবনের কথা জানাল। ইভান ইভানভিচের সব কিছুই ওদের দু'জনের ভালো লাগল: ওদের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছে যেন ওরা বয়স্ক লোক, কখন-কখন কথা বলতে বলতে ওদের কাঁধে হাত রাখছিল। যেভাবে কথার মাঝখানে বাধা না দিয়ে ওদের কথা সে শুনে যাচ্ছিল, সে যে

সাদা ধবধবে, তার নামটা যে এত সুন্দর — এর জন্যও তাকে ওদের ভালো লাগছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা ওদেরকে, অপরিচিত এই ছেলেদুটিকে সে ভালোবাসে — এটা একেবারে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তা না হলে শেষকালে সে বলতে যেত না:

'বেশ ভালো ছেলে তোমরা। এখন থেকে আমরা বন্ধু হলাম। আচ্ছা, এখন চল, আমার বাড়ি চল। সব কিছু বিবেচনা করে দেখলে বিম্ হয়ত এতক্ষণে বাড়ি চলে এসেছে।'

পথ চলতে চলতে সে বেশ কায়দা করে ছেলেদের এটা-ওটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নিল, আর তা থেকে অনায়াসেই জানতে পারল ওরা কারা, কোথা থেকে এসেছে, কী রকম পরিবারের ছেলে, কে কী করে, কার কী পছন্দ।

'ভেড়া চরাও — এটা ভালো কাজ আলিওশা। স্কুলেও পড়? কঠিন কাজ, তাই না?'

'ভেড়া চরানো মানে তাকে খাওয়াতে জানতে হয়,' বাবার মতো করে উত্তর দিল আলিওশা। 'কঠিন কাজ। ভেড়ার পালকে এমন ভাবে একসঙ্গে সামনে বাড়তে দিতে হবে যাতে পায়ের তলার ঘাস ওরা দলে নষ্ট না করতে পারে। এ কাজ ছেলেখেলা নয়, এত হয়রান হয়ে পড়তে হয় যে পায়ে খিল ধরে যায়। আবার এই দেখুন না কেন — ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই উঠতে হয়। ঝামেলার একশেষ। একটা কুকুর থাকলে ভালো — এ কাজের মাথামুণ্ডু যে লোক বোঝে না, তার থেকে একটা কুকুর অনেক বেশি সাহায্য করে। কুকুর ছাড়া আমাদের একেবারেই চলে না। আমরা হলাম গে রাখাল। উপায় কী?'

'আর তোলিয়া, তুমি কী কর?' ইভান ইভানভিচ জিজ্ঞেস করল।

'আমি?' তোলিয়া অবাক হয়ে বলল। 'আমি স্কুলে পড়ি।'

'তোমাদের বাড়িতে গোরু-ভেড়া এই রকম কোন জন্তুজানোয়ার আছে কি?' তোলিয়াকে জিজ্ঞেস করল আলিওশা।

উত্তরে তোলিয়া বলল:

'না, গোরু-ভেড়া ওসব কিছু নেই। থাকার মধ্যে ছিল গিনিপিগ — মা বারণ করেছেন পুষতে... বিশ্রী গন্ধ।'

'তুমি আমাদের বাড়িতে এসো — দেখিয়ে দেব। আমাদের লক্ষ্মী গোরুর মতন গোরু হয় না — ওর পেটের নীচে ঢুকে যাও না কেন, এতটুকু পা

নাড়াবে না। মাথার টুপিও চাটে... হাতের তাল্ুও। আমাদের যে মোরগ আছে সেটা সব মোরগের সেরা, সর্দার-মোরগ বলে ওটাকে — ভোরবেলায় প্রথম ডাকে, বাকিরা সকলে ওর পেছন পেছন। অমন মোরগ সচরাচর দেখা যায় না... কিন্তু কুকুর আমাদের বাড়িতে নেই। ছিল — মরে গেছে। শামলা ছিল — পালিয়ে গেছে।' আলিওশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: 'দুঃখ হয়। এমন মমতাভরা...'

ইভান ইভানভিচ স্তেপানভ্‌নার ফ্ল্যাটের কলিং-বেল টিপল। ল্যুসিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে স্তেপানভ্‌নাও বেরিয়ে এলো। ইভান ইভানভিচকে দেখে সে বিলাপ করতে করতে বলল:

"ওঃ ইভান ইভানভিচ! তোমার কাছে আমি এখন মুখ দেখাই কী করে বল ত? বিম্‌ নেই। এই তিন দিন আগেও তোলিয়ার ওখানে ছিল, কিন্তু বাড়ি আসে নি।'

'আসে নি,' ইভান ইভানভিচ চিন্তিত ভাবে আওড়াল। কিন্তু ছেলেদের চাঙ্গা করে তোলার জন্য যোগ করলেন: 'খুঁজে বার করা যাবে 'খন, অবশ্যই খুঁজে বার করব।'

স্তেপানভ্‌না ফ্ল্যাটের মালিককে চাবি দিল, ওরা পাঁচজনেই ভেতরে গিয়ে ঢুকল। ইভান ইভানভিচ যাওয়ার আগে ঘরে যা যা জিনিস যেভাবে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেই সেই ভাবেই আছে — সেই বইভর্তি দেয়াল-আলমারি, যা দেখে আলিওশা এখন অবাক হয়ে গেছে, সেই লেখার টেবিল — এমন কি আগের চেয়েও বেশি পরিষ্কার এখন (স্তেপানভ্‌নার মনোযোগের ফলে), কিন্তু সবই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা — বিম্‌ নেই। বিমের তক্তপোষের ওপর লেখার এক টুকরো সাদা কাগজ — ইভান ইভানভিচের চিঠি। এটা পর্যন্ত স্তেপানভ্‌না যত্ন করে রেখে দিয়েছে। ইভান ইভানভিচ তার অতিথিদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। স্তেপানভ্‌নার মনে হল সে যেন অস্ফুট স্বরে কাতরাচ্ছে।

'একটু শুয়ে থাকলে ত পারতে ইভান ইভানভিচ — হাজার হোক পথের ধকল,' সে পরামর্শ দিল।

ইভান ইভানভিচ এবারে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘরসুদ্ধ সকলের নিস্তব্ধতার মধ্যে শুয়ে রইল ছাদের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। স্তেপানভ্‌না কথাবার্তা বলে ওর যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করল।

'অপারেশন তাহলে ভালোই হয়েছে বলতে হবে? একা যখন আসতে পেরেছ তখন সব ঠিক হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নেই।'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, স্তেপানভ্না, সব ঠিক আছে। আপনি যা করেছেন সে সবের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি একজন বাইরের লোকের জন্যে যা করলেন লোকে নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্যেও যদি সে রকম করে, তাহলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হয়।'

'ধ্বৎ! এটা একটা কোন কথা হল! নেহাৎই বাজে কথা বলছ। পড়শীকে সাহায্য করা — এ আর কী এমন একটা পরিশ্রমের কাজ! কেবল মনের সদিচ্ছা থাকলেই হল (নিজের প্রশংসা শুনে স্তেপানভ্নাকে বেশ খানিকটা কুণ্ঠিতই দেখা গেল)।

কয়েক মিনিট বাদে ইভান ইভানভিচ উঠে দাঁড়াল, ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল:

'আচ্ছা ছেলেরা, আমাদের পরিকল্পনাটা তাহলে এরকম হোক — তোমরা এখানে, আমাদের এই এলাকায় খোঁজাখুঁজি কর, লোকজনকে বেশ সাহস করে জিজ্ঞেসবাদ কর — বিম্ এখানে, ধারেকাছেই কোথাও আছে নিশ্চয়। আর আমি...' একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'আমি চললাম আরেকটা জায়গায়... খোঁজ করতে... বলা যায় না হয়ত পাহারাদার কুকুরদের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে... ঐ রকম কোন জায়গায় আছে।'

ওরা যখন বেরোতে যাবে এমন সময় ল্যুসিয়া তোলিয়াকে 'আমাদের বিম্' ছবিটা দিল। তোলিয়া আলিওশাকে ছবিটা দেখাতে সে আশ্চর্য হয়ে বলল:

'নিজে এঁকেছ?'

'নিজে,' ল্যুসিয়া উত্তর দিল।

'তুমি শিল্পী?'

'ন্-না,' ল্যুসিয়া হাসতে হাসতে বলল। 'আমি সবে ক্লাস ফাইভে উঠেছি।'

বিমের চেহারার সঙ্গে ছবিটার বেশ মিল আছে: একটা কান কালো, একটা পা কালো, সাদার ওপর হলদে-হলদে ফুটকি আর বড় বড় চোখ। কেবল একটা কান যেন অন্যটার চেয়ে একটু বেশি লম্বা — কিন্তু সেটা মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

আলিওশা ও তোলিয়া ফের অনুসন্ধানে চলল। ওরা সেই আগের মতোই মুখ দেখে দেখে লোক বাছাই করতে লাগল (তবে এবারে নিজেদের মধ্যে দস্তুরমতো শলাপরামর্শ করে), আগের মতো একই প্রশ্ন করল

পথচারীদের, বুঝিয়ে বলল কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখে বিম্‌কে চেনা যায়।

এদিকে ইভান ইভানভিচ যখন বিছানায় শুয়ে ছিল তখনই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কোয়ারেণ্টাইন স্টেশনে যাওয়া দরকার! যারা কুকুর ধরে বিমের চেহারার বর্ণনা তাদের কাছে দিতে হবে, তাদের হাতে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে বলে দিতে হবে যে বিমের খোঁজ পেলে যেন তাকে জানায়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে বিম্ ইতিমধ্যেই ওখানে গিয়ে পড়েছে। বুধবার রাতে... তিন দিন আগে ও তোলিয়ার ওখানে ছিল। তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি, পারা যায় যেতে হয়!

ইভান ইভানভিচ একটা ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে কাল বিলম্ব না করে ছুটল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছাল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের ফটকের সামনে। চৌকিদার ছাড়া আর কেউ ওখানে ছিল না (রবিবার, ছুটির দিন)। কিন্তু ইভান ইভানভিচের প্রশ্নের উত্তরে সে সানন্দে ও সবিস্তারে বলল:

'বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার কোন কুকুর ধরা হয় নি, তবে গতকালের ধরা কুকুর আছে, সেগুলো ঐ ভ্যান-এর ভেতরে। কটা আছে কে জানে? বলতে পারছি না, তবে আছে। কাল ডাক্তার এসে দেখে বলবেন কোন্‌টা যাবে বিজ্ঞানের কাজে, ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে কোনটার ছাল ছাড়াতে হবে, আবার যদি দেখা যায় যে ছাল খারাপ, তাহলে ছালসুদ্ধই পুঁতে ফেলা হয়। এই জন্যেই ত ডাক্তার! নইলে চলবে কী করে! কখন কখন স্রেফ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।'

'শিকারী কুকুরও কি ধরা পড়ে?' ইভান ইভানভিচ জিজ্ঞেস করল।

'ক্বচিৎ। ঐরকম কুকুর ধরা পড়লে নষ্ট করা হয় না, গবেষণার কাজে কাটাছেঁড়ার জন্যেও তুলে দেওয়া হয় না। প্রথমে আমরা তার মালিকের জন্যে অপেক্ষা করি, শিকার সমিতিতে ফোন করে জানাই — এই এই ব্যাপার, এবার তোমরা নিজেরাই বুঝে নাও। তাছাড়া আর কী করার আছে! এটাই ত ডাক্তারদের কাজ। শুনেছি ওখানে ওরকম একটা আছে — ইভান বলেছে — সাদা কুকুর, হাল খুবই খারাপ। দেখাশোনা করার কেউ নেই। মালিকের বৌ নাকি নিজেই দিয়ে দিয়েছে। তা আর কীই বা করবে? মহিলার স্বামী হয়ত মারা গেছে।'

'বিম্, নাকি অন্য কোন কুকুর?' ইভান ইভানভিচ মনে মনে এই ভেবে অনুনয় করে বলল:

'দয়া করে ভ্যানটার কাছে আমাকে একবার যেতে দিন। আমি আমার

কুকুরের খোঁজ করছি — চমৎকার কুকুর ওটা! কে বলতে পারে, ও-ই হয়ত বসে আছে ভ্যানের ভেতরে! দেখতে দিন।'

কিন্তু চৌকিদার নির্মম।

'চমৎকার কুকুরদের ওখানে রাখা হয় না। রাখা হয় অনিষ্টকারী কুকুরদের, যাতে রোগ না ছড়ায়,' ইভান ইভানভিচের কথায় কোন কান না দিয়ে দৃঢ়স্বরে স্পষ্টাস্পষ্টি সে বলল। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা পালটে গেল — থুতনি ওপরের দিকে তুলে হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যে মনে হচ্ছিল যেন উমেদারকে ফটকের বাইরে চলে যেতে বলছে। ইভান ইভানভিচ নিরুৎসাহ হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল — এর বিরুদ্ধে কিছু করতে সে একেবারেই অসমর্থ। এমন কি চৌকিদারও নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে পরিতৃপ্তিলাভের লোভ সামলাতে না পেরে কঠোর স্বরে বলল: 'দেখতে পাচ্ছ? 'প্রবেশ নিষেধ'। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে,' বলে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কাচের নীচে ফ্রেমে বাঁধানো একটা নোটিশ যাতে সোনালি অক্ষরে লেখা আছে: 'প্রবেশ নিষেধ। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক'।

ইভান ইভানভিচ ততক্ষণে আঙিনার ভেতরে ঢোকার আশা ছেড়ে দিয়েছে, তবু সে বলল:

'ওঃ, এর পরও কিনা নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে চাও!... হালে অপারেশন হয়েছে আমার। যুদ্ধের সময় থেকে গোলার টুকরো বিঁধে ছিল এই এখানে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখি বিম্ নেই।'

'তাই নাকি? বিশ বছরেরও বেশি গোলার টুকরো বিঁধে ছিল? বলছ এখানে?' চৌকিদার হঠাৎ আপনা আপনি বনে গেল সেই আগের মানুষ — গোড়ায় তাকে যেমন দেখেছিল ইভান ইভানভিচ। 'বোঝ কাণ্ড! বললে লোকে বিশ্বাসই করবে না। আচ্ছা, আচ্ছা...' কথাগুলো শেষ করতে না করতেই সে ফটকের ছিটকিনি খুলে আপসের সুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল: 'আচ্ছা, ভেতরে এসো। তবে কাউকে বলবে না কিন্তু।'

বিম্‌কে তার গলায় বাঁধা দড়ি ধরেই বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে এই আশায় ইভান ইভানভিচ ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ভ্যানটার দিকে এগিয়ে গেল। বাস্তবিকই তার বড় আশা ছিল যে বিম্‌কে সে এখানে দেখতে পাবে, ওকে আদর করবে; আর বিম্ যদি এখানে নাও থাকে তা হলেও আশার কথা — তার মানে ও বেঁচে আছে, ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

'বিম্, আমার আদরের বিম্, ওরে আমার বাছা রে... আমার বোকা

ছেলেটা,' উঠোনের ওপর দিয়ে যেতে যেতে সে ফিসফিস করে আওড়াল।

অবশেষে চৌকিদার ভ্যান-এর দরজা হাঁ করে খুলে দিল।

ইভান ইভানভিচ চমকে উঠে পিছিয়ে গেল, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বিম্ শুয়ে ছিল দরজায় নাক ঠেকিয়ে। ক্যানেস্তার ভাঙা ছেঁড়া কোনার খোঁচা লেগে দাঁতের মাড়ি ক্ষতবিক্ষত। সামনের দুই থাবার নখ রক্তমাখা।

বিম্ অনেকক্ষণ ধরে শেষ দরজাটার গা আঁচড়েছিল। আঁচড়েছিল শেষ শক্তি দিয়ে, শেষ নিঃশ্বাসটুকু খরচ করে। কী সামান্যই না ওর কামনা ছিল! স্বাধীনতা আর বিশ্বাস — এর বেশি কিছু নয়।

আলুথালু পড়ে ছিল এক কোনায়, সেটা কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

ইভান ইভানভিচ বিমের মাথায় হাত রাখল। বিশ্বস্ত, একনিষ্ঠ, তার প্রিয় বন্ধু বিম!

ফাঁক ফাঁক হয়ে হালকা তুষারকণা পড়ছিল। দুটো তুষারকণা বিমের নাকের ওপর এসে পড়ল, কিন্তু গলল না।

...ইতিমধ্যে বিমের খোঁজে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আলিওশা ও তোলিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেসবাদ করতে করতে ওরা এসে পড়ল সেই ভেটেনারি সেণ্টারে যেখানে কোন এক সময় বিম্‌কে নিয়ে এসেছিল তোলিয়া। ওখানে ওরা জানতে পারল যে ওদের হেফাজতে কোন কুকুর নেই এবং যদি কোন কুকুর হারায়, তাহলে সবচেয়ে প্রথমে তাকে খোঁজা উচিত কোয়ারেণ্টাইন স্টেশনে, কেননা ওখানে রাস্তার কুকুর ধরে জমা করা হয়।

আমাদের এই দুই ছেলে মোটেই তেমন ছেলে নয় যে চিঠিতে ঠিকানা লেখে 'দাদুর গ্রাম'। তাই ওরা এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বাস-স্টপ থেকে নেমে পোড়ো জমির ওপর দিয়ে দ্রুত পা চালাল কোয়ারেণ্টাইন স্টেশনের প্রাঙ্গণের দিকে।

ওদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল ইভান ইভানভিচের — সে তখন ফটক থেকে সবে বেরিয়েছে। ছেলেদের দেখে সে জোরে পা চালিয়ে দিল, কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করল:

'তোমরাও কি এখানে আসছ নাকি?'

'এখানে পাঠিয়ে দিল আমাদের,' আলিওশা বলল।

'বিম্ এখানে নেই?' তোলিয়া জিজ্ঞেস করল।

ইভান ইভানভিচ নীরব।

'বিম্ কি এখানে ছিল না?' ফের জিজ্ঞেস করল আলিওশা।

'না ছেলেরা... বিম্ এখানে নেই... ছিলও না।' ইভান ইভানভিচ মনের ভার ও বুকের ব্যথা লুকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর এই অবস্থায় কাজটা দস্তুরমতো কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

তোলিয়া তখন তার ঘন কালো ভুরু তুলে কপালে ভাঁজ ফেলে বলল:

'ইভান ইভানভিচ, দয়া করে ঠিক কথা বলুন আমাদের... আপনি ঠিক বলছেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'বিম্ এখানে নেই,' ইভান ইভানভিচ আবার বলল, এবারে আরও জোর দিয়ে, আরও দৃঢ়স্বরে। 'ওকে খুঁজতে হবে। খুঁজতে হবে ওকে।'

গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারকণা ঝরছে।

নিঃশব্দ হিমবর্ষণ।

সাদা তুষারকণা।

ঠাণ্ডা তুষার এমনি ভাবেই প্রতি বছর আবার নতুন করে জীবন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত, বসন্ত না আসা পর্যন্ত ধরণীকে ঢেকে দেয়।

তুষারের মতো সাদাচুল লোকটি পোড়ো জমির ওপর দিয়ে চলেছে। তার পাশে পাশে হাতে হাত ধরে চলেছে দুটি ছেলে ওদের বন্ধুর খোঁজে। ওদের মনে আশা ছিল।

মিথ্যাও কিন্তু সময় সময় সত্যের মতোই নিষ্পাপ হতে পারে। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ তাই স্মিত হেসে তার প্রিয়জনদের বলে: 'আমার বেশ ভালো লাগছে এখন।' মা তাই তার দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত শিশুকে আনন্দের গান গেয়ে শোনায়, তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

কিন্তু জীবন চলতেই থাকে। চলতে থাকে এই কারণে যে আছে আশা। এই আশা না থাকলে হতাশা এসে জীবনকে সংহার করত।

* * *

ওরা দুই ছেলে মিলে সারা দিন ধরে বিমের তল্লাস চালিয়ে গেল। তোলিয়া যখন আলিওশাকে ট্রামে করে ওদের বাড়িতে যাবার বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, গোধূলির আবির্ভাব ঘটেছে।

'ইনি হলেন আমার বাবা,' আলিওশা পরিচয় করিয়ে দিল তোলিয়াকে।

খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ তোলিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'বোঝা গেল, একজন বন্ধুর খোঁজ পাওয়া গেছে তাহলে। কি, আলিওশার বাড়িতে আসবে নাকি? এলে ত বেশ হয়।'

তোলিয়ার হয়ে আলিওশা জবাব দিল:

'ও পরে একদিন আসবে। আমিও আসব... ইভান ইভানভিচের কাছে। আমরা আবার খুঁজতে থাকব।'

'বেশ। ভালো কথা। বাড়ি এসে খুঁটিনাটি সব বলবি। আর এখন ঐ, ঐ যে আমাদের বাস আসছে।'

বাসে উঠে বসার আগে আলিওশা বাবাকে পনেরো রুবল ফেরত দিল।

'পুরো টাকাই আছে। দরকার পড়ে নি।'

'আচ্ছা বুঝলাম,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বাবা বলল।

বাস চলতে শুরু করলে তোলিয়া বন্ধুর উদ্দেশে হাত নাড়াল। নতুন বন্ধুকে ছেড়ে দিতে মন চাইছিল না, আবার অন্যদিকে মনে মনে এই ভেবে আনন্দ লাগছিল যে একজন বন্ধু আছে। এখন থেকে আলিওশার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হবে এই প্রতীক্ষা নিয়েও তোলিয়া জীবন ধারণ করবে। আর ধরণীর বুকে এমন একটা সুস্পষ্ট চিহ্ন ত বিম্‌ই রেখে গেল।

বাড়ি এসে তোলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তার বাবাকে বলল:

'বিম্‌ শহরেই কোথাও আছে। খুঁজে বার করবই আমরা। আমরা খুঁজে বার করব ওকে।'

''আমরা' মানে?'

'আলিওশা, ইভান ইভানভিচ আর আমি। ...খুঁজে বার করব, দেখো না।'

'আলিওশা কে? ইভান ইভানভিচই বা কে?' মা জিজ্ঞেস করল।

'আলিওশা — গাঁয়ের ছেলে, ওর বাবা খ্রিসান খুড়ো। আর ইভান ইভানভিচ — জানি না কে... তবে ভালো মানুষ... বিমের প্রভু।'

'বিমের প্রভুর যখন খোঁজ পাওয়া গেছে তবে আর বিমের খোঁজ করা কেন?' বাবা জিজ্ঞেস করল।

তোলিয়া উত্তর দিতে পারল না, প্রশ্নটা এতই আচমকা ও জটিল যে চট করে ও বুঝে উঠতে পারল না।

'জানি না,' মৃদুস্বরে ও উচ্চারণ করল।

বেশ রাতে তোলিয়া যখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে যে আলিওশাদের গোরুটা ওর মাথার টুপি চাটছে তখন দূরের একটা ঘরে মা আর বাবার মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে।

'তোমার ছেলেটা দেখছি দেখাশোনা করার অভাবে বখে যাচ্ছে,' কঠোর স্বরে বাবা বলল।

'তা তুমি আছ কী করতে শুনি?' মা ফুঁসে উঠল।

'আমার নিজের কাজকর্ম আছে যে।'

'আর আমাকে যা হাঙ্গামা পোহাতে হয় তা তোমার কাজের চেয়েও খারাপ। তুমি ঘর থেকে বাইরে চলে যাও, তোমার আর কী? কিন্তু আমার অবস্থা?... বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেই ত আমার প্রাণান্ত।'

'যে যেখানেই কাজ করুক না কেন, প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কর্তব্য আছে, সে কর্তব্য তাকে সততার সঙ্গে পালন করতে হয়। আমার প্রসঙ্গ অন্য — তোলিয়াকে কে মানুষ করবে? তুমি, না আমি? নাকি আমরা দুজনেই? দায়িত্ব যদি আমাদের দুজনেরই হয়, তাহলে আমাদের একটা মতের মিলে আসতে হয়।'

'আমার মনে হয় সে দায়িত্ব তোমারও নয়, আমারও নয়।'

'তাহলে কার শুনি?'

'সমস্ত আশা ভরসা স্কুলের ওপরে,' এবারে আগের চেয়ে অনেক শান্ত সংযত ভাবে মা উত্তর দিল।

'আর রাস্তা?' বাবা ঠেস দিয়ে বলল।

'রাস্তাই বা নয় কেন? সব বাচ্চাই ত রাস্তায় যায়।'

'আর সততা, আমি জিজ্ঞেস করি, সততা কে শেখাবে?' এবারে উত্তেজনায় গলা চড়াল বাবা।

'সে কথাই যখন উঠল তাহলে এই নাও, পড়। আচ্ছা, আমিই পড়ছি, শোন,' এই বলে মা খবরের কাগজ থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো অংশ উদ্ধার করে পড়ে শোনাতে লাগল: "শৃঙ্খলাবোধ, সজাগ দৃষ্টি, কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সুরুচি বোধ — এই সমস্ত গুণই মানুষের সততা গড়ে তোলে...' 'সৎ ব্যক্তির নমুনা সামনে তুলে ধরতে হবে...' শুনতে পাচ্ছ? নমুনা তুলে ধরতে হবে! ওঃ আপনি যান, যান আপনি এখান থেকে!' বলতে বলতে মা গদিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

তর্কাতর্কি আর বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে বাবার ছিল না।

মাকে সে ভালোবাসত, মাও তাকে ভালোবাসত, তবে মিটমাট বাবাই সব সময় প্রথমে করত। তাছাড়া ওদের মধ্যে মতের অমিলও দীর্ঘকাল স্থায়ী হত না। এবারেও তাই মিটমাটের সুরে সে বলল:

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা বুঝে দেখতে হবে। চেষ্টা করে দেখি বিম্‌কে খুঁজে বার করা যায় কিনা। কুকুরের মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। তোলিয়া এখন আর কুকুরটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে না, কিন্তু আমরা যদি ওকে খুঁজে বার করতে পারি, তাহলে তোলিয়ার কাছে আমাদের সম্মান বেড়ে যাবে।'

না, তার মাথার ভেতরে যে কথাগুলো ঘুরছিল আর মুখে সে যা বলল সেগুলো ঠিক এক নয়। সেই রাতে আগের মতো শান্ত সংযত ভাব ও আত্মবিশ্বাস সেমিওন পেত্রোভিচের ছিল না। ছেলে তার বেড়ে উঠছে বাপের পাশ কাটিয়ে, আর সে বাপ হয়ে কিনা নিজের কাজে এমনই ব্যস্ত যে এটা দেখেও দেখতে পারছে না! সেমিওন পেত্রোভিচ মনে মনে ভাবল। তার মনে পড়ল একদিন নদীর ধারে বীয়ারের দোকানের পাশে এক অল্পবয়সী ছোকরাকে দেখেছিল। ছোকরার তখনও গোঁফ গজায় নি। দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে টলছিল, তার পারে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল, সে চিৎকার করছিল আর বিকারগ্রস্তের মতো কাঁদছিল। ঐ স্মৃতি মনে জাগতে সেমিওন পেত্রোভিচের বুক কেঁপে উঠল। আরও বছর পাঁচেক বাদে তার তোলিয়াকেও ঐ ভূমিকায় দেখা যেতে পারে কল্পনা করে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ অনুভব করল। সে স্ত্রীর পাশে সরে এসে বসল, যে-রকম মৃদুস্বরে, মিটমাটের সুরে কথা শুরু করল তাতে স্ত্রী অবাক হয়ে গেল। বলল:

'আচ্ছা, তোলিয়ার জন্যে একটা ভালো দেখে কুকুর কিনলে কেমন হয়? নাকি বিমের প্রভুর কাছ থেকে বলে কয়ে বিম্‌কেই আদায় করে নিই, কী বল? ভালো দাম দেব। কী মনে হয় তোমার?'

'ওঃ সেমিওন, জানি না, জানি না সেমিওন। এসো, কিনেই ফেলা যাক। না কী বল?'

বলাই বাহুল্য, সেমিওন পেত্রোভিচ একটা ছোট কথা ভুলে গেছে। সেটা এই যে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস কেনা যায় না, বেচাও যায় না। তার এটাও জানা ছিল না যে সে চাইলেও বিম্‌কে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিম্, আমাদের দরদী বন্ধু বিম্ তোলিয়ার বাবার মনেও ছাপ ফেলেছে।

হয়ত এটা ছিল বিবেকের দংশন। এই বিবেকের হাত থেকে কোন মানুষ কখনও পরিত্রাণ পেতে পারে না, যদি অবশ্য তার অন্তঃকরণ একটা আদর্শ সোজা ডালের মতো না হয়। সেক্ষেত্রে অন্তঃকরণকে ইচ্ছামতো ধনুকের মতো বাঁকানো যায়, আবার ছেড়ে দিলেই সোজা হতে পারে — যখন যেমন খুশি। কিন্তু বিম্ সেমিওন পেত্রোভিচের রাতের ঘুমও কেড়ে নিয়েছিল।

এদিকে সেই রাতেও বিম্ পড়ে রইল ওখানেই, ক্যানেস্তার দরজা লাগানো সেই ভ্যান-এ। পরের দিনই তোলিয়ার বাবা বিমের খোঁজ নেওয়ার আয়োজন করবে। বিমের খোঁজ সে পাবে কি? লোহার ভ্যান-এর রহস্য সে অনুধাবন করতে পারবে কি? আলো আর স্বাধীনতার জন্য, বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের জন্য বিমের এই যে আকুলতা তার শক্তি ও অজেয়তার সম্পূর্ণ পরিচয় সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি?

না, তা ঘটল না। ঘটল না এক অতি সামান্য কারণবশত। পরের দিন, সোমবার সকালে ইভান ইভানভিচ খোলে করে বন্দুক তুলে নিয়ে চলল কোয়ারেণ্টাইন স্টেশনে। সেই যে দুজন লোক বিম্‌কে ধরেছিল সেখানে তাদের সঙ্গে ইভান ইভানভিচের দেখা হল। তাদের কাছ থেকে যখন সে জানতে পারল যে বিম্‌কে বাড়ির সামনে ধরা হয়েছে তখন দুঃখে ও বেদনায় তার মন ভরে গেল। ওরা দুজনেই ঐ স্ত্রীলোকটির ওপর নিদারুণ বিরক্তি প্রকাশ করল, তাকে যা নয় তাই বলে গালাগাল করতে লাগল। বিম্ যে বিশ্বাসঘাতকতা ও অপবাদের শিকার হয়েছে এই ভেবে ইভান ইভানভিচের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। এই দুই কর্মীকে দোষ দেওয়ার কোন কারণ সে খুঁজে পেল না — এরা নিজেদের কর্তব্য পালন করেছে, যদিও দেখেশুনে মনে হচ্ছিল যে অল্পবয়সী ছোকরাটি নিজেকে অপরাধী ভাবছিল, অন্তত এই কারণে যে স্ত্রীলোকটিকে সে বিশ্বাস করেছিল।

'আহা আমি যদি জানতাম...' কথাগুলো শেষ না করেই সে রাগে ভ্যান-এর বনেটের ওপর হাতের মুঠি ঠুকল। 'এই রকম কুটিল মেয়েমানুষের কথায় বিশ্বাস করার ফল হল এই।'

ইভান ইভানভিচ ওদের অনুরোধ জানাল বিম্‌কে গাড়ি করে বনে নিয়ে যেতে। এ জন্য সে ওদের পাঁচ রুবল দিতে চাইল। ওরা দুজনে সাগ্রহে রাজী হয়ে গেল। তিনজনে ওই ভ্যান-এ করেই চলল।

বনের মাঝখানের সেই যে ফাঁকা জায়গাটায় শিকারের আগে ইভান

ইভানভিচ গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর বসে থাকত, বসে বসে বনের মর্মরধ্বনি শুনত, যেখানে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ঝরা পাতার ওপর বিম্ সেদিন তার মুখ ঘসতে থাকে, ঠিক সেই জায়গাটাতেই, ঐ কাটা গুঁড়ির কয়েক মিটার দূরে ওরা বিম্‌কে পুঁতে দিল। ওর কবরটা তুষার-মেশানো হলুদ পাতার হালকা পরত দিয়ে আলতো করে ঢেকে দিল।

অরণ্য একটানা অস্ফুট মর্মরধ্বনি তুলে চলল।

ইভান ইভানভিচ খোল থেকে বন্দুকটা বার করল। কার্তুজ ভরে একটুক্ষণের জন্য কী যেন ভেবে নিয়ে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল।

অরণ্য সেই আওয়াজে সাড়া দিল। কিন্তু তার সেই প্রতিধ্বনি ছিল কলকাকলিবিহীন, অস্ফুট; তাতে ঝরে পড়ছিল শরতের বিষণ্ণতা। দূরে সেই অনুরণন সংক্ষিপ্ত কাটা-কাটা আর্তনাদ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল।

আরও একবার গুলি ছুঁড়ল বিমের প্রভু। এবারেও অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে অরণ্যের বুক চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে আসবে।

সঙ্গী দু'জনেই হতভম্ব হয়ে তাকাল ইভান ইভানভিচের দিকে। কিন্তু একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে সে আরও দুটো কার্তুজ ভরল বন্দুকে, আগের মতোই বিলম্বিত আওয়াজ দূরে গিয়ে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, ঠিক মেপে মেপে নির্দিষ্ট সময় অন্তর গুলি করল আরও দু'বার। তারপর বন্দুক খোলে পুরে কাটা গুঁড়িটার কাছে গেল।

বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীটি জিজ্ঞেস করল:

'এই যে চারবার গুলি করলে এটা কী ব্যাপার?'

'এটাই নিয়ম,' ইভান ইভানভিচ উত্তর দিল। 'কুকুরের বয়স যত হয়েছিল ততবার গুলি ছুঁড়তে হয়। বিমের বয়স হয়েছিল... চার বছর। যে-কোন শিকারী এই সব মুহূর্তে মাথার টুপি খুলে নীরবে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করে।'

'বোঝ একবার!' আশ্চর্য হয়ে মৃদুস্বরে বলল অল্পবয়সী ছোকরাটি। 'লোকে কোন বিপদে বা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়লে যা করে আর কি...' বলতে বলতে ভ্যান্-এর কাছে সরে এসে সে গাড়ির সামনের দরজা খুলে সিটে গিয়ে বসল, দরজা বন্ধ করে দিল।

ইভান ইভানভিচ তার চির পরিচিত সেই কাটা গুঁড়িটার ওপর গিয়ে বসল।

অরণ্য একটানা একঘেয়ে সুরে মর্মরধ্বনি তুলে চলেছে ত চলেইছে — অনেকটা শীতকালের মতো — ঠান্ডা, উলঙ্গ, অস্বস্তিকর। তুষার বলতে ছিল নামে মাত্র, ছিটেফোঁটা। অনেক আগে তার আসার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আসি আসি করেও আসছে না, বেশ দেরি করছে। হয়ত বা এই কারণেই অরণ্যের মর্মরধ্বনি এখন কেমন যেন একটা তন্দ্রাজড়িত বিরক্তিকর নালিশের সুরে পরিণত হয়েছে। সে সুর এতই হতাশাব্যঞ্জক যে শুনে মনে হয় বুঝিবা শীত কিংবা বসন্ত কেউই আসবে না।

এমন সময় ঐ শূন্যতার মধ্যেও ইভান ইভানভিচ হঠাৎ মনে মনে উপলব্ধি করল তার পরম বন্ধুর মৃত্যুর পরও কোথায় যেন একটা উষ্ণতার স্পর্শ থেকে গেছে। এটা যে আসলে কী তা অবশ্য সে চট করে বুঝে উঠতে পারল না। ইভান ইভানভিচের এই উপলব্ধির মূলে ছিল সেই ছেলে দুটি, যাদের বিম্ নিজে না জেনে তার কাছে নিয়ে এসেছিল। ওরা আসবে, আবার আসবে, বারবার আসবে।

যারা কুকুর ধরে সেই দুজন সাধারণ সরলমতি কর্মী ইভান ইভানভিচের আচরণে আরও অবাক হয়ে গেল, বেশ অবাক হয়ে গেল যখন গাড়ির সামনের সীটে উঠে বসতে বসতে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো সে আওড়াল:

'না, না, এ হতে পারে না। বসন্তও আসবে, অবশ্যই আসবে। স্নো-ড্রপ ফুলও ফুটবে। ...রাশিয়ায় শীত যেমন আছে, তেমনি বসন্তও আছে। শীত থাকবে, বসন্তও অবশ্যই থাকবে — এই না হলে আমাদের রাশিয়া!

* * *

ফিরতি পথে অল্পবয়সী ছোকরাটা বড় রাস্তার সামান্য দূরে, একটা ছোট গাঁয়ের সামনা সামনি এসে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিল, ভ্যান-এর দরজা খুলে বার করে দিল আলুথালুটাকে।

'না, না, চাই না! এ কাজ আমি করব না!' সে বলল। 'পালা রে কুকুর, গাঁয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচা। ওখানে তুই টিকে যাবি।'

'আরে, আরে এ কী করছ! সবাই যে জানে দুটো কুকুর ছিল,' বয়স্ক লোকটা সামনের কেবিন থেকে চিৎকার করে বলল।

'একটা মারা গেছে, আরেকটা পালিয়েছে — ব্যস, চুকে গেল। চাই না। না, না। এ কাজ আমি করব না। ব্যস চুকে গেল ল্যাঠা!'

আলুথালু কুকুরটা বড় রাস্তা থেকে ছুট দিয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে বসে পড়ল, অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ভ্যানটা চলে যাচ্ছে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আপন খেয়ালে ছুটল, ছুটল গাঁয়ের দিকে, লোকজনের কাছে। মাথায় বুদ্ধি সে রাখে।

ওরা যখন বনে ছিল তখনই ইভান ইভানভিচ জানতে পারে যে অল্পবয়সী ছোকরাটির নাম ইভান, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটির নামও ইভান। তিনজনের নামই ইভান — এরকম সংযোগ ক্বচিৎ হয়। এর ফলে ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গেল। ইভান ইভানভিচ ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের মতো ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল। ওদের তিনজনের মধ্যে যোগসূত্র ছিল মাত্র একটিই — তিনজনে মিলে এমন একটা কুকুরকে কবর দিয়েছে যার পক্ষে কুকুরের কয়েদখানাকে বরদাস্ত করা সম্ভব হয় নি। লোকে কখন কখন মহান উদ্দেশ্যে একসঙ্গে এসে মেলে, তারপর কাজ শেষ হলে যে যার মতো বিদায় নিয়ে চলে যায়; কিন্তু কখন কখন নিতান্ত ছোটখাটো কাজের জন্য একসঙ্গে এসে মিললেও তাদের সে বন্ধন হয় দীর্ঘস্থায়ী, চিরকালের।

ইভান ইভানভিচ গাড়ি থেকে নেমে যখন অল্পবয়সী ইভানকে প্রতিশ্রুত পাঁচটি রুবল দিতে গেল তখন সে ইভান ইভানভিচের হাত সরিয়ে দিয়ে আবার বলল সেই আগের কথাগুলো:

'না, চাই না। এ কাজ আমি করব না। ব্যস — চুকে গেল!'

এ থেকে যেটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল তা এই যে বিমের মৃত্যুর জন্য সে নিজেকেও দোষী বলে মনে করছে। সে যেন মৃতের ভর্ৎসনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। তা ত হবেই! — মৃতের ভর্ৎসনার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কী হতে পারে! কারণ এই যে অপরাধী, মৃতের যে অনিষ্টসাধন করেছে তার জন্য সে যদি অনুতাপও প্রকাশ করে তবু মৃত তাকে ক্ষমা করবে, তার প্রতি সহানুভূতি বা করুণা দেখাবে এমন আশা করে সে বসে থাকতে পারে না। কিন্তু অল্পবয়সী ইভান তার ছোট ভুলটাকে বড় করে দেখেছে, তাই সে বড় কষ্ট পাচ্ছে। আর এতে তার সম্মান বৃদ্ধিই পাওয়ার কথা। বিশ্বস্ত, অনুরক্ত, ভালো কুকুরটি পৃথিবীর বুকে যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে যায় এটাও তার মধ্যে একটা। প্রসঙ্গত বয়োজ্যেষ্ঠ ইভান কিন্তু মনে মনে তেমন কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল না — ইভান ইভানভিচের হাত থেকে পাঁচ রুবলের নোটটা নিয়ে সে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পাশ-পকেটে রেখে দিল। এর জন্য তাকে দোষ দেওয়াও সম্পূর্ণ অন্যায় — সে তার কাজের জন্য চুক্তি অনুযায়ী

পারিশ্রমিক পেয়েছে, আর বিম্‌কে ধরে সে নিজের কর্তব্য পালন করেছে মাত্র।

...ঐদিনই সেমিওন পেত্রোভিচ অনুসন্ধানের আয়োজন করল। প্রথমত, খবরের কাগজে এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রকাশিত হল: 'একটা 'সেটার' কুকুর হারিয়েছে। কুকুরটা সাদা, তার একটা কান কালো। নাম বিম্। অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী। কেউ সন্ধান পেয়ে থাকলে দয়া করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাবেন। সন্ধানকারী ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।'

বড় শহরে বিম্ সম্পর্কে আলোচনা চলতে লাগল। ঘন ঘন টেলিফোন বাজতে লাগল, পাঠকরা চিঠির পর চিঠি লিখে সহানুভূতি জানাল, বার্তাবহরা ওর খোঁজে এখানে-ওখানে ছুটতে লাগল।

এই ভাবে বিম্ দুবার খ্যাতি অর্জন করল: একবার তার জীবদ্দশায় — পাগলা কুকুর বলে; দ্বিতীয়বারে মৃত্যুর পর — 'অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী' বলে। বিমের এই শেষোক্ত প্রসিদ্ধিতে সেমিওন পেত্রোভিচের অবদান সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিমের কোন চিহ্নই শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না — না পুরো শীতকাল ধরে, না শীতের পরে। তাছাড়া কার পক্ষেই বা জানা সম্ভব? অল্পবয়সী ইভান কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে। সঙ্গত কারণেই এই বিজ্ঞাপনে কোন সাড়া সে দিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ ইভানকে ইভান ইভানভিচ আগে থেকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই ব্যাপারে সে যেন কোন উচ্চবাচ্য না করে! এরা ছাড়া আর একটি লোকও জানত না যে বিম্ তুষারকণায় আচ্ছন্ন সদ্য জমাট মাটির নীচে শুয়ে আছে, জানত না যে ওকে কেউই আর কখনও দেখতে পাবে না।

সে বছর শীত পড়েছিল প্রচন্ড। দু' দুবার কালো ঝড় বয়ে গেল। এর পর মাঠের সাদা তুষাররাশি কালোয় কালো হয়ে গেল। কিন্তু বনের ভেতরকার সেই ফাঁকা জায়গাটায় তুষার থেকে গেল পরিষ্কার, সাদা ধবধবে। অরণ্য তাকে রক্ষা করল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অরণ্যের প্রাণোচ্ছ্বাস (উপসংহার)

আবার বসন্তের আগমন। সূর্য ঠেলে দূরে করে দিল শীতকে। দুর্দশাগ্রস্ত শীতের পদযুগল গলে খসে খসে পড়ছে, সে তার দুর্বল পায়ে ছুটে পালাচ্ছে। এদিকে গরমের দিনও পিছে পড়ে থাকছে না, শীত যত দূরে সরে যাচ্ছে তার পেছন পেছন তাল রেখে অল্প অল্প করে বেড়ে চলছে গরমের বেলা, শীত-বুড়িকে পুড়িয়ে তার গায়ে কালো কালো ছোপ মেরে যাচ্ছে, তাকে কাদামাখা সাদা-সাদা টুকরোয় ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলছে। বসন্ত কোন কালেই মুমূর্ষু শীতকে এতটুকু করুণা করে না।

দেখতে দেখতে বরফগলা জলের ধারা শান্ত হয়ে এলো, তার আর তেমন তাড়াহুড়ো দেখা যায় না। জলধারা ক্রমেই কমে আসতে থাকে, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে আর রাতের বেলার একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। বসন্ত এলো দেরিতে, তবে শান্ত সেই বসন্ত।

কিছুদিন আগে আলিওশা ও খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ ইভান ইভানভিচের বাড়িতে রাত কাটায়। সেই সময় খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ বলে:

'এরকম বসন্তকাল ফসলের পক্ষে ভালো।'

শিগগিরই তারা ভেড়ার পাল বাইরে চরাতে নিয়ে যাবে, কিন্তু আলিওশা এখন যতদিন পর্যন্ত স্কুল ছুটি না হচ্ছে ততদিন রোজ সকালে বাবার সঙ্গে ভেড়ার পালকে কেবল চারণভূমিতে বিদায় করবে আর সন্ধ্যাবেলায় গাঁয়ের বাইরে যাবে তাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে।

আলিওশা একা একাও কয়েকবার শহরে এসেছে। এই রকম দিনগুলোতে সে আর তোলিয়া — এই দুই ভালো ছেলে একসঙ্গে মিলে ফের বিমের খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু একদিন ওরা সকলে মিলে যখন ইভান ইভানভিচের বাড়িতে চা পান করতে থাকে সেই সময় খিত্রসান আন্দ্রেয়েভিচ তার নিজের অভিমত জানিয়ে বলল:

'খবরের কাগজে ছাপা হওয়ার পরও যখন খোঁজ মিলল না তখন মনে হচ্ছে ওকে কেউ অনেক দূরে কোথাও নিয়ে চলে গেছে। আমাদের মাতৃভূমি রাশিয়া বিশাল দেশ — এখানে খোঁজ করা আর খুঁজে পাওয়া কঠিন। ও যদি মারা যেত, তাহলে কেউ না কেউ নির্ঘাত

ঐ বিজ্ঞাপনের উত্তরে জানাত — এই এই ব্যাপার, আপনাদের কুকুর মারা গেছে, তাকে অমুক অমুক জায়গায় আমি দেখেছিলাম। সবচেয়ে বড় কথা — বেঁচে আছে। এটাই আদত কথা। সকলেই কি আর নিজের কুকুর খুঁজে পায়? এক্ষেত্রে আসলে বলতে গেলে কি, কিছুই করার নেই।' বিষয়টা যেন সে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে এই রকম দৃষ্টিতে সে ইভান ইভানভিচের দিকে তাকাল — ওরা দুজনেই মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল; তারপর সে যোগ করল, 'তাই বলি কি ছেলেরা, ওকে খুঁজে কোন লাভ নেই। আমি ঠিক বলছি কিনা ইভান ইভানভিচ?'

ইভান ইভানভিচ মাথা নাড়িয়ে ওর কথায় সায় দিল।

ঐদিন থেকে খোঁজ করা বন্ধ হয়ে গেল। রয়ে গেল কেবল স্মৃতি, আর সেই স্মৃতি দুই বালকের মনে গাঁথা হয়ে রইল চিরকালের জন্য, সারা জীবনের মতো। হয়ত অনেক অনেক বছর পরে আমাদের এই দুই বালক তাদের সন্তানদের কাছে বিমের কাহিনী বলবে। কারণ এই যে যে-কোন বাবা অথবা দাদু — যদি তার কোন কালে কোন কুকুর-বন্ধু থেকে থাকে — তার সম্পর্কে মজার মজার ঘটনা বা দুঃখজনক কাহিনী ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনিদের কাছে বলবে না এমন হতেই পারে না। আর তা শুনে উঠতি বয়সের ছেলে অথবা মেয়ে নিজে কুকুর রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

যাওয়ার সময় খ্রিসান আন্দ্রেয়েভিচ ভেড়ার পালের পাহারাদার জাতের এক মাস বয়সী একটা কুকুরছানা তার বুকের কাছে জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। ইভান ইভানভিচের উপহার। আলিওশার আনন্দ আর ধরে না।

... ইভান ইভানভিচের ঘরের ভেতরে পুরনো জুতো নিয়ে খেলা করছে একটা নতুন কুকুরছানা। এর নামও বিম্। ইংলিশ 'সেটার' কুকুরের লক্ষণযুক্ত রঙের, ভালো জাতের কুকুর। এটাকে ইভান ইভানভিচ কিনেছে 'দুজনের জন্য' — তার নিজের আর তোলিয়ার জন্য।

কিন্তু পুরনো বন্ধুকে তাই বলে তার পক্ষে কখনও ভোলা সম্ভব নয়। সে ভুলতে পারবে না বিমের সেই দান — তার শিকারী দৃষ্টি, ভুলতে পারবে না বিমের উদারতা, সব কিছু ক্ষমা করতে পারার মতো বন্ধুত্ব। বিশ্বস্ত বন্ধুর স্মৃতি, তার মন্দ ভাগ্যের স্মৃতি এই বৃদ্ধ মানুষটিকে পীড়িত করে। এই কারণেই ইভান ইভানভিচকে এক দিন দেখা গেল বনের ভেতরকার সেই

ফাঁকা জায়গাটাতে, সে গিয়ে বসল সেই কাটা গুঁড়িটার ওপর। চারপাশে দৃষ্টি বুলাল। সে এসেছিল অরণ্যের মর্মরধ্বনি কান পেতে শুনতে।

একটা অসাধারণ শান্ত বসন্তের দিন।

আকাশ ফাঁকা জায়গাটার ওপর ঘন করে ছিটিয়ে দিয়েছে স্নো-ড্রপ ফুলের রাশি (ধরণীর বুকে বিন্দু বিন্দু আকাশ!)। এমন আশ্চর্য দৃশ্য ইভান ইভানভিচ জীবনে বহুবার দেখেছে। এবারেও আবার এসেছে সেই বসন্ত — শান্তসংযত, কিন্তু তার অকৃত্রিম সারল্যে বিপুল শক্তিমান, আর প্রতিবারই জীবনের জন্মলাভের অনুপম নবীনত্বে আশ্চর্য!

অরণ্য নীরব। তার সদ্য নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। আকাশের ছিটে ছিটে স্পর্শ লেগেছে তার গায়ে। গাছের পাতার কোরক এখনও সম্পূর্ণ খোলে নি; কোমল, স্পর্শকাতর ঝলমলে সেই সমস্ত পাতার মাথার ওপরে ঈষদুষ্ণ রোদের বিন্দু খেলা করছে, অরণ্যকে চঞ্চল করে তুলছে। ইভান ইভানভিচের মনে হল সে যেন বসে আছে এক মহামহিমাপূর্ণ মন্দিরে, সে মন্দিরের মেঝে সবুজ, চূড়া সবুজ, তার থামগুলো জীবন্ত ওক কাঠের। এ যেন এক স্বপ্ন।

কিন্তু হঠাৎ... এর কী অর্থ হতে পারে? বনের ওপর দিয়ে অল্প সময়ের জন্য খেলে গেল একটা ধ্বনি — একটা গভীর নিঃশ্বাস। অনেকটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস, যেন স্বস্তিটা এই কারণে যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গাছপালার জীবন আবার ফিরে এসেছে, আর তার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে পত্রকলিকা ফোটার মধ্যে। তাই যদি না হবে, তাহলে কেন আন্দোলিত হয়ে উঠল ডালপালা, তারই সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠল নীলকণ্ঠ পাখি, কেনই বা উৎফুল্ল হয়ে ঢাকের সংগীতমুখর ছর্‌রা পিটিয়ে কাঠঠোকরা পাখি তার বান্ধবীকে ডাকতে যাবে, অরণ্যকে মুখরিত করে তুলবে পূর্বরাগের বার্তা জানিয়ে? বনমোরগের মতো সেও কিন্তু বসন্তের সমারোহপূর্ণ ঐকতান সংগীতের সূচনা সঙ্কেতকারী প্রাণীদের একজন। তবে বনমোরগ ডাকে গোধূলিবেলায়, মৃদুস্বরে, সন্তর্পণে। কিন্তু কাঠঠোকরা তার পছন্দমতো ডালে নিজের শুকনো কোটরটি খুঁজে পেয়ে বেশ সাহস দেখিয়ে, যেন ক্ষিপ্ত হয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে তার আদি অকৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সবাইকে জানায় নিজের আনন্দ-বারতা।

স্পষ্ট বোঝা গেল, অরণ্য এই কারণেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যে অলৌকিক ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, শুরু হয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের

কাল। পাখিরাও সেই মহাপরাক্রান্ত দানবের ডাকে, তাদের উদ্ধারকর্তার ডাকে সাড়া দিল। ইভান ইভানভিচ তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। আর অরণ্যের মর্মরধ্বনি ও অরণ্যবাসীদের সাড়া — এই শুনতেই ত তার এখানে আসা!

প্রতি বছরের মতো এবারেও এই রকম মুহূর্তগুলোতে ইভান ইভানভিচ সুখ পেতে পারত যদি না বনের ভেতরকার সেই ফাঁকা জমিটার একপ্রান্তে দেখা যেত একটা চাপড়া — নীলিমার লেশহীন একটা খালি জায়গা — গত বছরের ঝরা পাতার সঙ্গে মেশা তাজা মাটির একটা চাপড়ামাত্র। বসন্তকালে, বিশেষত বসন্তসমাগমে, যখন প্রকৃতির সর্বত্র এমন বিপুল উল্লাসের মেলা চলেছে, তার মধ্যে এমন একটা খালি চাপড়া দেখতে পেয়ে মন বিষাদে ভরে ওঠে।

কিন্তু দরদভরা, সরল, স্নেহশীল, নিষ্পাপ দুই চোখ মেলে ইভান ইভানভিচের আপাদমস্তক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে নতুন বিম। এর মধ্যেই কিন্তু সে তোলিয়ার মন জয় করে ফেলেছে। এই ভাবে সহৃদয়তা দিয়েই শুরু হল আমাদের ছোট বিমের জীবন।

'ওর জীবনটা কী রকম হবে কে জানে?' ইভান ইভানভিচ মনে মনে ভাবল। 'না, না, এই নতুন বিমের জীবন সবে শুরু হয়েছে, ওর জীবনটা যেন আমার বন্ধুর জীবনের মতো না হয়। এটা আমি হতে দেবো না। হতে দেবো না।'

ইভান ইভানভিচ উঠে দাঁড়াল, পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল:

'না!'

অরণ্য সংক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি তুলল কয়েকবার: 'না ... না ... না ... ' তারপর নিস্তব্ধতা।

এদিকে তখন বসন্ত।

ধরণীর বুকে বিন্দু বিন্দু আকাশ — স্নো-ড্রপ ফুল।

শান্ত, সর্বত্র শান্ত।

এতদূর শান্ত যে মনে হয় যেন কোথাও মন্দ কিছু নেই।

কিন্তু... তবু... তবু কে যেন বনের মধ্যে গুলি ছুঁড়ল! তিনবার গুলি ছুঁড়ল।

কে? কেন? কাকে গুলি করল?

হয়ত নিষ্ঠুর লোকটা ঐ সুন্দর কাঠঠোকরাটাকে ঘায়েল করল, ঘায়েল করার পর আরও দুটো গুলি মেরে তাকে খতম করে দিল।

আবার এমনও হতে পারে যে কোন শিকারী তার কুকুরকে কবর দিল... হয়ত কুকুরটার বয়স হয়েছিল তিন বছর।

'না, জীবন্ত ওক গাছের থামে ঘেরা এই নীল মন্দিরের মধ্যেও দেখছি অশান্তি,' টুপি খুলে দাঁড়িয়ে সাদা মাথা তুলে আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে মনে মনে ভাবল ইভান ইভানভিচ। তার এই ভঙ্গিটি ছিল প্রার্থনার ভঙ্গি, যেন বসন্তের জন্য প্রার্থনার।

অরণ্য নীরব।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হবে

ইউরি দ্মিত্রিয়েভ। ওরাও কথা বলে

লেখক জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে শিশুদের কাছে জীবজন্তুর 'ভাষা' চর্চার বিবরণ দিয়েছেন। যে-সমস্ত কীটপতঙ্গ খেতের ফসল নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অথবা বিপদগ্রস্ত পশুপাখি ও মাছকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে এই সব জ্ঞান মানুষ কী ভাবে কাজে লাগায় তিনি তারও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

প্রকৃতি ও জীবজন্তুকে ভালোবাসা এবং তাদের রক্ষা করা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর কথায়: 'আমাদের চমৎকার পশুপাখিদের অস্তিত্ব নষ্ট হওয়া মানে জীবন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে দাঁড়াবে বৈচিত্র্যহীন ও নিষ্প্রভ।'

'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হবে

মিখাইল ইলিন ও ইয়েলেনা সেগাল। মানুষ কি করে বড়ো হল

দুনিয়ার সমস্ত ছেলেমেয়ে যে 'এক লক্ষ কেন'র উত্তর চায় সেটা অন্তত অংশত জোগাবার দুরূহ ও সাধু প্রয়াসে মিখাইল ইলিন (১৮৯৫-১৯৫৩) তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবন নিবেদন করেছেন। এ বইটি লেখা হল তাঁর স্ত্রী ও সাহিত্যকর্মী সহযোগী ইয়েলেনা সেগালে'র সহায়তায়। সুন্দর ভাষায় বইটিতে ছোটদের জন্য বলা হয়েছে মানুষের উদ্ভবের কথা, কেমন করে সে বশ করল আগুন আর লোহা, প্রকৃতিকে চিনে ক্ষমতাধীন করল তাকে, গড়ে তুলল নতুন পৃথিবী। বিশ্বের বহু ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে, এবার আত্মপ্রকাশ করছে নতুন ধরনের মৌলিক অঙ্গসজ্জায়, অজস্র চিত্রে শোভিত হয়ে।

‘রাদুগা’ প্রকাশন থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হবে

ভাসিলি গালিশ্‌কিন। এক যে আছে শিশুর দেশ

আর্তেক কিশোর পাইওনীয়র ক্যাম্প সম্পর্কে কাহিনী

আধুনিক সোভিয়েত লেখক ভাসিলি গালিশ্‌কিনের এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র স্কুলের ছেলেমেয়েরা। কৃষ্ণসাগর তীরের চিত্রোপম স্থানে অবস্থিত আর্তেক কিশোর পাইওনীয়র ক্যাম্পে যে-সব ছেলেমেয়ে ছুটি কাটাতে আসে তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এখানে।

শিশুদের এক বিশাল, সুখী আন্তর্জাতিক পরিবারের বাস এই আর্তেকে; এখানে তারা একসঙ্গে থাকে, খেলাধুলা, আমোদ-উৎসবে মাতে। সোভিয়েত শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের শিশুরাও এই ক্যাম্পে আসে। তাদের সকলের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সেলোফেনের শক্ত মলাটে বাঁধাই বইটি। ভাসিলি শুলজেংকো’র আঁকা ছবি আর আলোকচিত্রে শোভিত।

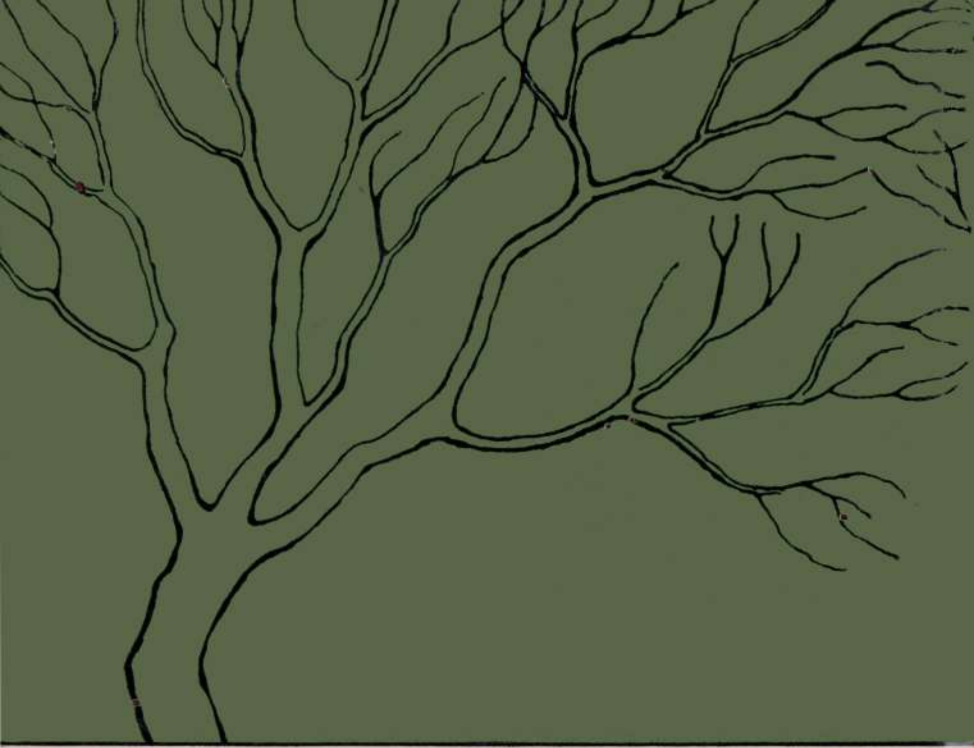

এই বইটিতে রয়েছে একজন মানুষ আর বিম নামে একটি কুকুরের মধ্যে বন্ধুত্বের এক মর্মস্পর্শী ও বেদনাবিধুর কাহিনী। বুকে একটি গোলার টুকরো — যুদ্ধের উত্তরলব্ধি — কুকুরের মালিককে হাসপাতালে যেতে বাধ্য করে। শুরু হয় বিমের কঠোর গৃহহীন জীবন। সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ভালো-মন্দ নানারকম মানুষের দেখা পায়, সব সময়ে আশা করে তার প্রভুর দেখা পাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-জয়ী গাভ্রিইল ত্রোয়েপোল্‌স্কি লিখিত এই উপাখ্যানটি তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত: এটি অভিনীত হয়েছে রঙ্গমঞ্চে, এর চলচ্চিত্র ভাষ্যও আছে।

বইটি অনূদিত হয়েছে বিশ্বের বহু ভাষায়।